শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. এস এম লুৎফর রহ্‌মান
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোহাম্মদ আফজাল হোসেন খান
পিএইচ ডি গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
466270

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ-২৮/০৭/২০১৩ খৃঃ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক মোহাম্মদ আফজাল হোসেন খান-এর পিএইচ ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত "শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। ১৫/১২/২০১২ তারিখে পদত্ত পরামর্শের ভিত্তিতে গবেষক মোহাম্মদ আফজাল হোসেন খান মোটামুটিভাবে অভিসন্দর্ভটি পরিমার্জনা করেছেন। এখন তিনি অভিসন্দর্ভটি জমা দিতে পারেন।

যতদূর জানি, এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

২৮.৭.১৩

অধ্যাপক ড. এস এম লুৎফর রহ্মান
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

466270

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

DIGITIZED

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম অধ্যাপক ড. কাজী দীন মুহম্মদ স্যারের পরামর্শ, অনুপ্রেরণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, অধ্যাপক ড. এস এম লুৎফর রহ্মান স্যারের সুপারিশ, সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধানে "শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান" শীর্ষক বিষয়ে ১৯৯৯–২০০০ শিক্ষাবর্ষে এম ফিল প্রথম বর্ষ কোর্সে ভর্তি হই। ২০০৪ সালে আমি এম ফিল প্রথম বর্ষ কোর্স পরীক্ষায় কৃতকার্য হই। অতপর একই বিষয়ে আমি নিয়মানুযায়ী ২০০৬–২০০৭ শিক্ষাবর্ষে পিএইচ ডি কোর্সে উত্তীর্ণ হই। এই দীর্ঘ সময়ে গবেষণাকালীন আমার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. এস এম লুৎফর রহ্মান স্যারের কাছে সশ্রদ্ধচিত্তে ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর কাছে আমার ঋণ কেবল অপরিসীমই নয়, বরং অপরিশোধনীয়। কারণ গবেষণার বিষয়-নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ জমা প্রদানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে অসংখ্য দিন-রাত সময় আমাকে দিয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ও প্রাজ্ঞ বিবেচনা আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর ক'রে দিয়েছে। অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত একাধিকবার পাঠ ক'রে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শও তিনি আমাকে প্রদান ক'রেছেন। তাছাড়া এ-গবেষণাকর্মের পুরো সময়ই তাঁর পিতৃসুলভ স্নেহ আমাকে ঘিরে রেখেছে। এমনকি তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই ছিল আমার অন্যতম শ্রম-উৎস।

এর পরপরই আমি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি বিশিষ্ট ভাষাবিদ অধ্যাপক ড. কাজী দীন মুহম্মদ স্যারের বিদেহী আত্মার প্রতি। তিনি আমাকে পিএইচ ডি করতে উৎসাহ প্রদান ক'রেছেন। অধ্যাপক ড. গোলাম কাদির, অধ্যাপক আহমেদ জামান চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান স্যারের কাছে সহযোগিতার জন্য আমি চিরঋণী। ড. আহমেদ মাওলা, ড. খায়রুল আহসান সিদ্দিকী, ড. এ কে এম আমিনুল হক, ড. হাবিবুর রহমান, ড. মিল্টন বিশ্বাস, ড. এম এ বাশার প্রমুখ বন্ধুরা মিলে মিশে দিন-রাত গবেষণাকর্মে ব্যস্ত থাকতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে– তাঁদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে বড় ভাইয়ের মতো যিনি সব সময় গবেষণার খোজ-খবর রাখতেন এবং দ্রুত গবেষণাকর্ম চালি যাওয়ার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

পরামর্শ দিতেন, তিনি হলেন চুয়েট এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও লেখক অধ্যাপক ড. চৌধুরী এম সাইফুল ইসলাম। এদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও গবেষণাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী-ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা ও লাইব্রেরী শাখা, যশোর পাবলিক লাইব্রেরী, জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরী, খুলনার রতন সেন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরী ইত্যাদি থেকে আমি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এ সকল কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের এম ফিল, পিএইচ ডি অনেক গবেষকের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আমি লাভবান হয়েছি–তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

জনাব শহীদুল্লাহ পাটোওয়ারী, সৈয়দ মনজুর মোর্শেদ, সিনিয়র এসি ডিবি জনাব নাসির উদ্দিন খান, অধ্যাপক হাসানুর রশিদ, ভাষা-গবেষক এম আর মাহাবুব প্রমুখদের আগ্রহ ও কৌতুহল আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপিটি ধৈর্য্যসহকারে কম্পিউটার টাইপ করার জন্য ছোট ভাই টিপু সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভ কামনা রইল।

পরিশেষে আমার বাবা মোহাম্মদ মকবুল হোসেন খান ও মাতা লুৎফা খানম, চাচা আমির হোসেন খান, গিয়াস উদ্দিন খান এবং চাচী মিসেস রুমানা গিয়াসের প্রতি চিরঋণী। তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ ও দোয়া ছাড়া আমার এ পর্যায়ে আসা সম্ভব ছিল না। মায়ের দোয়া, উৎসাহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল আমার এই অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করার মূল চালিকা শক্তি। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আফজাল হোসেন খান
পিএইচ ডি গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলা সাহিত্যের যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কলমে বাংলা সাহিত্যচর্চা ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধিত হয়েছে– সে সকল সাহিত্যিকের অন্যতম হলেন শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার বুনাগাতি ইউনিয়নের ঘোষগাতি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৯১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি সর্বদাই সৃজনশীল চিন্তা চেতনায় মগ্ন থাকতেন এবং সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। কখনো স্কুলে, কখনো মাদরাসায় লেখাপড়া করেছেন,। আবার আর্থিক অভাব-অনটনে পড়ালেখা বন্ধ ক'রেও দিয়েছেন। আর্থিক দৈনতার কারণে, জায়গীরে থেকে পড়াশুনা ক'রতে হয়েছে তাঁকে। কখনো তিনি শালিখায়, কখনো যশোহরে, কখনো কলকাতায় পড়ালেখা করেছেন। বৈচিত্র্যময় প্রতিভার অধিকারী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। কর্মজীবনে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিলেও কখনো সম্পাদক, কখনো স্কুল পরিদর্শক পদেও চাকুরি ক'রেছেন। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি নানামুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি জীবনী, ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ, ভ্রমণ, প্রবন্ধসহ সাহিত্যের সকল শাখায় সফলভাবে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। শিশু-সাহিত্যও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

পারস্যের মশহুর কবি শেখ মছলেহ্ উদ্দীন শিরাজীর অমর কাব্য 'গুলিস্তা'র বাংলা অনুবাদের পথিকৃৎ ছিলেন শেখ হবিবর রহমান। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম অনুবাদক। তাছাড়া তিনি গুলিস্তাঁ কাব্যের ৭৫ টি পরিচ্ছেদ গল্প আকারে অনুবাদ করেছেন।

তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবন-কর্ম নিয়ে। গল্পটি এতবেশী তথ্যসমৃদ্ধ যে, ইতিহাসেরও কমতি নেই, উপন্যাসেরও ঘাটতি নেই। বিরল প্রতিভাধর এই সাহিত্যিকের সকল সাহিত্যকর্মই বৈচিত্রপূর্ণ। "যশোহর খুলনা সিদ্দিকীয় সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'শুকতারা' নামের অমুদ্রিত মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমেই তাঁর আরো একটি প্রতিভার বৈশিষ্ট আমরা দেখতে পাই। ১৯১৪

Dhaka University Institutional Repository

সালে তিনি মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অতপর তাঁর সম্পাদনায় ১৯১৯ সালে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গনুর' প্রকাশিত হয়।

শেখ হবিবর রহমান অধ্যাবসায়ী, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন। নানা বাঁধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে তিনি ২৫ টি গ্রন্থ প্রকাশ করতে স্বক্ষম হয়েছিলেন। এরমধ্যে উল্লেখিত অনেক গ্রন্থই পুনসংস্করণ হয়েছে। আবার অনেক গ্রন্থ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। সমসাময়িক বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্যকর্ম অত্যন্ত আদরণীয় ছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারছী শব্দ প্রয়োগ ও আমদানীর ক্ষেত্রে শেখ হবিবর রহমান ছিলেন সার্থক পথিকৃৎ। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয় ছন্দে কাব্য রচনায় তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিহার। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল ও গীতিমাধুরিতে ভরপুর। প্রকৃতি চেতনা তাঁর কবি মানসের একটি স্বভাবজাত ধর্ম। প্রকৃতির শান্ত সমাহিত নিরাসক্ত রূপ ও সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন বিমোহিত। মানবতার নিঃশ্বার্থ কল্যান কামনাই ছিল তাঁর আদর্শ।

পয়গ্রাম কসবায় পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মুন্সি মেহেরুল্লা'র উপস্থিতিতে শেখ হবিবর রহমান দু'টি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতা দু'টি শুনে মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ তাকে 'শিশু কবি' উপাধি দেন। জীবনের শেষদিকে নদীয়া সাহিত্যসভা তাঁকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি প্রদান করে। পরবর্তীতে নিখিল ভারত সাহিত্যসভার নিকট থেকেও তিনি দু'টি উপাধি প্রাপ্ত হন। বিশেষ কারনে তিনি উক্ত দু'টি উপাধি ব্যবহার করতে সঙ্গত বোধ করেননি। পঞ্চাশের দশকে শেখ হবিবর রহমান পূর্বপাকিস্তান সরকার হতে সাহিত্য-পেনশন লাভ করেন। বাংলা একাডেমী তাঁকে সম্মানীত ফেলো হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ১৯৬০ সালে। বাংলা একাডেমী তাঁর সমূদয় গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যেশ্যে স্বত্ত্ব ক্রয় করেন।

১৯৭০ সালে অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে শেখ হবিবর রহমান গ্রন্থাবলী(১ম খন্ড) প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আর কোন খন্ড প্রকাশিত

হয়নি। তাঁর সমূদয় গ্রন্থ বাংলা একাডেমীতে প্রদান ক'রলেও বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে কোন গ্রন্থ খুজে পাওয়া যায়না। বাংলা একাডেমীর জীবনী-সিরিজ গ্রন্থমালায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম নিয়ে আব্দুল মজিদ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং খুলনা একাডেমী থেকে শেখ হবিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও নজরুল অধ্যাপক, অধ্যাপক ড. এস এম লুৎফর রহ্মান স্যারের পরামর্শ, সুপারিশ এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের জীবনাদর্শ ও কর্ম নিয়ে "শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান" শীর্ষক শিরোনামে পিএইচ ডি গবেষণায় নিয়োজিত হই। গবেষণার প্রয়োজনে তাঁর জীবনাদর্শ ও কর্মকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজন করে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাই। পাঁচটি অধ্যায় হচ্ছে– যথা: ১. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সময় সমাজ ও সাহিত্য-পরিবেশ। ২. কবির জন্মকাল, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্য-প্রতিভার সূচনা। ৩. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের রচনার শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয়। ৪. শেখ হবিবর রহমানের সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা, আনুষঙ্গিক কর্ম ও সাহিত্যরত্ন উপাধিপ্রাপ্তি। ৫. সাহিত্যিক ও পত্রিকার সম্পাদকরূপে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের প্রতিভার বৈশিষ্ট ও মূল্যায়ন।

অভিসন্দর্ভের শেষে গ্রন্থতালিকা দেয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ আফজাল হোসেন খান
পিএইচ ডি গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়ন পত্র	i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ii
ভূমিকা	iv
সূচীপত্র	vii
১ম অধ্যায়	
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সময় সমাজ ও সাহিত্য-পরিবেশ	১-২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
কবির জন্মকাল, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্য-প্রতিভার সূচনা।	২৮-৫৫
ক) কবির জন্মকাল	২৯
খ) শিক্ষাজীবন	৩২
গ) কর্মজীবন	৩৬
ঘ) সাহিত্য-প্রতিভার সূচনা।	৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	**৫৬-১৮০**
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের রচনার শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয়।	৫৮
ক) কবিতা	৬২
খ) ছড়া	৭৭
গ) উপন্যাস	৮০
ঘ) গল্প	৯১
ঙ) ভ্রমণ-কাহিনী	১০৭
চ) জীবনী সাহিত্য	১১৩
ছ) প্রবন্ধ-সাহিত্য	১২০
জ) অনুবাদ-সাহিত্য	১৫২
ঝ) আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ	১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শেখ হবিবর রহমানের পত্রিকা-প্রকাশ, আনুষাঙ্গিক কর্ম ও সাহিত্যরত্ন উপাধিপ্রাপ্তি। ১৮১-২২০

পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্যিক ও পত্রিকার সম্পাদকরূপে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন। ২২১-২৪৬

গ্রন্থ তালিকা ২৪৭-২৫১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সময়, সমাজ ও সাহিত্য-পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সময়, সমাজ ও সাহিত্য-পরিবেশ

একথা অজ্ঞাত নয় যে, বৃটিশ প্রশাসনযন্ত্র ঔপনিবেশ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপযোগী রূপে গঠিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোকদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল অপরিসীম ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা। তাদের ক্ষমতা, বিচ্ছিন্নতা ও ঔদ্ধ্যত ছিল ব্যাপক ভীতপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতে যে সকল দেশীয় শিক্ষিত সিভিল সার্ভিসে অনুপ্রবেশ করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপভাবে গঠিত হয়।[১]

তাই সামাজিক ক্ষেত্রে বৃটিশ-শাসনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ করা যায়। তখন হিন্দু-সমাজে এমন কতিপয় কুসংস্কার ও রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, যাহা যে কোন সভ্য-সমাজের জন্য কলঙ্কজনক। ধর্মের নামে কন্যা-সন্তান হত্যা করা, গঙ্গায় সন্তান-বিসর্জন দেয়া, বিধবা নারীকে মৃত স্বামীর সঙ্গে অগ্নিদাহ করা (সতীদাহ প্রথা), নিরীহ পথচারীকে গলা টিপে হত্যা করা (ঠগী), রথের চাকায় নরবলী দেয়া (জগন্নাথ), পিঠের দাঁড়ায় বর্শী বিঁধিয়ে দড়ি দিয়ে শূন্যে চক্রাকারে ঘুরানো (চড়ক), বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, দাসপ্রথা

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি। সমাজের নৈতিক চরিত্রও ছিল অতি নিম্নে। পতিতাবৃত্তি ছিল সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত।২

একথা অজ্ঞাত নয় যে, উনিশ শতকের সূচনাতেই বৃটিশ সরকার শিক্ষা-সংস্কার-নীতি গ্রহণ করে এবং কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। ঐ শতকের দ্বিতীয় দশকে ১৮১৩ সনের চার্টার অ্যাক্টে জনগণকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব কোম্পানীকে অর্পণ করা হয়। ঐ-সনে শিক্ষা-খাতে বাৎসরিক ন্যূনপক্ষে একলক্ষ টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তখনও কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষা-নীতি গৃহীত না হওয়ায় দীর্ঘকাল বরাদ্দ টাকা ব্যয় করা হয়নি। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মাধ্যম কি হবে, তা নিয়ে বিতর্ক চলে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত। একদল প্রাচ্য বিষয়, পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষা দিবার পক্ষে যুক্তি প্রদান করে। আরেক দল ছিল পাশ্চাত্য বিষয়, পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। অবশেষে ১৯৩৫ সন হতে দেশে ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রথম প্রথম ইরেজি শিক্ষা শুধু শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫৫ সনের পর হতে সরকার গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুল স্থাপনে সক্রিয় হয়ে উঠে। সরকার ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানান। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজ স্থাপনে সাহায্যকারীদের সরকার 'রায় বাহাদুর', 'খান বাহাদুর' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন। উপাধি লাভে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক জমিদার ও ধনী ব্যক্তি স্কুল-কলেজ স্থাপন করেন। ১৯২০ সনের এক সমীক্ষায় দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়, যে-দেশের সমস্ত স্কুল-কলেজের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত।৩

বলা আবশ্যক যে, উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা মুসলমান সমাজে খুব একটা অনুপ্রবেশ করেনি। ফলে তারা চাকুরি থেকে হত বঞ্চিত, আধুনিকতার আলোক হতে থাকত দূরে। বলা হয় যে, মুসলমান-জাতি ইংরেজি শিক্ষাকে ধর্মবিবর্জিত মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে থাকত। এই সময় ওহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনের ফলে মুসলমান সমাজ ইংরেজির চাইতে আরবি ও ফারসি শিক্ষার দিকেই গুরুত্ব বেশি দেয়। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের জন্য ধর্মীয় কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ছিল বেশি দায়ী। উনিশ শতকে শিক্ষা ছিল অত্যধিক ব্যয়বহুল। ফলে এ শিক্ষা সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর ধনবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের মুসলমান ছিল বেশিরভাগই কৃষক। তখন কৃষকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অতএব দরিদ্র কৃষক মুসলমানদের পরিবারের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ছিল কষ্টসাধ্য। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ছিল ধনী, তাদের সন্তানদের অনেকেই ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছেন। ধর্মের কারণে তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করেননি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বাঙালি কৃষকের অর্থনীতি স্বচ্ছল হয়ে উঠে। সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। শেখ হবিবর রহমানও সময়ের এই সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেন। তাঁর স্কুল-জীবনের শেষ হয় ১৯১২ সালে।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে ১৯০০ সালের সূচনা থেকেই হিন্দুদের মধ্যে স্ব-বিরোধী জাতীয় চেতনা বেগবান হয়ে উঠে। ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তা রদ করার আন্দোলনও ঘনিভূত হতে শুরু করে। তখন হিন্দু রাজনীতিকরা মনে করেন, এ আন্দোলন চাঙ্গা করতে মুসলমানদের সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমানদের সাথে পূর্ব থেকে কোন সম্পর্ক না থাকায় হঠাৎ করে তাদের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মুসলিম নেতাদের সাথে সাধারণ মানুষের তেমন কোন সম্পর্কও ছিল না। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রয়াস ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বেশ কজন বুদ্ধিজীবী হিন্দু-মুসলমান এক হও বলে গান গেয়েছিলেন। সকলের হাতে রাখি বেঁধেছিলেন। ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য তারা শুরু করলেন স্বদেশী আন্দোলন, বৃটিশ পণ্য বর্জন করার আন্দোলন। তবে আন্দোলনে তেমন সফলতা আসেনি বরং পণ্যের দাম বেড়ে তা আরো দুর্লভ হয়। ৪

বঙ্গভঙ্গ রোধ করার আন্দোলনের প্রতি সাধারণভাবে মুসলমানরা এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সমর্থন জানাননি। বরং উল্টো পূর্ববঙ্গের গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারের হাতে হাত মিলান ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ। বঙ্গভঙ্গ যে মুসলমানদের উপকার করবে এই ধারণা জোরদার করার জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন।৫

বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে। ভারত উপমহাদেশে আধুনিক-শিক্ষা বাংলাতেই প্রথম বিস্তৃতি লাভ করে। ইংরেজগণ নিঃস্বার্থভাবে এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

Dhaka University Institutional Repository

এদেশীয়দের মধ্য থেকে অনুগত রাজ-কর্মচারী এবং অনুগত একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তাছাড়াও এদেশে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ইংরেজদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কেরি, মার্শম্যান প্রমুখ খ্রিস্টান মিশনারিদের শিক্ষা-বিস্তারের এটিই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। এ দেশের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক মেকলের উক্তিতে তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়।৬

মেকলে যেভাবে চেয়েছিলেন, বৃটিশ উপমহাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সেভাবে গড়ে উঠে। প্রায় একশত বছর পর মুসলমানরাও সেবৃত্তে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় মুসলমানদের অগ্রগতি ছিল শ্লথ। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তুলনামূলক অনগ্রসরতার কারণ ছিল স্কুলের ব্যবস্থাপনা-কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলীতে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের অভাব, বৈরি পাঠ্যসূচি, আবাসিক সমস্যা ইত্যাদি উল্লেখ্য। ১৯১৬ সালে আবাসিক সমস্যা সম্পর্কে সরকার নিজেই বলেছিলেন যে, এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্বেও মুসলমানদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত। যার ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে দূরের স্কুলে আসা-যাওয়ার খরচ কিংবা শহরে ব্যক্তিগত আবাসিক ব্যয়ভার বহন করে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই-সমস্যা বিরাজমান ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের নিকট মুসলমান নেতৃবৃন্দের দেয়া সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, উচ্চ শিক্ষায় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্টাফদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের অভাব মুসলিম-শিক্ষার অগ্রগতির বড় অন্তরায় ছিল। কমিশনের নিকট প্রায় সকলেই মুসলিম প্রতিনিধি নিয়োগের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলমানদের অনগ্রসরতা স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ শিক্ষায় মুসলমানদের গতিকে শ্লথ করে দেয়।[৭]

কিছু রাজনৈতিক ঘটনায় মুসলমানদের অর্থনীতিসহ শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও, তা ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাঁধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দেয়। তারা আশঙ্কা করেন, এই রদের মাধ্যমে পুনরায় মুসলমানের পুরনো অবস্থায় ঠেলে দেয়া হবে। এ-সময় থেকে মুসলমানরা রাজভক্ত-নীতি পরিহার করে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পথ বেছে নেন। অন্যদিকে হিন্দুরাও কংগ্রেস শাসনের দাবীতে আন্দোলন শুরু করলে এ-সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ পুনরায় হিন্দু-মুসলমানদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। এর ফলে প্রথমে লক্ষ্ণৌ চুক্তি(১৯১৬) এবং পরে খেলাফত-আন্দোলন ও অসহযোগ-আন্দোলন সংগঠিত হয়। অসহযোগের সময় স্কুল-কলেজ বর্জননীতি মুসলমানদেরকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রসারে বিশেষভাবে বাধার সৃষ্টি করে। এ-সময়ের পরিসংখ্যানে এর প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। মাধ্যমিক শিক্ষায় ১৯১৭ হতে ২২ সাল পর্যন্ত এক চতুর্থাংশ মুসলিম ছাত্র কমে যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় এ কে ফজলুল হক, আবুল কাসেম (১৮৭৪–১৯৩৬), নবাব আলী চৌধুরীর মত মুসলিম নেতৃত্ব অসহযোগ-আন্দোলনের এই কর্মসূচির সমালোচনা করেন। এই সময় মুসলিম-সমাজের একটি অংশ শিক্ষার অনগ্রসরতাকে প্রতিহত করার জন্য 'মুসলিম শিক্ষা রক্ষা কমিটি' গঠন করেন। যার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকার হাকীম

Dhaka University Institutional Repository

হাবিবুর রহমান। তবে অসহযোগের মতো বিশাল আন্দোলনকে বাঁধা দেয়ার জন্য এ-কমিটির কার্যক্রম তেমন সফল হয়নি।

মুসলমানদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নতিতে দারিদ্রও ছিল বড় বাধা। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম পাদে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেলে বাংলার মুসলমান কৃষক-সমাজ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখেছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিকভাবে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় বাংলার কৃষকদের আয় কমে যায়। অন্যদিকে বৃটিশ সরকার যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত ব্যয় করতে সক্ষম হয়নি। যা মুসলমানদের শিক্ষার প্রসারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বঙ্গভঙ্গ রদের পর নব্য-শিক্ষিত ক্ষুব্ধ মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করতে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় যদিও মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তথাপি এই ঘোষণায় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে মুসলিম-সমাজ তাদের আন্দোলনের ফসল হিসেবে চিহ্নিত করেন। এর ফলে মুসলমান-সমাজে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তা আধুনিক শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক সহায়তা করে।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান-সমাজে আধুনিক শিক্ষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলেও ধর্মীয় শিক্ষার প্রবাহ থেমে থাকেনি। অনেকে যদিও মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় ও অবৈজ্ঞানিক মনে করে এই শিক্ষাকে তুলে দেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজে এই মত তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।[৮] বরং মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশ ধর্ম এবং আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষার পঠনাদিসহ ধর্মীয় শিক্ষা চালু করার দাবি বারবার জানিয়ে এসেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৮৯১ সালের পর থেকে বিভিন্ন কমিটি গঠন, সভা-সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে মক্তব মাদ্‌রাসার শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উর্দু, আরবি ইত্যাদি ভাষা প্রচলনের চেষ্টা চালিয়েছেন। উল্লেখ্য, সরকার ১৭৮২ সালে কলকাতা মাদ্‌রাসাকে সরকারিকরণের মাধ্যমে মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রতি প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সরকার সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষা চালু না করলেও মাদ্‌রাসা-শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা আমরা দেখতে পাই ১৯১৪ সালে নিউস্কিম মাদ্‌রাসা প্রবর্তনের মাধ্যমে। এ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ফলে অতি অল্প সময়ে এ-শিক্ষা পদ্ধতি মুসলিম-সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন অসহযোগ আন্দোলনের কারণে মাধ্যমিক-শিক্ষায় মুসলমান ছাত্র কিছুটা কমে যায়, তখন মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে এ-আন্দোলন কোন রকম প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং এ-সময়ে মাদ্রাসায় ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। সমসাময়িককালের পরিসংখানে জানা যায় যে, মুসলমান মোট ছাত্রদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল মক্তব মাদ্‌রাসার ছাত্র। এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা সমান্তরালভাবে চলতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মাদ্রাসা আধুনিকীকরণের ফলে মুসলমান অভিভাবকরা সন্তানদের ইংরেজি পড়াতে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, তেমনি বাংলা, উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষা শিখাতেও আগ্রহী ছিলেন। ফলে তারা নিউস্কিম মাদ্‌রাসায় সন্তানদেরকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাতে থাকেন। এতে দেখা যায় সন্তানরা কোন ভাষাতেই পারদর্শী হতে পারছে না। অন্যদিকে সম্পূর্ণ আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে বঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে আধুনিক শিক্ষার সূচনা থেকেই মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে টানাপোড়ন চলে আসছিল। ফলে আলোচ্য সময়ে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার মুসলিম-সমাজ আশানূরূপ অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি।[৯]

আলোচ্য সময়ে নারী-শিক্ষার পক্ষে কিছু সংখ্যক সচেতন বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতির ব্যাপক প্রচারণা ও সরকারি সহযোগিতা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে সমাজের মনোভাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম নারী শিক্ষার হার শ্লথ ছিল। তবে উনিশ শতকের শেষদিকে পুরুষ-শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে-রকম প্রচেষ্টা চালানো হয়, মুসলমান নেতৃবৃন্দ নারী-শিক্ষার উন্নয়নে তেমন প্রয়াস পাননি। সরকারিভাবেও বঙ্গভঙ্গের পূর্বে মুসলমান নারী শিক্ষার প্রচেষ্টা তেমন দেখা যায় না। ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনি ও অনুরূপ অন্যান্য সংগঠনের প্রচেষ্টার ফলে বিশ-শতকের প্রথমপাদ থেকে নারী-শিক্ষার উন্নয়ন লক্ষ করা যায়। বঙ্গভঙ্গের পর নারী-শিক্ষা-কমিটির মাধ্যমে মুসলমান-নারীদের শিক্ষার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাছাড়া বিশ-শতকের প্রথম পাদে মুসলিম-নারী-শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

প্রসারে বেগম রোকেয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্দাপ্রথা, গোঁড়ামি, বালিকা স্কুলের স্বল্পতা, যোগ্য শিক্ষিকার অভাব, যাতায়াত ও আবাসিক সমস্যা, দরিদ্রতা ইত্যাদি মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল।[১০]

বিশ শতকের ঘুমন্ত মুসলিম সমাজ জাগরণে শেখ আব্দুর রহিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ সাহিত্যিক, সাংবাদিক এগিয়ে এসেছেন। সে সময়ে সংবাদ-পত্র প্রকাশ ও পরিচালনা করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। সে সময়ে একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আল-এসলাম' এসে মাথা উচু করে দাঁড়ায়।[১১]

এই বিশ-শতকের প্রথম দশকে শুধু বাংলায় নয়, উপমহাদেশের রাজনীতিতেও বিরাট পরিবর্তন ঘটে। উপমহাদেশে মলি-মিন্টো শাসন-সংস্কার, বাংলার বঙ্গবিভাগ রদ, তুরস্কের যুদ্ধ, বলকান যুদ্ধ, ইটালি কর্তৃক আবিসিনিয়া গ্রাস, সুয়েজখাল ও মিশরের উপর ব্রিটেনের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, জার্মানির উপনিবেশবাদ নীতি সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা, ইরানের উপর রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি, তুর্কি সাম্রাজ্য ভাগা-ভাগি করে নেয়ার ইঙ্গরূপ পরিকল্পনা প্রভৃতি ঘটনা মুসলিম জাহানকে আন্দোলিত করে।[১২] এই সময় অর্থাৎ **১৯১২** সালের দিকে প্রভাবশালী নেতা মওলানা মুহম্মদ আলী জওহর ও মওলানা আবুল কালাম আজাদের আবির্ভাব হয় কলকাতায়। তারা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদকে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের নিশ্চিহ্ন করার হুঁশিয়ারি দেন এবং আন্দোলনে নামেন। এ-সময়ে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকাও মুসলিম জাগরণে বিভিন্ন প্রতিবেদন,

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ ছাপতে থাকে। ফলে এর-ই ধারাবাহিকতায় বাংলার মুসলমানরা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অগ্রসর হয় এবং নিজেকে উন্মোচন করার সুযোগ পায়।১৩

এই সময় বিশ্ব রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতীয় রাজনীতিতেও বিশাল পরিবর্তন দেখা দেয়। এ সময় থেকে মুসলমান সমাজ নিজেদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। চাকুরির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার, দারোগা, সহকারি দারোগা পদে কিছু কিছু মুসলমান চাকুরি পেতে শুরু করে।

বিশ-শতকের তৃতীয় দশক থেকে শুরু হয় বাংলার ভিন্ন রাজনীতি। এই যুগের শুরুতেই মহাত্মা গান্ধী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে কংগ্রেস খেলাফত কমিটির ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সরকারের ভারত-সরকারের ভিত্তিমূল কেঁপে ওঠে।১৪ মাওলানা মোহাম্মদ আলী করাচিতে খেলাফত কনফারেন্সের সভাপতির ভাষণে ভারতীয় সৈন্যদের ব্রিটিশদের বশ্যতা ত্যাগ করার আহ্বান জানান। বাংলায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে ফরিদপুরের পীর বাদশা মিয়া, করটিয়ার চাঁদ মিয়া, কুষ্টিয়ার মৌলভী সামসুদ্দীন আহমেদ ও মৌলভী সদর উদ্দিন ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। আইন অমান্য করার অভিযোগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎ বসু প্রমুখ কারারুদ্ধ হন।১৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩১ সালে লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকে অসুস্থ মোহাম্মদ আলী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামেজ ম্যাকডোনাল্ডকে একটি দীর্ঘ লিখিত পত্র পেশ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে তা পঠিত হয়। পত্রে মোহাম্মদ আলী লিখেন–

> "ভারতকে স্বাধীনতা দাও, আমার মৃতদেহ স্বাধীন ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দাও এবং যদি তা না দাও, তাহলে আমার এই মৃতদেহ কোন স্বাধীন দেশে সমাহিত করো।"

দেশপ্রাণ মহান এই নেতা পরদিনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[১৬] এই-সময়ে শত শত নেতা কারারুদ্ধ, তখন চৌরিচৌরায় ব্রিটিশ বাহিনী হিংসাত্মক কার্যক্রম চালায় এমন সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ করে বন্ধ করে দেন।[১৭] এ কারণে কারারুদ্ধ নেতারা অসন্তুষ্ট হন।

এ সময়েই রাশিয়ার কমুনিস্টরা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তারই ধারায় এদেশে কমরেড মুজাফফর আহমেদ ও এম এন রায় এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ আরো অনেকে এদেশে কমিউনিষ্ট ভাবধারা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। এ সময়েই নাসির উদ্দিন 'মাসিক ও সাপ্তাহিক সওগাত' প্রকাশ করে নিত্য নতুন চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ করে দেন। এর-ই ধারাবাহিকতায় ৩য় দশকে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠী'। এই দশকে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী রাজনৈতিক মঞ্চে আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র পদে বসিয়েছেন।

বিশ-শতকের তৃতীয় দশকেও মুসলমানদের কোন দৈনিক পত্রিকা ছিল না। এ-সময় 'দি বাঙ্গালী', 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'দি সারভেন্ট' প্রভৃতি পত্রিকা মুসলমান জনমতের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। মুসলমানদের এই অসময়ে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক সওগাত প্রকাশ পায়। কিছুদিন পরে এগুলো মাসিক সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। মাসিক এই পত্রিকাগুলো 'প্রবাসি' ও 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকার সাথে পাল্লা দেয়ার কোন ক্ষমতা ছিল না।

এই সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরম হয়ে উঠে। ১৯৩১–৩২ সালের মধ্যে তিন তিনবার গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধিজী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একক প্রতিনিধি রূপে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। এই সভায় হিন্দু পন্ডিত মালব্য, ডাঃ নারে প্রমুখ নেতাদের কারণে মহাত্মা গান্ধী সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারেনি। তখনো মুসলিম লীগ প্রাসাদ রাজনীতিতে আবদ্ধ। পাঞ্জাবের মিয়া মোহাম্মদ শফী তখন মুসলিম লীগের প্রধান। প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাব কোনকালেই মুসলিমলীগকে পূর্ণ সম্মান দেয়নি। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখন বিলাতে আইন ব্যবসায় রত। এ-সময়ে মিয়া মোহাম্মদ শফী ইন্তেকাল করলে মুসলিম লীগের হাল ভেঙে যায়। বহুদিন এই অচল অবস্থা থাকার পর, একে সচল করার জন্য কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে অনুরোধ করে লন্ডন থেকে আনা হয় এবং তিনি মুসলিম লীগের হাল ধরেন। ১৮

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় মুসলমান কৃষকরা ঋণে জর্জরিত হয়ে উঠে। তাই এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কৃষকরা আন্দোলনে নেমে পড়ে। কিন্তু এই আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠেনি, কারণ তখন ভারতে স্বরাজ আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ, জালিওয়ালানবাগে নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষকে শাসিয়ে তুলেছিল। ১৯

১৯৩৬ সালে খাজা নাজিম উদ্দীন, নওয়াব হাবিবুল্লাহ, নওয়াব ফারুকী, স্যার আজিজুল হক, খাজা সাহাব উদ্দীন ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি অব বেঙ্গল' নামে একটি দল গঠনের তোড়জোড় করা হচ্ছিল। অন্যদিকে যশোহরের নওশের আলী, কুষ্টিয়ার সামসুদ্দিন আহমেদ, ফরিদপুরের হুমায়ন কবীর এবং বগুরার নওয়াবজাদা হাসান আলী প্রমুখ শেরেবাংলার নেতৃত্বে নিখিল বাংলা কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করেন। কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্ব ছাড়াও অন্যান্য সব পার্টির নেতৃবৃন্দেরা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃবৃন্দেরা নিম্নমধ্যবিত্ত হওয়ায় তাদের সাথে পল্লীর সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে।২০

১৮৩৫ সালের শাসন-সংস্কার বিধানের ফলে বাংলার 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' ও 'কৃষক প্রজা মুসলিম পার্টি'র মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখন মুসলিম লীগের ধারক-বাহক। তিনি কলকাতায় এসে উভয় দলকে একত্র করার চেষ্টায় ইউনাইটেড পার্টির ৮ জন, কৃষক প্রজা পার্টির ৫ জন এবং

Dhaka University Institutional Repository

কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মনোনীত ৭ জনকে নিয়ে একটি প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করেন। তার কিছুদিন পরে জমিদারি উচ্ছেদ এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে কৃষক-প্রজা দল উক্ত বোর্ড থেকে আলাদা হয়ে যায়। ১৯৩৭ থেকে ৪৭ সাল পর্যন্ত এই দশ বছর ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়েই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, ক্ষমতা হস্তান্তর। এর-ই ফলে সৃষ্টি হয় 'ভারত' ও 'পাকিস্তান'। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলে বৃটিশদের দুই শত বছর শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা হলে মুসলিম সমাজের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য বিপুল সাড়া পড়ে। নির্বাচনে ১১৯ টি সংরক্ষিত মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪০টি, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৮টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৪১টি আসন পায়। সাধারণ আসনগুলোর মধ্যে কংগ্রেস ৬০টি আসন পায়। পরিষদে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ট আসন না পাওয়ায় মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। অতপর কয়েকজন বর্ণ হিন্দু ও তফসিলি হিন্দুদের সমর্থনে ১০ জন সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠন হয়।[২১]

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে বড় লাট লিনলিথগো ব্রিটেনের পক্ষে ভারতের যুদ্ধে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। এ-ব্যাপারে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা করা হয়নি। কংগ্রেস যুদ্ধকালীন সরকারি নীতিকে সমর্থন ও সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার কারণে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাতটি প্রদেশ থেকে তাদের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়। ২২ ডিসেম্বর কায়েদে আযম মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

আলীর নির্দেশে ভারতের মুসলমানগণ 'নাজাত দিবস' পালন করেন। কংগ্রেস বিভিন্ন কাজে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাদের উপর আস্থা হারান। এ-সময় ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতির আলাদা দুটি রাষ্ট্র দাবী করেন।[২২]

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ লাহোর অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মুসলমানদের জন্য 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' গঠনের দাবি জানানো হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন প্রস্তাবের উপস্থাপক। ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতে দুটি 'স্বাধীন রাষ্ট্র' গঠনের দাবি উঠে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের এ-প্রস্তাব বাংলার মুসলিম লীগের প্রাণশক্তিতে বিপুল সাড়া জাগায়।[২৩]

১৯৪৩ সালের ১৩ এপ্রিল খাজা নাজিম উদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। এ মন্ত্রীসভায় ৭ জন মুসলমান ও ৪ জন হিন্দু ছিলেন। খাজা নাজিম উদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠনের অল্প কদিনের মধ্যে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ-সময় জাপান বার্মা আক্রমণ করার ফলে বার্মার অনেক উদ্বাস্তু এদেশে আশ্রয় নেয়। ফলে দুর্ভিক্ষ চরম আকারে পৌছে। জাপান ভারত আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল অনেক, তাই ব্রিটিশ সরকার এদেশের খাদ্যশস্য কিনে গুদামজাত করে এবং বহু যানবাহন নষ্ট করে রাখে, ফলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। সর্বনাশা এ দুর্ভিক্ষে প্রায় দুই লাখ লোক প্রাণ হারায়। ব্রহ্মদেশ জাপানিদের নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে সেখান থেকে চাল আমদানী বন্ধ হয়ে যায়।[২৪] এ

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতিতে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অক্লান্ত পরিশ্রম করে খাদ্যশস্য বিতরণ, সরবরাহ করার ফলে বহুলোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায়।

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট থেকে সারাদেশে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪২ সালের ২৬ শে এপ্রিল গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় 'ভারত ছাড়' আন্দোলন পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে এইমর্মে অনুরোধ করেন যে, তারা যেন ভারতীয় জনগণের স্বার্থে ভারতের শাসনভার ছেড়ে ব্রিটেনে চলে যায়। গান্ধীজী স্পষ্ট করে বলেন, বৃটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করলে এদেশ সম্ভবত জাপানিদের দ্বারা আক্রমণ হবে না। গান্ধীজীর এই মনোভাবের সূত্র ধরেই ১৯৪২ সালে ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কার কমিটি 'ভারত ছাড়' নীতি অনুমোদন করে।[২৫]

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে 'নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতি'র সভায় পণ্ডিত জওহেরলাল নেহেরু 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে অনিতিবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা দাবি করা হয়। ৯ই আগষ্ট প্রত্যুষে গান্ধীজী, পন্ডিত জওহেরলাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আচার্য কৃপালিনী, রাজেন্দ্রপ্রসাদসহ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। এ-আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করলে সরকার কঠোর নীতি অনুসরণ করে সারাদেশে কংগ্রেসের আরো অনেক নেতা ও কর্মীকে আটক করে। প্রায় তিন বছর কংগ্রেসের অনেক নেতাকে জেলে থাকতে হয়। রাজনীতি থেকে দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির সুযোগ মুসলীম

Dhaka University Institutional Repository

লীগ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এটা ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দাবি তুলেন, 'প্রথমে ভারত বিভক্ত কর, পরে ভারত ছাড়়' ।২৬

ভারতীয় রাজনীতির এই পটভূমিকায় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা রাজা গোপাল প্রচারী কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের দাবিকে বিবেচনা করে দেখার পরামর্শ দেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহ-গান্ধী আলাপ-আলোচনা হয়, কিন্তু তাঁরা মীমাংসায় আসতে পারেনি। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী মি. অ্যান্থনি ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এই বছর ছিল ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। কারণ, এ-নির্বাচনে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল অন্যভারত। অপরদিকে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের দাবির যথার্থতা প্রমাণ করা ।২৭

বাংলার রাজনীতিতে এ-সময় মুসলিম লীগের মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রাণের সঞ্চার হয়। এ-দেশের মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হতে থাকেন। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসিম আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ।২৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মুসলমানরা স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন। নির্বাচনে মুসলমানদের বিজয় সারা ভারতের এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হয়। কেউ কেউ একে 'ব্যালট বাক্সের বিপ্লব' বলে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। সোহরাওয়ার্দীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১১৯ টি আসনের মধ্যে ১১৩ টি আসন মুসলিমলীগ পায়। অতঃপর সোহরাওয়ার্দী পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং তার নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।[২৯]

১৯৪৬ সালের ৭ এপ্রিল তিনি মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যদের একটি কনভেনশন আহ্বান করেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভায় প্রায় ৫শ সদস্য এই বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে উদ্বোধনী বক্তৃতায় জিন্নাহ পাকিস্তান দাবির কথা বলেন। প্রস্তাবে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এর উত্তরে আবুল হোসেন বলেন–

> "মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমাঞ্চল থেকে অপর একটি দেশের এক হাজার মাইল ভূ-ভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং এ অবস্থায় দূরবর্তী অঞ্চল কখনো একরাষ্ট্রের রূপ পেতে পারবে না।"

এর জবাবে কমিটির সভাপতি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন–

> "লাহোর প্রস্তাবে States শব্দটির সাথে 'এস' শব্দটি টাইপের ভুলে যুক্ত হয়েছে। শব্দের জন্য কিছু আসে যায় না। উদ্দেশ্যই হল লক্ষণীয় বিষয়।"

Dhaka University Institutional Repository

এ-ভাবেই এই কনভেনশনে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাস্ট্রের দাবী করা হয়।৩০

এদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ২৭ শে এপ্রিল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র দাবি করেন। তিনি বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের দেশকে স্বাধীন ও মুক্ত করার আহ্বান জানান। বাংলার কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শরৎবসু, কিরণ শংকর রায়সহ অনেকে এ-প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একটি প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধশালী অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে পারত। কিন্তু এ-পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। কারণ অখণ্ড স্বাধীন ও বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব প্রকাশিত হলে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসে প্রতিক্রিয়াশীল নেতাগণ এর বিরোধিতা শুরু করেন।

হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মূখার্জি ও কংগ্রেস নেতাদের প্রচারণায় বাঙালি হিন্দুগণ প্রভাবিত হন। তাছাড়া মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও বাংলার মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশের নেতা খাজা নাজিমউদ্দিন, নুরুল আমিন, মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ অখণ্ড বাংলার ধ্যান-ধারণা প্রত্যাখান করে এবং ভারত বিভক্তির সাথে বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্তে সমর্থন জানায়।৩১

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারত বিভাগের নীতি ঘোষণা করেন। একদিকে কংগ্রেসি বুর্জোয়াদের বিরোধিতা, অন্যদিকে মুসলিম লীগের পকিস্তান দাবি মেনে নেয়ার পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। ফলে খণ্ডিত বাংলা (পূর্ব) স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভাবতে পারেনি যে, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও অন্যান্য লীগ নেতৃবৃন্দ বিভক্ত ও মাথাকাটা পাকিস্তান মেনে নিবেন। এভাবে বসু-সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান হয় এবং ১৯৪৭ সালে ১৪ ও ১৫ আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।৩২

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নাম নিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কাল বাংলাদেশের ইতিহাস পাকিস্তানি আমল। পাকিস্তান নামকরণের সঙ্গে লন্ডনপ্রবাসী ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ভারতীয় ছাত্র চৌধুরী রহমত আলীর নাম বিশেষভাবে জড়িত। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে চৌধুরী রহমত আলীর নেতৃত্বে একদল মুসলিম ছাত্র ‘পাকিস্তান’ শব্দ তৈরি করেন, তারা একটি নতুন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন, যার নামকরণ করা হয় “পাকিস্তান”। মোটকথা তারা পাশাপাশি অবস্থিত চারটি মূল ভূখণ্ডের আদ্যাক্ষর পরপর যুক্ত করেন। ‘পাকিস্তান’ রাষ্ট্র থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদ পড়েছিল। পূর্ববাংলার নাম গন্ধ এতে আগে থেকেই ছিল না।৩৩ তাছাড়া পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা মহাকবি স্যার মুহম্মদ ইকবাল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর পশ্চিম ভারতে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম ভারত বলতে, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে বুঝিয়েছিলেন। মুসলিম প্রধান সাম্প্রদায়িক পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশ তার চিন্তায় ছিল না। ইকবাল নিজেও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি চিন্তা করেননি। কারণ তিনি নিজে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তার জীবনদর্শন পাশ্চাত্যের নিরেট বস্তুবাদ ও প্রাচ্যের ইসলামী আধ্যাত্মবাদ চেতনায় গড়ে উঠেছিল। তিনি সে দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেছিলেন–"এটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় হোক কিংবা আওতা বহির্ভূত হোক আপত্তি নেই। তবে স্বায়ত্তশাসিত হবে।"[৩৪]

ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তানের জন্ম ছিল বিচ্ছিন্ন। এর দুটি অংশ পরস্পর থেকে ১৫০০ মাইল বিদেশী অঞ্চল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার-ঐতিহ্য এবং অর্থনীতি ছিল পরস্পর থেকে পৃথক। একমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করা যে শুভ হয়নি, পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ।

পাকিস্তান লাভের পর থেকেই শাসকচক্র পূর্ব-বাংলার জনগণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে কোণঠাসা করে রাখে। তারা পূর্ব বাংলার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শণ করত। পশ্চিমারা লিয়াকত আলী খানকে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পাকিস্তানের অধিবাসীদের শতকরা ৫৬ জনের বাস ছিল পূর্বপাকিস্তানে, অথচ বাঙালিকে সুযোগ দেয়া হয়নি। পাকিস্তানের 'রাজধানী' করাচিতে স্থাপিত হয় এবং পরে তা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হয়। দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দফতরও স্থাপিত হয় 'পশ্চিম পাকিস্তানে'।

বাংলাদেশ বিভক্ত হবার ফলে পরিষদ দলের নতুন নেতা নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বিভক্ত হবার ফলে পরিষদ দলের খাজা নাজি মউদ্দীন পরিষদের লীগ নেতা নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বাংলায় লীগ নেতা নির্বাচনে খাজা নাজিমউদ্দীন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট পরাজিত হয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর কৃপা দৃষ্টি লাভ করেন। পাকিস্তান গঠিত হলে তাকে পূর্ববাংলার মূখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।[৩৫]

ভারত ভাগ করার সময় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রশ্ন তোলেন – কলকাতাকে কেন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ভাগ করা যাবে না? তাছাড়া বাংলার সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যখন বাংলা ভাগ করার দাবি জানিয়েছে এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠ দল সরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তখন তারা সম্পূর্ণ কলকাতা পেতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় লীগ কর্তৃপক্ষ সীমানা কমিশনের সম্মুখে হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দীকে কোন সওয়াল জবাব করতে না দিয়ে যুক্ত প্রদেশের উকিল মিঃ ওয়াসিমকে নিযুক্ত করেন। মিঃ ওয়াসিম লীগের হাই কমান্ডের নির্দেশক্রমে র‍্যাডক্লিপ কমিশনের সম্মুখে কলকাতার উপর কোন দাবিই উত্থাপন করলেন না। খাজা

Dhaka University Institutional Repository

নাজিমউদ্দীনও কলকাতাকে দুই অংশে ভাগ করার ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করে স্বীয় স্বার্থেই কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন।

দেশ বিভাগের ফলে শুধু নেতারা নন; কলকাতাসহ পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও আসাম থেকে বহু সংখ্যক মুসলমান স্বেচ্ছায় অথবা বিতাড়িত হয়ে চলে আসেন তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে, সেই সাথে চলে আসেন শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম, ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, ড. এ বি এম মাহমুদ, ড.সিরাজুল ইসলাম– বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ-২০১০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫১০

২. ঐ

৩. ঐ। পৃষ্ঠা-৫১২

৪. গোলাম মুরশিদ– হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর পাবলিকেশ্‌ন, ২য় সংস্করণ-২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬১

৫. ঐ। পৃষ্ঠা-১৬২

৬. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুম– বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি, বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, মে-২০০৭, পৃষ্ঠা-২১১

৭. ড. মুহম্মদ আব্দুল বাকী–বৃটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে উপমহাদেশীয় উলামা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৫ বর্ষ, ১৫ তম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-১৮

৮. ইমরান হোসেন– বাঙ্গালী মুসলিম বুদ্বিজীবী চিন্তা ও কর্ম, প্রথম সংস্করণ-১৯৮৮, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩১২

৯. খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ– শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৮, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯

১০. ঐ। পৃষ্ঠা-২১৮

১১. আকবর উদ্দিন– মাওলানা আকরম খাঁর কাল ও তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম সংস্করণ-১৯৮৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮

১২. ঐ। পৃষ্ঠা-১০

১৩. ঐ। পৃষ্ঠা-১১

১৪. ঐ। পৃষ্ঠা-১৮

১৫. ঐ। পৃষ্ঠা-৩৬

১৬. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭.ঐ। পৃষ্ঠা-৩৭

১৮.ঐ। পৃষ্ঠা-৩৯

১৯.ঐ। পৃষ্ঠা-৪৩

২০.ঐ। পৃষ্ঠা-৪৪

২১.ঐ। পৃষ্ঠা-৪৬

২২.কে এম ফিরোজ খান–সিরাজউদ্দৌলা থেকে শেখ মুজিব, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১ম সংস্করণ-২০০৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৫৭

২৩.ঐ। পৃষ্ঠা-১৬১

২৪.ঐ।

২৫.ঐ। পৃষ্ঠা-১৬২

২৬.ঐ। পৃষ্ঠা-১৬৩

২৭.ঐ।

২৮.ঐ।

২৯.ঐ। পৃষ্ঠা-১৬৪

৩০.ঐ। পৃষ্ঠা-১৬৫

৩১.ঐ। পৃষ্ঠা-১৭০

৩২.ঐ। পৃষ্ঠা-১৭১

৩৩.ঐ।

৩৪.ঐ। পৃষ্ঠা-১৭৫

৩৫.ঐ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবির জন্মকাল, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্য-প্রতিভার সূচনা

ক) কবির জন্মকাল

খ) শিক্ষাজীবন

গ) কর্মজীবন

ঘ) সাহিত্য-প্রভিার সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

জন্মকাল

১৮৯১ সালের এপ্রিল মাসে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার বুনাগাতি ইউনিয়নের ঘোষগাতি গ্রামে শেখ হবিবর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেরাজতুল্লাহ, পিতামহের নাম হেরাজতুল্লাহ। তাঁর পূর্বপুরুষেরা আরব দেশ থেকে এদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। বসবাসের জন্য তিনি ঘোষগাতি গ্রামে জমি ক্রয় করে বাড়ি তৈরি করেন। শেখ হবিবর রহমানের বংশ পদবী শেখ না মণ্ডল এ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। ১৯১৭-১৮ সালে তাঁর এলাকায় এক সাহিত্য-সংঘ অফিস প্রতিষ্ঠা হয়। এ সাহিত্য-সংঘ কমিটিতে তাঁর নাম দেখা যায় শেখ হবিবর রহমান মণ্ডল। এ নামটি অবশ্য আর কোথাও পাওয়া যায়নি। তিনিও কোথাও লিখেননি, এমনকি কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলেও যাননি। তার বংশধরেরা শেখ পদবী ব্যবহার করেছেন। মণ্ডল বংশের কোন কারণ তারাও বলতে পারেন না। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে শেখ হবিবর রহমান ছিলেন সবার বড়। ছোট বোনের বিয়ে হয় পাশের গ্রামে। ছোট ভাই শেখ ফজলর রহমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি ধর্মপ্রচার করতেন এবং 'পুলম আঞ্জুমানে হেমায়তল ইসলাম' নামে একটি ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৯ সালে তাদের তিন ভাই বোনকে

Dhaka University Institutional Repository

রেখে তাঁর পিতা মারা যান, ফলে পরিবারে শোকের ছায়া এবং আর্থিক দীনতা নেমে আসে। নানা অভাব-অনটনের মাধ্যমে তারা বড় হন। শেখ হবিবর রহমান ১৯২৯ সালে মাগুরা জেলার বেরইল থানার খন্দকার হাতেম আলীর কন্যা আশরাফুন্নেসার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৩০ সালের ১৫ জানুয়ারি তাদের ঘর আলোকিত করে আসে প্রথম পুত্র সন্তান। তার নাম মাহবুবুর রহমান। তিনি খুলনা শহরের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। তাঁর দ্বিতীয় অর্থাৎ কনিষ্ঠ পুত্র সামসুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৩ সালের ২৫ শে জানুয়ারি।[১]

আশরাফুন্নেসা খুবই রূপসী ছিলেন। এই রূপসী তাঁর রূপের মায়াজালে কখনোই বেঁধে রাখতে পারেননি সংসার বৈরাগী এই মানুষটিকে। শেখ হবিবর রহমান ভাবুক প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় সংসারের প্রতি তিনি ছিলেন উদাসী। ছুটিতে কর্মস্থল থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরলেও গ্রামের সভা-সমিতি ও গ্রামের মানুষের সাথে আড্ডা দিয়ে ছুটি শেষ করে তিনি আবারো চলে যেতেন কর্মস্থলে। সংসারে নিরিবিলি সময় তিনি দেননি। একমাত্র ভাই শেখ ফজলর রহমানের হাতেই ছিল সংসারের পুরো দায়িত্ব। তিনিই সংসার পরিচালনা করতেন। বড় ছেলে মাহবুবুর রহমান তাঁর বাবা সম্পর্কে বলেন– "পড়াশুনা ও লেখালেখি নিয়েই তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন এবং তার হাতের প্রতিটা সময়ই তিনি এই কাজে ব্যয় করতেন। সংসারের খুটিনাটি বিষয়ে তিনি উদাসী ছিলেন তবে সংসারের প্রতি দায়-দায়িত্ব তার কম ছিল না। আমাদের পড়াশুনায় তিনি খুব মনোযোগী ছিলেন এবং কঠোর ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমান কলকাতায় অবস্থান কালে তার দুই ছেলে তাঁর সাথে থাকত এবং দুজনই কলকাতা হেয়ার স্কুল ও রিপন কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করতো। প্রত্যেক ছুটিতে তিনি বাড়ি আসতেন এবং ছুটি কাটাতেন। তার ছুটির দিনগুলো পারিবারিকভাবে না কাটিয়ে সামাজিক সমস্যা ও সাহিত্য সংগঠনে ব্যয় করতেন বেশি। শেখ হবিবর রহমান তার 'সাহিত্য জীবনী'তে তাঁর সংসার জীবন সম্পর্কে লিখেছেন– "আমার সংসার জীবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলভী শেখ ফজলর রহমানের উপর সমুদয় সংসারের ভার চাপাইয়া দিয়া আমি একরূপ নির্মুক্ত জীবন অতিবাহিত করিবার সুযোগ পাইয়াছি। বলিতে কি পুস্তক ছাপিতে গিয়া বাড়িতে খরচও অনেক সময় দিতে পারি নাই। চাকুরী করিয়া অর্থ সঞ্চয় দূরে থাকুক অনেক সময় ঋণের বোঝা মাথায় চাপিয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেজন্য তাহার কোন অসন্তোষ আমরা লক্ষ্য করি নাই।"[২]

শেখ ফজলর রহমান পাশ্ববর্তী গ্রামের 'পুলম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে'র প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শেখ হবিবর রহমান সংসারের প্রতি খুবই উদাসীন থাকায় ছোট ভাই শেখ ফজলর রহমান তার পরিবার দেখাশুনা করতেন। শেখ হবিবর রহমান সংসারের খরচ অনেক সময়ই দিতে পারতেন না। এমন কি বই প্রকাশের খরচও তার ছিল না। শেখ ফজলর রহমান দুটো পরিবারের দেখভালের পাশাপাশি শেখ হবিবর রহমানের অনেক গ্রন্থ প্রকাশও করেছেন। দুই ভাইয়ের মিল এই সংসারে উদাহরণ হয়ে থাকার মতো। শেখ ফজলর রহমান ১৯৬১ সালে মারা যান। ভাইয়ের মৃত্যু শোকে শেখ হবিবর রহমান মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তিনি আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি কখনো।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের লেখাপড়ার হাতেখষড়ি শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায় । ১৮৯৫ সালে তিনি পুলম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হন। বিদ্যালয়টি তাঁর নিজ গ্রাম ঘোষগাতির উত্তর পাশে অবস্থিত। গ্রাম থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিল খুবই কম। এক মাইল প্রায়। বাড়ির অন্যান্য ছেলের সাথে দল বেঁধে শেখ হবিবর রহমান স্কুলে যেতেন।[৪]

পুলম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন শেখ হবিবর রহমান। পুলম স্কুলের পড়ালেখা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে শেখ হবিবর রহমান চলে যান খুলনার পয়গ্রাম কসবায়। ১৯০০ সালে তিনি পয়গ্রাম কসবা মাইনর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। প্রায় দুই বৎসর এই স্কুলে পড়াশুনার পর পড়াশুনা বন্ধ দিয়ে তিনি চলে যান দক্ষিণডিহী নওয়াদালি পল্লীতে। সেখানে গিয়ে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন। তাঁর শিক্ষা-জীবনের বৈচিত্র নিয়ে তিনি 'ধামার সাহিত্য-জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন–

"পয়গ্রাম কসবায় আমি একক্রমে দুই বৎসরের অধিককাল কাটাই নাই। তাহার পর কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। পয়গ্রাম কসবায় অনিতিদূর দক্ষিণদিহী গ্রামের নওয়াদালি পল্লীতে এবং দামোদরে মৌলভী আব্দুল মজিদ সাহেবের

বাটীতে আমি ৭/৮ বৎসর কাল কখন মাদ্রাসায় পড়িয়া, কখনও স্কুলে পড়িয়া কাটাইয়াছিলাম।

বাটীর মুরব্বীদের ইচ্ছা ছিল আমাকে ইংরাজী পড়ান, কিন্তু আমার মত ছিল আরবী-পারসী পড়া। এই দুই মতের সংঘর্ষ আমাকে ধ্বংস করিয়াছে।

ইংরেজীর প্রতি একটি বিজাতীয় ঘৃণা তখন আমার মনের মধ্যে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল।"[৫]

পয়গ্রাম কসবায় প্রাকৃতিক রূপ-সৌন্দর্য দেখে কবি বিমোহিত হয়ে পড়েন। কবিকে খুব-ই মুগ্ধ করে কসবার প্রকৃতি। সেই রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তিনি কবিতা লিখতেন।

প্রায় তিন বৎসর লেখাপড়া বন্ধের পর ১৯০৫ সালে শেখ হবিবর রহমান ফুলতলা মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তখনকার বিশিষ্ট লেখক মৌলভী মোহাম্মদ কাসেম কবিকে ফুলতলা মাদ্রাসায় ভর্তি ক'রে দেন। এখানে এসে কবি প্রথমে রানাগাতিতে কয় মাস জায়গীর থাকেন। তারপর তিনি ফুলতলা বাজারে একটি মুদির দোকানে চাকুরি নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যান। মাদ্রাসার পড়াশোনায়ও কবির তেমন মনোযোগ ছিল না। সাহিত্য-চর্চা ও কবিতা রচনায় শেখ হবিবর রহমানের অধিকাংশ সময় ব্যয় হতো। ফুলতলা মাদ্রাসায় পড়ালেখার সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য-চর্চার নেশা। এ নেশা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর আর্থিক দৈন্য ছিল বিধায় তিনি পড়াশোনা নিজেই বন্ধ করে দেন। তখন তাঁর নিকটতম আত্মীয় আব্দুর রাজ্জাক মিয়া কবিকে নিয়ে যশোহরে যান এবং

Dhaka University Institutional Repository

'যশোহর জেলা-স্কুলে' ভর্তি করে দেন। কিন্তু সেই স্কুলের লেখাপড়ার প্রতি শেখ হবিবর রহমানের মন বসেনি। তার উপরে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। কবি ফিরে আসেন নিজ গ্রাম ঘোষগাতিতে। ধীরে ধীরে কবি সুস্থ হয়ে উঠেন। কদিন পর তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন ফুরফুরার পীর সাহেব। পীর সাহেব কবির প্রতিভার পরিচয় লাভ করে কবিকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং তাঁর নিজ মাদ্রাসায় তাঁকে ভর্তি করে দেন। এখানে কবিকে জায়গির থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া ঠিক হলেও, তাঁর মন টিকেনি। কবি আবারো চলে এলেন নিজ গ্রামে। কদিন বাড়িতে থেকে তিনি স্বেচ্ছায় গেলেন নড়াইলে। এখানেও কবির মন টিকেনি, আবারো তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। তারপর ১৯০৮ সালে তিনি ফুলতলা মাদ্রাসা থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে 'যশোহর জেলা-স্কুলে' ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখানে কবি নিজ মহকুমা মাগুরার অনেক বন্ধু-বান্ধব পেয়ে যান। তাদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন মুন্সি মেহেরুল্লাহর নামে একটি সংগঠন 'মেহেরুল এসলাম সভা'। ১৯১০ সালে তিনি এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। আই এ পাশ করার পর এই কলেজেই তিনি বি. এ ভর্তি হন। ১৯১৪ সালৈ শেখ হবিবর রহমান বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে মাসিক 'মোহাম্মদী'তে সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ম্যানেজার ছিলেন মোহাম্মদ সোলায়মান খান। মাসিক 'মোহাম্মদী'তে বেশ ক'দিন চাকুরি করা অবস্থায় তাঁর বি. এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। তিনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় চাকুরি ছেড়ে দেন। তারপর ১৯১৪ সালের শেষভাগে তিনি যশোহর জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদে যোগ দেন। প্রায় আট বছর তিনি এ স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২২ সালে শেখ হবিবর রহমান যশোহর জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষকের চাকুরী ছেড়ে কলকাতা এল. টি. (Licention Teacher) পড়তে যান। এক বছর মেয়াদী ট্রেনিং সমাপ্তির পর ১৯২৩ সালে শেখ হবিবর রহমান 'বারাসাত গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে' সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশিদিন থাকলেন না। মাত্র নয় মাস চাকুরী করার পর রিট্রেসমেন্ট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বারাসাত হাই স্কুলের সংশ্লিষ্ট পদটির অবলুপ্তি ঘটলে তাকে ১৯২৪ সালে মক্তব-সাব ইন্সপেক্টর রূপে খুলনায় বদলি করা হয়। এখানে তিনি নতুন কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন খুলনা হতে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলি হন। ১৯৪৪ সালে এ স্কুলের সহকারী শিক্ষকের চাকুরী হতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ছয় বছর অবসর থাকার পর ১৯৫১ সালে খুলনায় করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদে যোগ দেন এবং ১৯৬০ সালে তিনি দ্বিতীয়বার অবসর গ্রহণ করেন।

শেখ হবিবর রহমান আজীবন মূলত শিক্ষকতার পেশা অবলম্বন করেছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি আজীবন তিনি নিরলসভাবে নি:স্বার্থ সাহিত্য-সাধনা করে গেছেন। তিনি ১৯১৫-১৯৪৪ এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত দুই দফায় শিক্ষকতা করেছেন। দ্বিতীয় দফায় অবসর গ্রহণ করার মাত্র দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯৬২ সালের ৭ই মে তিনি পরলোক গমন করেন। এই মনীষী খুলনার টুটপাড়া গোরস্তানে দাফন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম-জীবন

সাহিত্যচর্চা ও রচনায় শেখ হবিবর রহমানের অধিকাংশ সময় ব্যয় হতো। ফুলতলা হাইস্কুলে পড়া-শোনার সময় থেকেই তাঁকে সাহিত্যচর্চার নেশা এমনভাবে পেয়ে বসে হঠাৎ করে তিনি পড়াশোনা বন্ধ করে দেন। তাছাড়া এ-সময় তাঁর আর্থিক দীনতাও ছিল অনেক। তার এই দুঃসময়ে এগিয়ে আসেন খুলনা স্কুলের সাব ইন্সপেক্টর মৌলভী আজিজ ঢালী। তিনি শেখ হবিবর রহমানকে শাহপাড়া উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে হেড পণ্ডিতের পদে নিয়োগ দেন। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম চাকুরি। চাকুরির অভিজ্ঞতা নিয়ে শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন– "ছেলেরা তাঁহার নতুন গুরুকে প্রথম দিন দেখিতে আসিয়া বিস্মিত হইল। একজন ভদ্রলোক প্রথমদিন আমাকে সমজাইয়া দিলেন–'খুব সাবধান, গম্ভীরভাবে থাকিবেন। আপনার অল্প বয়সের জন্য কানাঘুষা চলিতেছে। আপনাকে ছেলেরা মানিবে না এইরূপ সবার অনুমান। দুই একদিন চলিয়া গেল। একদিন এক ভদ্রলোক আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ' মেঘনাদ বধ' কাব্যের সপ্তম স্বর্গেও ট্রাজেডির অর্থ বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। ' মেঘনাদ বধ' কাব্য তখন আমার জপমন্ত্র। ঐ ট্রাজেডি তখন আমার মুখস্থ ছিল সুতরাং বুঝাইয়া দিতে আমার কোন অসুবিধা হইল না। পরীক্ষায় পাস পাইলাম। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। আমাদের ওস্তাদজি বড়ই পণ্ডিত।"[৭]

Dhaka University Institutional Repository

এই স্কুলের হেড পণ্ডিতের চাকুরিতে শেখ হবিবর রহমানের মন বেশিদিন টিকলোনা। তিনি চাকুরি ছেড়ে দিলেন। চাকুরি ছেড়ে তিনি আবারো পড়াশোনায় মন দিলেন।

১৯১৪ সালে শেখ হবিবর রহমান 'মাসিক মোহাম্মদি'তে সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ম্যানেজার ছিলেন মোহাম্মদ সোলেমান খান। মাসিক মোহাম্মদিতে বেশ ক'দিন চাকুরি করা অবস্থায় তাঁর বি এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়। তিনি পরীক্ষার অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি মাসিক মোহাম্মদীর চাকুরি ছেড়ে দেন। তার কয়দিন পর অর্থাৎ ১৯১৪ সালের শেষভাগে তিনি যশোহর জেলা স্কুলের সহকারি শিক্ষকের পদে যোগ দেন। প্রায় আট বছর তিনি এ স্কুলে সহকারি শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন– "আমি যতদিন শিক্ষকরূপে যশোহরে ছিলাম, বরাবরই হোষ্টেলের সুপারেন্টেনডেন্ট পদে কার্য্য করিয়াছি। অনেক সময় হোষ্টেলের অধিকাংশ কার্যভার আমার উপর ন্যস্ত থাকিত। কতদিন সমস্ত রজনী হোষ্টলের কল্যাণ চিন্তায় কাটাইয়াছি। যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবল তরঙ্গে সমস্ত ভারত আলোড়িত। তখন আমাদের হোষ্টেলটিকে নিরাপদ রাখিবার জন্য কতই না চেষ্টা পাইতে হইয়াছে। কত চিন্তায়, কত উদ্বেগে, কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছে। ছাত্রগণকে চরিত্রবান করিতে নিয়মিত নামাজ ইত্যাদি ধর্মে কর্মে অভ্যস্ত করিতে স্বীয় কর্তব্য অবহিত রাখিতে কতইনা চিন্তা ও চেষ্টা করিয়াছি।"৮

১৯২২ সালে শেখ হবিবর রহমান যশোহর জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষকের চাকুরি ছেড়ে কলকাতা এল টি পড়তে যান। এক বছর মেয়াদি ট্রেনিং সমাপ্ত করে ১৯২৩ সালে শেখ

Dhaka University Institutional Repository

হবিবর রহমান বারাসাত গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশিদিন থাকিলেন না। মাত্র নয় মাস চাকরি করার পর রিট্রেসমেন্ট কমিটির রিপোর্ট অনূযায়ি বারাসাত হাই স্কুলের সংশ্লিষ্ট পদটির অবলুপ্তি ঘটলে ১৯২৪ সালে মক্তব সাব-ইন্সপেক্টররূপে খুলনায় বদলি করা হয়। এখানে তিনি নতুন কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন খুলনা হতে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলি হন। এখানে প্রায় তিন বছর চাকুরি করার পর ১৯৩০ সালে বারাকপুর হাইস্কুলে বদলি হন তিনি। ১৯৪৪ সালে এ স্কুলের সহকারি শিক্ষকের পদে চাকরি হতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ ছয় বছর অবসর থাকার পর ১৯৫১ সালে খুলনায় করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদে যোগ দেন এবং ১৯৬০ সালে তাঁর এ অতিরিক্ত কর্মজীবন থেকে দ্বিতীয়বার অবসর গ্রহণ করেন।

শেখ হবিবর রহমান আজীবন মূলত শিক্ষকতা পেশা অবলম্বন করেছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি আজীবন তিনি নিরলসভাবে নিস্বার্থ সাতিহত্য সাধনা করে গেছেন। তিনি ১৯১৫–১৯৪৪ এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত দু'দফায় শিক্ষকতা করেছেন।[৯] দ্বিতীয় দফায় অবসর গ্রহণ করার মাত্র দুবছর পর অর্থাৎ ১৯৬২ সালের ৭ই মে তিনি পরলোক গমন করেন। এই মনীষীকে খুলনার টুঁটপাড়া গোরস্থানে দাফন করা হয়।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য জীবনের সূচনা

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সাহিত্য-রচনার হাতেখড়ি প্রথম ঘটে পুলম স্কুলে উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণিতে পড়ার সময়। বাল্যকাল থেকেই শেখ হবিবর রহমানের কথা-বার্কায় ভাবুকত্বের ছাপ ফুটে উঠে। শেখ হবিবর রহমান যখন ফুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন স্কুলের হেড পণ্ডিত তাঁকে 'প্রবন্ধ' লেখার আদেশ দেন। শিক্ষকের নির্দেশে শেখ হবিবর রহমান 'গোজাতির প্রতি অত্যাচার' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি দেখে হেড পণ্ডিত মুগ্ধ হন। তারপর থেকে প্রায় সময় তিনি হেড পণ্ডিতের সাথে কবিতাযুদ্ধে লিপ্ত হতেন। এ-সময়ে শেখ হবিবর রহমানের চিত্তে কাব্য-প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে এবং তাঁর নাম চারদিকে ছড়াতে থাকে। এটি তাঁর জীবনের প্রথম রচনা। অতঃপর তিনি মাগুরা স্কুলে বাংলা পরীক্ষায় 'শ্রমশীলনা' নামে একটা রচনা লিখে তিনি স্কুল-শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন–

"যখন পুলম উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়িতাম, তখনই সর্বপ্রথমে প্রবন্ধ লিখিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। আমাদের হেড পণ্ডিত মহাশয়ের নাম ছিল শ্রীযুক্ত বাবু শশাঙ্ক নাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রামের সাধারণ ছেলেরা যেমন এ জাতীয় মানগুলোকে বাঘভাল্লুকের ন্যায় ভয় করে, আমিও সেইরূপ করিতাম। আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে এই পণ্ডিত মহাশয় 'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ বুঝিতেন পদ্য। তাই সেই সুদূর শৈশব জীবনেই আমাকে বাধ্যতামূলক 'প্রবন্ধ' অর্থাৎ পদ্য লিখিতে হইয়াছিল। আমার বেশ স্মরণ আছে, প্রথম যে প্রবন্ধ অর্থাৎ

পদ্য লিখিবার ভার আমার উপর অর্পিত হয়। তাহার নাম ছিল 'গো-জাতির প্রতি অত্যাচার'। আমি তাঁহার সে পংক্তিতে লিখিয়াছিলাম–

"কেমন নিষ্ঠুর ভাবে যষ্ট্যাঘাত করে"। সম্ভবত তাহার প্রথম চরণে– "দেখ না মাঠেতে ঐ রাখাল নিকরে"

এইরূপ কিছু ছিল।

এই সময় আমার কবিতা লেখা হউক বা না হউক, ব্যাকরণের স্বর-সন্ধিটা যে কতকটা শিক্ষা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তারপর এক বৎসরে উচ্চ প্রাথমিক পড়া শেষ করিয়া যখন মাগুরায় বাঙ্গলা সাহিত্যের পরীক্ষা দিতেছিলাম, তখন 'শ্রমশীলতা' সম্বন্ধে একটি রচনা লিখিবার প্রশ্ন ছিল। আমি সেই পরীক্ষা-গৃহে বসিয়া ছয় লাইন পদ্য মিলাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। তাহা পড়িয়া পরীক্ষক যে খুব-ই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ করি না। তবে সেজন্য কোনরূপ মেডেল পাই নাই। হয়ত তিনি তাহা পাঠাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"[১১]

শেখ হবিবর রহমানের চাচাত ভাই শেখ আয়েজুদ্দিন 'পদ্যমালা' ১ম ভাগ নামক একটি কবিতার বই সে-সময় হবিবর রহমানকে উপহার দিয়েছিলেন। সে গ্রন্থের কবিতাগুলো হবিবর রহমানের মনের উপর বেশ জোড়ালো প্রভাব ফেলে। কবির চাচাত ভাই শেখ মুন্সি আয়েজুদ্দিন আহমেদের সাথে তখন 'বামনখালি প্রাইমারী স্কুলে'র একজন পন্ডিতের সাথে কবিতা ও অংক বিষয়ক রচনা নিয়ে প্রায়-ই তর্ক যুদ্ধ হতো। এ লড়াই উপভোগ করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

আশে-পাশের গ্রামের শিক্ষিতজনরা এসে ভীড় করত। কবি শেখ হবিবর রহমান তখন তাঁর চাচাত ভাইকে কবিতা লিখে দিয়ে সাহায্য করতেন।

প্রাথমিক স্কুলের বিদ্যা শেষে শেখ হবিবর রহমান খুলনার পূর্বোক্ত পয়গ্রাম কসবায় অধ্যয়নকালে কবির বন্ধু ছিলেন মহিউদ্দিন, কাজী এনামুদ্দিন, গোলাম সারোয়ার, ফজলুর রহমান এবং রাজা। রাজা মিয়া তখন পড়তেন যশোহর স্কুলের ৩য় শ্রেণিতে। তার সাথে কবি শেখ হবিবর রহমানের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই রাজা মিয়া শেখ হবিবর রহমানকে সাহিত্য-চর্চা ও কবিতা রচনার জন্য বেশ উৎসাহ দিতেন। কবি তার আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন–

"এই রাজা বাহাদুরের নিকট আমি আমার সাহিত্য-জীবনের জন্য বহুল পরিমানে ঋণী। তিনি আমাকে অনেক সময় কবিতা লিখিতে উৎসাহ দিতেন। সময় সময় আমি তাঁহার নিকট পত্রাদি লিখিতাম। আমাকে প্রত্যেক পত্র কবিতায় লিখিবার জন্য হুকুম নামা জারি করা হইয়াছিল। পত্র-সাহিত্য আমার প্রাথমিক জীবনে সাহিত্য-চর্চ্চার একটি অবলম্বন ছিল।"[১২]

পয়গ্রাম কসবায় অবস্থানকালে কিশোর হবিবর রহমান, পণ্ডিত গোলাম রহমানের বিশেষ স্নেহ লাভের ফলে তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে পড়াশোনার সুযোগ পান। বন্ধুরা যখন দল বেঁধে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় নাচ-গান দেখতে যেতো, তখন শেখ হবিবর রহমান তাঁদের সাথে না গিয়ে, একা একা বই পড়ায় নিমগ্ন থাকতেন। এ সময়ে মানকুমারী বসুর 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি' এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক' তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। শেষোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যখানি তাঁর মুখস্থ ছিল। মাঝে মাঝে একা একা তিনি কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন। মাইকেল মধূসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যটি কিশোর বেলায় তিনি রপ্ত করে ফেলেন।

পয়গ্রাম কসবার প্রাকৃতিক রূপ-সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করে। তিনি সেই রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে কবিতা লিখতেন। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে–

" সেই সুদুর অতীত যুগের অনেক স্মৃতি এখন আমার নিকট অনেক ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ-কথা বেশ বলিতে পারি আমার জীবনের সমস্ত কবিত্বের মূল উৎস এই স্থানে। অতি শৈশবেই পয়গ্রাম কসবা সম্পর্কে নানা বিচিত্র গল্প শুনিতাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে এক অভিনব কল্পনায় স্বপ্নছবি জাগিয়া উঠিত। আজ সেই স্বপ্ন-পুরীতে আসিয়া যেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেলাম। এই স্থানের, এই কল্পনা রাজ্যের প্রত্যেক ব্যাপার-ই আমাকে নতুন নতুন কবিত্বের উপকরণ যোগাইয়াছে। সেই বন্ধু-বান্ধব, সেই তরুলতা, সেই রাস্তাঘাট, সমস্তই যেন আমার নিকট মূর্ত্তিমতী কবিতা বলিয়া প্রতিভাত হইত।"[১৩]

প্রিয় জন্মভূমি ঘোষগাতি ছেড়ে কবি কসবায় এসে আত্মীয়, পরিবার-পরিজনদের বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় যেমন ব্যথিত হতেন, কসবার পয়গ্রামের প্রাকৃতিক রূপ-সৌন্দর্য কবিকে সেসব ভুলিয়ে নতুনরূপে বাঁচার প্রেরণা প্রেরণা দিত। উপযুক্ত রৌদ্র-বাতাস না পেলে আবহাওয়া অনুকূল না থাকলে, বীজ হতে চারা উৎপন্ন হয় না। তেমনি উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে কাব্য-প্রতিভারও প্রকাশ ঘটে না। কবি পয়গ্রাম কসবা সম্পর্কে তাই লিখেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

"যদি সেই বাল্যজীবনে পয়গ্রাম কসবার ন্যায় একটি উন্নত স্থানে আমি থাকিবার সুবিধা না পাইতাম, অনেকগুলি উপযুক্ত বন্ধু-বান্ধবদের সাহচর্য্যের সুযোগ না পাইতাম, তবে আজ যে দু'চার লাইন পদ্য মিলাইয়া অনেক পাঠকের কর্ণজ্বালা বাড়াইতেছি, এটুকু দুর্ঘটনা হয়ত ঘটিত না।"১৪

পয়গ্রাম কসবাই শেখ হবিবর রহমানকে দিয়েছে কাব্য-রচনার উৎসাহ ও প্রেরণা। পয়গ্রাম কসবার নিকটস্থ গোলাম রহমান সাহেবের পারিবারিক লাইব্রেরীতে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন থাকতেন। লাইব্রেরীটি অনেক মূল্যবান বইয়ে ভরপুর ছিল। গোলাম রহমান সাহেবও শেখ হবিবর রহমানকে নানাভাবে পড়াশুনায় সহযোগিতা করতেন।

পয়গ্রাম কসবা মাইনর স্কুলে প্রতি শনিবারের ছুটির পর একটি সাহিত্য-সভার অধিবেশন হতো। এতে নানা রকম সাহিত্য পাঠ হত। শেখ হবিবর রহমান এই সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। 'কসবা মাইনর স্কুলে' পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে শেখ হবিবর রহমান বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মুন্সি মেহেরুল্লাহর সান্নিধ্য পান।। মুন্সি মেহেরুল্লাহর উপস্থিতিতে এক ধর্ম-সভায় শেখ হবিবর রহমান দুটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতা দুটি শুনে মেহেরুল্লাহ মুগ্ধ হন এবং তাকে ধরে আশীর্বাদ করেন এবং সে সভায় মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ শেখ হবিবর রহমানকে 'শিশু কবি' উপাধি দেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যপুস্তকের নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলে শেখ হবিবর রহমানের মন কখনোই বসেনি। অবসর পেলেই নানা রকম বই পড়তেন তিনি। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের মত জটিল কাব্যও তিনি ভাললাগার টানে পড়ে ফেলেছেন। সেই অনুভূতি নিয়ে তিনি তাঁর 'সাহিত্য-জীবনী'তে লিখেছেন–

"পড়িয়া পড়িয়া বহিখানি একরূপ মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। এমন কঠিন একখানি পুস্তক পড়িতে কোন শিক্ষকের প্রয়োজন হইল না। প্রাণের ভালবাসা যেখানে কাজ করে, সেখানে কোন বিঘ্ন টিকিতে পারে না। প্রেম-ই সিদ্ধির সোপান। সাহিত্যক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য। প্রেম ব্যতীত আর যে কাজই হউক, সাহিত্য-সাধনা চলতে পারে না। প্রেম-ই ত কবিতার প্রাণ।

পুস্তক কিনিবার সামর্থ ছিল না! যাহার নিকট থেকে চাহিয়া আনিতাম, নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার পর তাহাকে আবার বহি (মেঘনাদ বধ কাব্য) ফেরৎ দিতে হইত। পুস্তকখানির সহিত বিচ্ছেদ আমার অসহ্য মনে হইতে লাগিল। অগত্যা শেষে সমগ্র 'মেঘনাদ বধ' কাব্যখানি হাতে লিখিয়া লইলাম।" ।১৫

শেখ হবিবর রহমান শেষে সমগ্র 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রভাবে প্রভাবিত হন। তখন থেকেই শেখ হবিবর রহমান অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লেখায় আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনায় আত্মমগ্ন হন। তিনি লেখেন জাহাঙ্গীর ও নূও

Dhaka University Institutional Repository

জাহানের প্রেম নিয়ে ‘প্রণয় রাক্ষস’ বা ‘শের সংহার কাব্য’। তারপর রচনা করেন ‘মহাপ্রলয় কাব্য’। এ দুটি কাব্য মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এ দুটি কাব্য পড়ে মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এবং এবং সাহিত্য বিশারদ শেখ ফজলল করিম উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এত উচ্ছসিত প্রশংসা পেয়েও শেখ হবিবর রহমান খুশি হতে পারেননি। কারণ তাঁর বহু কষ্ট ও সাধনায় রচিত গ্রন্থ দুটি তিনি মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে পারেননি।

‘পেচক পণ্ডিত’ নামক কবিতাটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা বলা হলেও কবির ‘খোদার উদ্দেশ্যে বিলাপ’ নামক কবিতাটি তারপূর্বে ‘আল হক’ পত্রিকায় ছাপা হয়। তারপর ছাপা হয় ১৩১৪ সালের ১৫ আশ্বিন ‘মোসলেম সুহৃদ’ এবং ১৮ ই আশ্বিন ‘মিহির সুধাকর’ পত্রে শেখ হবিবর রহমানের ‘পেচক পণ্ডিত’ কবিতাটি। এটি-ই তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতা। কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল–

পেচক পণ্ডিত আমি চিন কি আমারে

কে আমার গুণপনা জানেনা সংসারে

থাকি আমি বনঝাড়ে বিটপী উপর

কাঠের কোঠর সম কোঠার ভিতর।১৬

শেখ হবিবর রহমান ফুলতলা জুনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন মাদ্রাসার সেক্রেটারি মৌলভী মোহাম্মদ কাসেম শেখ হবিবর রহমানকে একদিন আলোচনার ফাঁকে ‘ মৌলুদ শরীফ’ রচনা করার পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শ মতে শেখ হবিবর রহমান মাত্র ১৫ বছর বয়সে ‘ মৌলুদ শরীফ’ রচনা করেন। তার রচিত ‘ মৌলুদ শরীফ’ দেখে সবাই অভিভূত

হয়ে যান। ১৯০৬ সালে মাত্র পনের বছর বয়সে শেখ হবিবর রহমান বিখ্যাত 'কোহিনূর কাব্য' রচনা করেন।

পয়গ্রাম কসবায় প্রায় দুই বৎসর অতিবাহন করার পর শেখ হবিবর রহমান নিকটস্থ গ্রাম নওয়াদালি পল্লীতে কিছুদিন এবং দামোদরে আব্দুল মজিদ সাহেবের বাড়িতে ৭/৮ বৎসর সময় থেকে ফুলতলা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। 'নবনূর' পত্রিকাটি তখন বাজারে নতূন। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক মৌলভী কাজী এমদাদুল হকের সাথে শেখ হবিবর রহমানের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। শেখ হবিবর রহমানের কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপানোর তাগিদে তিনি নানা পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। এমনকি ফেরত খাম ও টিকেটসহ পাঠাতেন। তবু কোন সম্পাদক তাঁর কবিতা ছাপেননি। তিনি তাঁর কবিতা ছাপানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা করতেন।

১৩১১ সালের শেষভাগে শেখ হবিবর রহমান অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লেখায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি 'শের সংহার' কাব্যটি রচনা করেন। বাড়িতে বসে কখনো বা মাঠে বসে কবি কাব্য গ্রন্থটির সমাপ্তি টানেন। ১৩১২ সালের ৪ঠা বৈশাখ গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়। কাব্যটি প্রকাশে একদিকে শেখ হবিবর রহমানের আগ্রহ যেমন কম ছিল, অন্যদিকে তেমনি অর্থেরও অভাব ছিল। তৎসময়ের ধর্ম-প্রচারক মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ তাঁর এ-গ্রন্থটি প্রকাশের ইচ্ছা জানান। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তিনি কিছুদিন পর-ই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে শেখ হবিবর রহমান বিচলিত হ'য়ে পড়েন। এই সময় শেখ হবিবর

রহমান তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে নিয়ে 'মহাপ্রলয়' নামক আরেকখানি কাব্য লিখতে উৎসাহিত হন। কবি সে সম্পর্কে লিখেন–

"এই সময় 'মহাপ্রলয়' নামক আর একখানি নতুন কাব্যপুস্তক লিখিতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলাম। ইহার উপকরণ সংগ্রহের জন্য রংপুরস্ত লাইব্রেরী হইতে পুস্তক ডাকযোগে আনয়ন করিয়া কত গভীর মনোযোগের সহিত তাহা পড়িতাম; নোট করিয়া লইতাম। ভারতে মোস্লেম রাজত্বের পতন, প্রসঙ্গত ঃ নিখিল মোস্লেম জগতের বর্ত্তমান দুর্গতিকে 'মহাপ্রলয়' কল্পনা করিয়া বিরাটভাবে এই পুস্তকখানি লিখিবার সঙ্কল্প মনে জাগিয়াছিল। কতদিন এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য উধাও হইয়া কল্পনা-গগনে ভাসিয়া বেড়াইয়াছি। কত বিনিদ্র রজনী এই পুস্তকের সর্গের পর সর্গ মাসপটে কল্পনার তুলিতে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই চেষ্টা অধিকদূর অগ্রসর নাই। ৭০৯ লাইনে প্রথম সর্গ ও দ্বিতীয় সর্গের ৫৩ লাইন রচনা করিবার পর নিরাশা-নিপীড়িত হৃদয়ে এই পুস্তকের রচনা স্থগিত করি"।[১৭]

তখন কবি দক্ষিণ ডিহির অন্তর্গত নওয়াদালী পল্লীতে থাকতেন। তার ঘরের সামনে পাড়ার লোকজন এসে আড্ডা জমিয়ে রাখত। কিন্তু শেখ হবিবর রহমান ওসব আড্ডায় মন না দিয়ে দিন-রাত পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতেন। এই সময় এ সম্পর্কে কবি তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' এ লিখেছেন–

"একটা অক্লান্ত পাঠেচ্ছা-প্রবৃত্তি তখন আমার মধ্যে অত্যন্ত বলবতী ছিল। আমি অনেক সময় পুস্তক পড়িয়া কাটাইতাম। যখন সঙ্গীগণ দল বাঁধিয়া নিকটস্থ পল্লীতে গান শুনিতে যাইত, তখনও আমি নিভৃতে বসিয়া পুস্তক পাঠে রত থাকিতাম"।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় পড়া অবস্থায় শেখ হবিবর রহমান বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একটি সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। ঐ সমিতিতে নিয়মমত লিখন ও বক্তৃতা-শিক্ষা ব্যতীত বালকগণের মধ্যে ধর্মভাব বিস্তারেরও চেষ্টা করা হত। তখন 'সোলতান' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কবি সংগঠনের সংবাদ পাঠাতেন। এর-ই জন্য শেখ হবিবর রহমানের রচিত 'পেচক পণ্ডিত' কবিতাটি ১৩২৬ সালের ১৫ই আশ্বিন 'মোসলেম সুহৃদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮ই আশ্বিন তারিখে এই কবিতাটি 'মিহির ও সুধাকরে'ও প্রকাশিত হয়। ১৩১৩ সালের ২৪ শে বৈশাখ ফুলতলা মাদ্রাসা মাঠে একটি সভায় পাঠের জন্য হবিবর রহমান ৮৮ চরণের একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি সভায় পাঠ করার পরম মাদ্রাসার সেক্রেটারি জনাব মৌলভী মুহম্মদ কাসেম কবিকে ১ টাকা পুরস্কার দান করেন।

১৯০৮ সালে কবি ফুলতলা মাদ্রাসা থেকে যশোহর জেলা স্কুলে ভর্তি হবার পরই মূলত তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু হয়। এই স্কুলে তিনি শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন পার্সিয়ান শিক্ষক মৌলভী রকিবুদ্দিন আহমদকে। তাঁর কাছে তিনি পার্সি শিখেন। ফলে পার্সি সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। এ সূত্রেই পরবর্তীকালে তিনি পার্সি সাহিত্যের অনুবাদের দিকে ঝুকে পড়েন। তখন তিনি শেখ সাদীর বিখ্যাত 'গুলিস্তা'র ও 'বুস্তা'র বাংলা অনুবাদ করেন। অনুবাদক হিসাবে তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেন এবং বাংলা অনুবাদ ধারায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

যশোহরে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে তিনি মাগুরার বন্ধুদের নিয়ে 'মোজকারায়ে মোজাহারুল মোসলেমিন' নামে সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। এ সমিতিতে নিয়মিত

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যচর্চা, বক্তৃতা, শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা হত। পরবর্তীতে এ সংগঠনটি মুন্সি মেহেরুল্লাহর নামে 'মেহেরুল এসলাম সভা' নামে নামাঙ্কিত হয়। এটাই বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের প্রথম প্রতিষ্ঠান।

যশোহর জেলা স্কুল থেকে কলকাতায় গিয়ে কবি মোহাম্মদ এসহাক ও মোহাম্মদ গোলাম জ্বীলানীর সাথে পরিচয় হয় এবং তাদের সংস্পর্শে কবি মুগ্ধ হন। তাছাড়া কবি গোলাম মোস্তফার সাথেও তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠে। কবি মোহাম্মদ এসহাক-এর উদ্যোগে মোহাম্মদ জীলানী, ফজলর রহমান, দলিলুদ্দিন মোহাম্মদ, ও শেখ হবিবর রহমানের প্রচেষ্টায় কলকাতায় 'যশোহর খুলনা সিদ্দিকীয় সাহিত্য সমিতি' গড়ে উঠে। এই সভায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে শুরু করে খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিও জড়িত ছিলেন এবং বিভিন্ন সভায় তারা এসেছেন। শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্য-প্রতিভার পথ মুক্ত হয়ে উঠেছিল এই সমিতির মাধ্যমে।

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি' স্থাপিত হওয়ার পূর্বে এই সমিতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। এই সাহিত্য-সভার কার্যবিবরণ লেখার দায়িত্ব ছিল শেখ হবিবর রহমানের উপর। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সভার আয়োজন করা হতো। তাই দিন দিন এর জনপ্রীয়তা বেড়ে উঠে। যশোহর ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে এর শাখা স্থাপন করে সাহিত্য-চর্চার বিকাশ ঘটানো হত। তার ফলে খুলনা ও যশোহর অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে দিন দিন সাহিত্য-চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগ বেড়ে উঠে। শেখ হবিবর রহমান নিরলসভাবে শ্রম দিয়ে গেছেন এই সাহিত্য-

Dhaka University Institutional Repository

সমিতির জন্য। তাঁর নিজেরও সাহিত্য-চর্চার পথ সুগম হয়ে উঠে এই সাহিত্য সমিতির মাধ্যমে। তিনি তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবনী'তে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন–

"এই সমিতি ব্যক্তিগতভাবে আমার গদ্য রচনার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আমার 'চেতনা' নামক পুস্তকের তিনটি প্রবন্ধই এবং 'নিয়ামত' নামক পুস্তকের প্রায় সমস্ত গল্পই এই সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে পঠনোদ্দেশ্যে লিখিত। এই সমিতির কল্যাণে আমরা অনেকেই ধীরে ধীরে গদ্য রচনায় অভ্যস্থ হইয়া উঠিতেছিলাম। আমাদের রচনা তৎকালীন নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হত।" ১৯

১৯১৭ সালে আলোচ্য 'সাহিত্য-সমিতি'র অফিস ছিল বনগ্রাম। এই সময় অফিস বন্ধ হয়ে যায়। এর শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন– জনাব খান বাহাদুর হাজী মৌলভী আহসানুল্লাহ এম এ। 'যশোহর খুলনা-সিদ্দিকীয়া সাহিত্য সমিতি' হঠাৎ কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায়, তার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। তখন সাহিত্য-সমিতির কলকাতা শাখা হতে 'মলয়া' এবং যশোহর শাখা হতে 'শুকতারা' নামে দুখানা অমূদ্রিত মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হত।

যশোহর জেলা স্কুলে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি আট বছর অতিবাহিত করেন। এই আট বছর ছিল শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্য জীবনের উৎকৃষ্ট সময়। এ সময় তিনি 'পরীর কাহিনী', 'নিয়ামত', 'হাসির গল্প', 'বাঁশরী', 'আলমগীর', 'ভারত সম্রাট বাবর' গ্রন্থগুলো রচনা এবং

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করেন। পূর্বে রচিত 'কোহিনূর কাব্য' এবং 'চেতনা'–এ সময়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়। তাঁর যশোহর-জীবন সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন– "ধামার যশোহর জীবনটাই যেন আগাগোড়া কবিত্বের রঙ্গে রঙ্গিন ছিল, সাহিত্যের রসে সরস ছিল।[২০]

কবি পাঠ্য-পুস্তক রচনার জন্য নগদ আর্থিক প্রস্তাব পেলেও ঐকাজে কখনো তিনি প্রভাবিত হননি। কবি মনে করতেন সাহিত্য দেশের ও সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্পদ। খোদাতায়ালা তাকে সেই সম্পদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ও প্রতিভা দিয়েছেন। তাঁর অন্য কিছুতে আত্মনিয়োগ করা ঠিক নয়। তৎসময়ে খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ, শেখ হবিবর রহমানকে সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনায় নানা রকম সহযোগিতা করেন। শেখ হবিবর রহমান কিশোর ছেলেদের পড়ার জন্য 'হাসির গল্প' রচনা করেন। উপন্যাস রচনায় তাঁকে অনেকই পরামর্শ ও উৎসাহ দিলেও. তিনি ছিলেন উপন্যাস রচনার বিরোধী। তিনি কখনো উপন্যাস লিখবেন না, এমনকি পড়বেন না বলেও মনস্থির করেছিলেন। এমনকি পাচ-ছয় বছর তিনি উপন্যাস পড়েননি। অনেক মাসিক পত্রের তিনি নিয়মিত গ্রাহক হওয়া সত্বেও মাসিক পত্রে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস পড়া থেকে তিনি বিরত থাকতেন। তবুও তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মহৎজীবন ও কর্মের ইতিহাস জনমনে ছড়িয়ে দিতে উপন্যাস-রচনার আশ্রয় নেন। তৎসময়ে 'আল এসলাম' পত্রিকায় 'আলমগীর' উপন্যাসের অনেকাংশ কয়েক মাস ধরে প্রকাশ পেয়েছিল। শেষ কিস্তি প্রকাশের কয়েকদিন পর 'মোসলেম পাবলিশিং হাউস' থেকে "আলমগীর" উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পর, শিশু ও

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরদের জন্য তিনি 'ভারত সম্রাট বাবর' জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে সময় মুহম্মদ এসহাক, ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম ও জমির উদ্দন বিদ্যাবিনোদ শেখ হবিবর রহমানকে সাহিত্য-রচনায় ব্যাপক উৎসাহ ও সহযোগিতা দেন। এ সময়ে শেখ হবিবর রহমান 'নদীয়া সাহিত্য সভা'য় তাঁর সকল প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দেন। উক্ত সাহিত্য সভাপর পক্ষ থেকে কবিকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি প্রদান করা হয়। তাছাড়া 'নিখিল ভারত সাহিত্য-সভা' থেকেও কবিকে দুটি উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। তবে সে দুটি উপাধি কি ছিল তা জানা যায়নি। সে সময়ে কবি ও সাহিত্যিক গোলাম মোস্তফার সাথে শেখ হবিবর রহমানের পরিচয় এবং সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। ১৩২২ সালে যশোহরে '৯ম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে'র অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে শেখ হবিবর রহমান 'জাতীয় সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধটি পাঠ করে বেশ সুনাম অর্জন করেন। তার পরদিন শেখ হবিবর রহমান তাঁর সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে সদলবলে স্টিমারের ফাস্ট ক্লাসে চড়ে মাইকেল মধূসূদন দত্তের বাড়ি যান। তারপর তাঁরা ভ্রমণ করেন মানকুমারী বসুর জন্মস্থান। শেখ হবিবর রহমান এ-সম্পর্কে লিখেছেন–

"যে মাইকেল ও মানকুমারী আমার কবিত্বের গুরু, তাঁহাদের জন্মভূমিতে চলিয়াছি, যেন সাহিত্যের মহাতীর্থে চলিয়াছি।"[২১]

১৯২২ সালের জুলাই মাসে কবি এল টি পড়তে চলে যান কলকাতায়। এক বছর ট্রেনিং শেষে তিনি বারাসাতে শিক্ষকের পেশায় আত্ম-নিয়োগ করেন। বারাসাত ও কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি তেমন কোন সাহিত্য-রচনা করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকতা ছেড়ে শেখ হবিবর রহমান 'মক্তব সাব-ইন্সপেক্টর' পদে খুলনায় নতুন জীবন শুরু করেন। এ সময় তার 'আলমগীর' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং 'পরীর কাহিনী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া এই সময়ে কবি অনেক কবিতা রচনা করেন; যা ইসলাম দর্শন ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। এই সময় শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্রের সাথে কবির বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। সে সময়ে কবি মোহাম্মদী, সোলতান, হানাফী, মিহির ও সুধাকর, ইসলাম, আল ইসলাম, ইসলাম প্রচারক, ইসলাম দর্শন, নূর, বঙ্গনূর, কোহিনূর, সোনার ভারত, মোসলেম ভারত, আল হেলাল, মোহাম্মদী, মোসলেম সুহৃদ, মসজেদ, আল হক, শরিয়ত, শরীয়তের ইসলাম, সপ্তবনা, সাহিত্যিক প্রভৃতি সাময়িকী ও সাহিত্য-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। কবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সমসময়ে তিনি যাদের কাছে থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন, স্বীয় জীবনীগ্রন্থে তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি, সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তি-জীবনে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন–তাও বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে–

"আমার সাহিত্য-জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সহায়তা ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি আমার পারিবারিক জীবনের বিশেষত্ব হইতে। ওয়ালেদ সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন, কবিতা লিখন সম্বন্ধে বরাবর আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তারপর আমার সংসার-জীবনে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলভী শেখ ফজলর রহমানের উপর সমূদয় সংসারের ভার চাপাইয়া দিয়া আমি একরূপ নির্ম্মুক্তভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার সুযোগ পাইয়াছি। বলিতে কি, পুস্তক ছাপিতে গিয়া বাটীর খরচও অনেক সময় নিয়মমত দিতে পারি নাই। চাকরী করিয়া অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চয় দূরে থাকুক, অনেক সময় ঋণের বোঝা মাথায় চাপিয়া রহিয়াছি। কিন্তু সেজন্য কোনরূপ অসন্তোষ আমি কখনোই লক্ষ্য করি নাই।২২

কবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ৭২ বৎসর জীবনের সবটুকু সময় সাহিত্য-সাধনা করে কাটিয়েছেন। ১৯৫৭ সালে শেখ হবিবর রহমানের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত ৩০ টি গ্রন্থ বাংলা একাডেমীকে দান করা হয়। বাংলা একাডেমীর ৯ম সভায় (১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ) তার এ-দান গ্রহণ করা হয় এবং তাঁকে এক হাজার টাকা সম্মাননা দেয়া হয়। ১৯৬০ সালে একাডেমী তাঁকে ফেলোশিপ প্রদান করে।

১৯৬২ সালের ৭ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ৮ ই মে ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে বাংলা একাডেমীতে কবির স্মরণে শোকসভা পালন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমী থেকে শেখ হবিবর রহমানের রচনাবলীর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।২৩

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১. আব্দুল মজিদ। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা-১০
২. ঐ, পৃষ্ঠা-১১
৩. ঐ, পৃষ্ঠা-১১
৪. ঐ, পৃষ্ঠা-১১
৫. শেখ হবিবর রহমান। আমার সাহিত্য জীবন(আত্মজীবনী), ১ম সংস্করণ-১৯২৭, পৃষ্ঠা-১২–১৩
৬. ঐ, পৃষ্ঠা-১৪
৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১৫
৮. ঐ, পৃষ্ঠা-১৫
৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৭
১০. ঐ, পৃষ্ঠা-২
১১. ঐ, পৃষ্ঠা-৫-৬
১২. ঐ, পৃষ্ঠা-৬
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৭
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা-১৭
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা-১৮
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা-২৫
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা-৮
১৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৫
২০. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৪
২১. ঐ, পৃষ্ঠা-১০২
২২. ঐ, পৃষ্ঠা-১০২
২৩. শেখ সামসুর রহমান। আমার আব্বা(স্মৃতিচারণ), জন্মশতবার্ষিকী স্মরণীকা, খুলনা একাডেমী, ১০ জানুয়ারি-১৯৯১। পৃষ্ঠা-৬

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের রচনার শ্রেণীবিভাগ ও পরিচয়

ক। কবিতা

খ। ছড়া

গ। উপন্যাস

ঘ। গল্প

ঙ। ভ্রমণ-কাহিনী

চ। জীবনীমূলক গ্রন্থ

ছ। প্রবন্ধ-সাহিত্য

জ।অনুবাদ-সাহিত্য

ঝ। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের রচনার শ্রেণী-বিভাগ ও পরিচয়

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন আধুনিক একজন কবি। ১৯১২ সালে লিখিত 'পারিজাত' শেখ হবিবর রহমানের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথম এই কাব্য গ্রন্থে কবিতার সংখ্যা ছিল চল্লিশটি। এই কাব্য-গ্রন্থেই মূলত তাঁর কাব্য-সাধনার মূল সূরটি ধরা পড়েছিল। একদিকে ধর্মপ্রেম ও জাগতিক অনিত্যতাবোধ ও অপরদিকে মানবপ্রেম এবং কর্মের প্রতি আস্থা। এখানে ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও কবি কায়কোবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়, সম্ভবত একই কারণে কবির উপর এ-প্রভাব অনস্বীকার্য ছিল। এছাড়া পারিজাত কাব্যে সূফীবাদের প্রধান্য লক্ষণীয়।

'বাঁশরী' কাব্যে বস্তুত রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্র বাবুর লেখার উপর তাঁর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু ক্রমে "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য" কাব্যের তিনি ভক্ত হয়ে উঠেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের ধারাটি 'বাঁশরী'তে অনুসৃত হ'য়েছে। 'বাঁশরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অনুভবের সমীকরণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাক্য বিন্যাসে রবীন্দ্র-প্রভাব নেই। 'গুলশান' কাব্যটিতে রবীন্দ্র-প্রভাব আরো বেশি লক্ষণীয়, তবে এ-কাব্যগুলোতে কবির ভাবের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-কাব্যটিকে শেখ হবিবর রহমানের মিশ্রকাব্য বলাই

Dhaka University Institutional Repository

অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মুসলিম পুনর্জাগরণ দিয়ে শুরু, প্রেম-প্রকৃতি অতিক্রম করে ব্যঙ্গ-কবিতা দিয়েই সাহিত্য-চর্চা শেষ করেছেন তিনি।

শেখ হবিবর রহমানের শ্রেষ্ট রচনা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'কোহিনূর কাব্য'। 'কোহিনূর কাব্য' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ থেকেই যায়। কেননা শেখ হবিবর রহমানের কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে কোহিনূর বৃহৎ এবং মহাকাব্যিক চেতনার ফসল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ হবিবর রহমানের সময়টা আধুনিক-সাহিত্যের ক্রান্তিকাল হলেও, তাঁর মানস গঠন হয়েছিল উনবিংশ শতকের উত্তরাধিকারে। সুতরাং অমিত্রাক্ষর ছন্দে নয় স্বর্গে বিভক্ত মহাকাব্যের আবেদন সাধারণত পাঠকের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই কাব্যটি নিয়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রচুর। এ-কাব্যে চরিত্র গুলোর বর্ণনা আছে, কিন্তু বিকাশ নেই। তবে কোহিনূর-এ রসের সন্ধান পাওয়া যায়।

শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্যকীর্তির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে তাঁর 'অনুবাদ কর্মে'। বিশ্ব-সাহিত্যে পারস্যের কাব্য সম্পদ অতুলনীয়। শেখ সাদী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম তাঁদের কাব্য-সুষমায় বিশ্বসাহিত্য শুধু নন্দিতই নয়, বন্দিত। পারস্যের কাব্যকুঞ্জের সুষমা ধারাকে বাংলা-সাহিত্যে যারা বিকশিত করেছিলেন, শেখ হবিবর রহমান তাদের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি তার শিক্ষা-জীবনের শুরুতে পারস্য ভাষা শিখেছিলেন। পারস্য সাহিত্যের অমিয় মাধুরী তাঁর হৃদয় মাধুরিকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। আর তাই তিনি পারস্যের অন্যতম শ্রেষ্ট কবি শেখ সাদীর অমর-কাব্য 'গুলিস্তা'র বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। শেখ সাদীর 'গুলিস্তা' গ্রন্থের এটাই পারস্য ভাষা হতে বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। শুধু অনুবাদের জন্য তিনি

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ ক'রেননি, সাদীর কবিতার তত্ত্ব, নীতি, সরলতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে শেখ হবিবর রহমান তাঁর বাংলা-অনুবাদে প্রবাহিত করেছিলেন। বাংলা ভাষায় সম্ভবত শেখ সাদীর কবিতার প্রথম অনুবাদক শেখ হবিবর রহমান। শেখ সাদীর কবিতার প্রভাবে বাংলা-ভাষায় কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ কবি অনুবাদ করলেও শেখ সাদীর কবিতা বাংলায় প্রত্যক্ষ অনুবাদ করেন শেখ হবিবর রহমান।[১]

শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' হচ্ছে উপদেশমূলক ছোট ছোট গল্পের সংকলন। মোট আট অধ্যায়ে দুশো চল্লিশটি গল্প এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অনুবাদ করতে গিয়ে শেখ হবিবর রহমান মূলের অনুস্তরণ করেছেন। মূল 'গুলিস্তা'র ভাষা মূলত গদ্য এবং বয়াত পদ্যে রচিত। তিনি তাঁর অনুবাদে এই রীতি অনুসারী হয়েও অনুবাদকে আরো বেশি প্রাঞ্জল করতে তিনি টিকা-টিপ্পনির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

'গুলিস্তাঁ'র নীতিপূর্ণ কবিতাগুলোকে তিনি বাংলা-কবিতায় অনুবাদ করেছেন 'সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কলাম' নামে। কবি হাফিজের অনুসরণে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক কাব্য' রচনার একটি প্রভাব এ-ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, 'সাদীর কালাম বা সদ্ভাব কুসুম' নামকরণের মধ্যে। অনুবাদটি আক্ষরিক অর্থে নয়, শেখ হবিবর রহমান অনুবাদটি করার ক্ষেত্রে দেখার চোখ এবং বলার ভাষা দুটোই যথার্থ ব্যবহার করেছেন। 'সাদীর কালামে'র শেষ অনুবাদ দিয়েই এ-কথার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যাবে।

মূল বয়াত

নাগোয়াদ আজ সরে বাজিচা হরদে
কেজৈাপন্দে না গিরদ, সাহেবে হোশ।

Dhaka University Institutional Repository

অগোর সদ্ বাবে হেকমত পেশে নাদা
বে খানি আয়দশ বাজিচা দর্ গোশ।

অনুবাদ

কেহ কভু কোন কথা খেলার ছলে কয়না
তাহা হতে জ্ঞানীজন উপদেশ লয়না।
পড়িয়া শোনাও যত দর্শনের পরিচ্ছেদ।
অবোধের কাছে তার কোন দাম হয়না।[২]

ভাবকে ছন্দে মিলিয়ে দিলেই যে অনুবাদ হয় না, তার জন্য সৌন্দর্য রসময়তা আবশ্যক শেখ হবিবর রহমান তাঁর অনুবাদে, সে বিষয়টিকে মেনে নিয়েছিলেন কুণ্ঠাহীনভাবে। প্রখ্যাত কবি হাফিজ, সামসুত তবরেজ, মইন উদ্দিন চিশতি, শেখ সাদী ও আমির খসরুর বিখ্যাত গজলের সাথে কবি নিজে একাত্ম হয়ে কয়েকটি গজল লিখে সংকলনটি তৈরি করেন। তাঁর 'আবে হায়াতে'র প্রতিটি কবিতা জীবন বারির এক একটি পেয়ালা। বাংলা গজলের একটি নতুন আস্বাদে পরিপূর্ণ। সেখানে শেখ হবিবর রহমানের গীতি তন্ময়তা প্রকাশিত হয়েছে সুচারুভাবে।

শেখ হবিবর রহমানের বৈচিত্রময় সাহিত্যকর্মকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। বিশেষত ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, গজল, অনুবাদ, আত্মজীবনী, কিশোর জীবনী প্রভৃতি। নিম্নে রচনার শ্রেণী-বিভাগসহ আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা

পারিজাত

'পারিজাত' শেখ হবিবর রহমানের প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম। ছাত্রাবস্থায় ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পারিজাতের কবিতাগুলো লিখিত। প্রথম সংস্করণে ৪০টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'শেখ হবিবর রহমান গ্রন্থাবলী'তে দেখা যায় ৩৭টি কবিতা পারিজাতের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত শেষের দিককার কোনো সংস্করণে ২/১টি কবিতা বাদ দেয়া হয়েছিল।

শেখ হবিবর রহমানের 'কাব্যসাধনার মূল সুরগুলো' তাঁর এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেই ধরা পড়েছিল বলে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি কবির ভাব-ধারায় দুটি স্তর লক্ষ করেন। একদিকে স্রষ্টার প্রতি প্রেম ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, অন্যদিকে মানবীয় প্রেমানুভূতি ও কর্মের আহবান জ্ঞাপন।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই মানবীয় প্রেমানুভূতির উৎস। স্রষ্টার প্রতি প্রেম ও আনুগত্যকে কবি প্রিয়তম রূপে দেখেছেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন নয়, স্রষ্টার পদে ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে দেয়াই কবির লক্ষ্য, মানব সংসার ত্যাগ করার প্রবণতাই এ-কাব্য-গ্রন্থের প্রায় কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে–

Dhaka University Institutional Repository

"ঘুরিব একাকী গহণ কাননে।

আসিব না কভু মানবপুরে"।

জীবনভাবনার দিক দিয়ে 'পারিজাতে'র বেশ কয়েকটি কবিতায় কবি কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' কাব্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'ধশ্রুমালা'র প্রথম কবিতা 'প্রার্থনা' (বিভো! দেহ হৃদে বল!) আর 'পারিজাতে'র প্রথম কবিতা 'শিখাও আমারে' (বিভো! শিখাও আমারে)–কবিতা দ'টির মধ্যে 'ভাব-ভঙ্গীর মিল' বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একইভাবে 'আমি কে?' কবিতায় কায়কোবাদ প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে দুরূহ রহস্যভেদের চেষ্টা করেছেন–

কে তুমি? কে আমি বিভো? দাও সত্যজ্ঞান

আমি কি তোমারে ছাড়া?

তুমি কি ব্রহ্মান্ড ভরা?

*কোথা তবে তুমি আমি?–কত ব্যবধান?*৩

শেখ হবিবর রহমান সেই জিজ্ঞাসার মীমাংসায় পৌঁছান তাঁর 'আমিত কিছুই নই' কবিতায়–

আমি ত কিছুই নই।

এ ক্ষুদ্র 'আমি'রে দাও বিসর্জন,

বিশ্বময় 'আমি' করিব দর্শন,

পারিবে লভিতে অনন্ত জীবন;

অনন্ত আমিই হই–

*অথচ কিছুই নই।*৪

শেখ হবিবর রহমানের 'পাগল' কবিতার মধ্যে কবি কায়কোবাদের 'ভুল ভেঙ্গে দাও' কবিতার ছায়া-প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায়। 'পারিজাতে'র আহক্ষানমূলক কবিতাগুলোতে

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও কায়কোবাদের ভাব ও ভাষার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি চোখে পড়ে। এসব মিল মূলত এক-ই সাহিত্যিক-ঐতিহ্য অনুস্তরণের-ই ফল। জীবনের আনিত্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতার যে ভাব, 'পারিজাত' সহ শেখ হবিবর রহমানের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলোতে লক্ষ করা যায়, তা অনেকখানি সুফী প্রভাবেরই ফসল।

'পারিজাত' প্রকাশের পর সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার ও নতুন কবিকে সাদরে গ্রহণের সৌজন্য প্রকাশ পায়। মোহাম্মদী পত্রিকায় 'পারিজাত'কে যথার্থই কবিতা কাননের 'পারিজাত' বলে অভিহিত করা হয়।৫ 'ইহার ভাব স্বর্গীয়, সুর স্বর্গীয়, লক্ষ্য স্বর্গীয়; সুললিত ছন্দে উচ্ছ্বসিতভাবে 'পারিজাত' মোস্লেম কাব্য-জগতে যুগান্তর আনয়নকারী বলেও মন্তব্য করেন 'মোহাম্মদী'। 'মাসিক হাকিম' পত্রিকা মন্তব্য করেন–

> *"পারিজাতের লেখার ছটায় ও রচনার পারিপাট্যে মন-প্রাণ আনন্দে নৃত্য ক'রতে থাকে। পবিত্রতা ও আধ্যাত্মভাব হৃদয়তন্ত্রী প্রেম সুরে বাজিয়া উঠে। ইহা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জলন্ত আদর্শ। পারিজাত পাঠ করিতে করিতে মনে হয় এতকাল পরে সেই সুপ্রসিদ্ধ অদ্বিতীয় কবি হাফেজ আবার বুঝি শোকতাপ ভুলাইতে পাপ পরাজিত করিতে, প্রেমবীজ বপন করিতে, ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।*৬

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক `The Bengali' পত্রিকা মন্তব্য করেন ঃ `The diction of parijat is elegants, there are soaring flights of poetic thoughts here and there'৭

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক 'পারিজাত' পাঠ করে ১৯১৩ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি একে string of small poemes. verses are melodious and the rhythum admirable' বলে মন্তব্য ক'রেন। ১৯১২ সালের ৭ অক্টোবর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

করেন– *'গ্রন্থকার কামগন্ধী পার্থিব প্রেমবিলাসিত সাহিত্য ক্ষেত্রে এক দিব্য পবিত্র প্রেমের পারিজাত আনিয়েছেন।*৮

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন দৈনিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা মন্তব্য করে– *(পারিজাতের) 'অধিকাংশ কবিতাই উদার ধর্মমতের উপর স্থাপিত এবং প্রকৃত মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত। কতকগুলি কবিতায় প্রকৃতই কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে'।* ৯

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৬ ফাল্গুন, 'দৈনিক হাবলুল মতিন' কবির বয়সাতীত গাঢ়-চিন্তাশীলতা এবং সূক্ষ্মাদর্শন' কবিতাগুলোতে বিদ্যমান লক্ষ করে মন্তব্য করেন যে–

*"(যেন) আমরা এই বিংশ শতাব্দীতে পারস্যের অমর কবি মহাত্মা হাফেজের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত একখানি নতুন কাব্য পাঠ করিতেছি।' একই রূপ উচ্ছসিত প্রশংসা প্রকাশ পায় 'দৈনিক চন্দ্রিকা' (২২ আশ্বিন ১৩১৯), 'প্রভাকর' (মহররম ১৩৩১), 'মোসলেম হিতৈষী' (৬ ভাদ্র ১৩২০).'সুপ্রভাত'(পৌষ ১৩১৯) প্রভৃতি পত্রিকায়।"*১০

পারিজাত কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যে রহস্য এবং স্রষ্টার প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া জাগতিক প্রেমে মানুষের সেবাই ফুটে উঠেছে প্রায় কবিতায়। মানব সেবার মাধ্যমেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব মনে করেন কবি।

কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯১৯ সালে; তৃতীয় প্রকাশ ১৯২৪ সালে এবং চতুর্থ প্রকাশ ১৯৩৩ সালে। কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন মৌলভী আলতাফ হোসেন। যশোহর থেকে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশরী

'বাঁশরী' শেখ হবিবর রহমানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯১৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর, কলকাতা মখদুম লাইব্রেরী থেকে। বইটির প্রকাশক হলেন মুহম্মদ মোবারক আলী। বইটির 'ভূমিকা'য় কবি শেখ হবিবর রহমান উল্লেখ করেছেন–

> *"ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসে কবিতা লিখিত হয়। 'কবিতার মানুষ' এবং 'মাটির মানুষ' পার্থক্য বিস্তর। আমার যাবতীয় কবিতা পাঠের সময় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক এ-কথাটি মনে রাখিলে ভাল হয়"* ।১১

'বাঁশরী' কবিতাগুলোর অধিকাংশই শেখ হবিবর রহমান যশোহরে অবস্থানকালে রচনা করেছেন। 'আমার সাহিত্য-জীবন' গ্রন্থে 'বাঁশরী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে কবি উল্লেখ করেছেন–

> *"বাঁশরীর অধিকাংশ কবিতা যশোহরে অবস্থিতি কালেই লিখিত। বিকালে খড়কির মাঠে, নিদাস রজনীতে হোস্টেলের পিছনের পুকুর পাড়ের ময়দানে বসিয়া অনেক সময় এই সমস্ত কবিতা লিখিতাম। রবীন্দ্রবাবুর লেখার উপর পূবের্ক্ষ আমার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার কবিতা এতদিন মোটেই পছন্দ করি নাই কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার লিখিত গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য, গীতালী ইত্যাদি গ্রন্থগুলির একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিলাম। বলিতে কি, এই পুস্তকগুলির ভাবই আমাকে 'বাশরী' লিখিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ... 'আল এসলাম' নামক মাসিক পত্রিকায় বাঁশরীর অনেকগুলি কবিতা বাহির হইয়াছিল।*১২

মোট ১২০টি কবিতার সংঙ্কলন বাঁশরী। এ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো 'সন্ধ্যা'। সন্ধ্যাবেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাখীর কলতান ও মৃদু সমীরণ প্রবাহের সমন্বয়ে যে এক অপরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হয় মর্মস্পর্শী ভাষায় তা ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায়–

Dhaka University Institutional Repository

সমীরণ ঝিরি ঝিরি

সান্ধ্য গগন আকুল করি

কি গেয়ে যায় ডালে ডালে

প্রাণে আমার উঠেছে গাঁথা

তারি সাথে তালে তালে॥

মাঠের মাঝে একা আজি---

চেয়ে চেয়ে গগন পানে,

অনন্তেরই কত কথা

আস্‌ছে যেন কানে কানে।

পশ্চিমের ঐ গগন খানি

কে যেন রে সিঁদুর আনি

সাজায়েছে লালে লালে,

কুহু কুহু ডাকে কোকিল

শিমুল ডালে। ১৩

গীতি কবিতার বৈশিষ্ট্যে কবিতাটি সমৃদ্ধ। কোকিলের কুহুরব, অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা বিশ্বপ্রকৃতিতে যে অনির্বচনীয় দৃশ্যপটের সৃষ্টি ক'রেছে, রূপমুগ্ধ কবিমনে তা শিল্প-সৌন্দর্যের অপরূপ-মহিমায় ধরা দিয়েছে। আত্মভাব পরায়ণ কবির মন তাই পূলকে-আনন্দে নেচে উঠছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান 'বাশরী' কাব্যে রবীন্দ্রনথের যে প্রভাব রয়েছে সে সম্পর্কে লিখেছেন –

> *"স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কে বৈচিত্র্যের আনন্দ এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের নির্ভরতা এতে আছে। বাক্যবিন্যাস পুরোপুরি রাবীন্দ্রিক নয়; তবে রবীন্দ্রনাথের অনুসরনে শব্দব্যবহারের চেষ্টা আছে এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত রূপকেরই আধিপত্য। ভাসমান তরী, অপার জলধি, বীণার ধক্ষনি, বাঁশরীর সুর, হৃদয় সিংহাসন, সভায় পথিকের নিমন্ত্রণ– এ সবই*

Dhaka University Institutional Repository

*আছে। প্রকৃতি বর্ণনায়ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছায়া ফেলেছে। তবে [অন্যান্য কাব্যের তুলনায়] এসব কবিতার অধিকাংশ একটা গভীর আন্তরিকতার সুর ধরা পড়েছে।"*১৪

বাঁশরী কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র ফুটে উঠেছে। কবি প্রকৃতির ভিতর দিয়ে স্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছেন। স্রষ্টাকে চিনতে হলে তাঁর সৃষ্টিকে ভালভাবে উপলব্দি করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যা কি নিয়মে হয়, কার ইশারায় হয় কবি তাই ভেবেছেন আর অদ্ভুত আকর্ষণে বিমোহিত হয়েছেন।

কোহিনূর

'কোহিনূর' শেখ হবিবর রহমানের অমিত্রাক্ষরে রচিত এক মহাকাব্য। গ্রন্থটির প্রকাশক হলেন মুহাম্মদ মোবারক আলী। ১৯১৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৫, এ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতার মখদুম লাইব্রেরী থেকে বইটি প্রকাশিত হয়।

১৯৬০ সালে ফুলতলা জুনিয়র মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে শেখ হবিবর রহমান অমিত্রাক্ষর 'ছন্দে কোহিনূর' কাব্য রচনা করেন। মাদ্রাসার সেক্রেটারি কর্তৃক সুললিত কবিতায় একখানা বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ লিখার জন্যে তিনি উপদেশ প্রাপ্ত হন। সাহিত্য জীবনীতে কবি বইটি রচনা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন–

"মৌলুদ শরীফ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রধানত পর্যায় সম পয়ার ছন্দ অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে তেমন স্ফূর্তি পাইলাম না। অবিলম্বে পয়ারের জিঞ্জির হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখনী পরিচালনা করিতে লাগিলাম। মৌলুদ শরীফে

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত সৃষ্টি প্রকরণ, আদম আলায়হেচ্ছালামের জন্ম ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণনা করিতে হইলে সৃষ্টির পূর্বের অবস্থাটা প্রথমে বর্ণনা করা দরকার। এইরূপে আমাকে এমন এক দেশের বর্ণনা লইয়া পুস্তক আরম্ভ করিতে হইয়াছে, যেখানে-

অণু পরমানু কিংবা শীত গ্রীষ্ম আদি,
না আছে কিছুরই চিহ্ন সে অচিহ্ন স্থানে
না পারে পশিতে কাল সে করাল স্থলে!

মৌলুদ শরীফ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুদুর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, আর যাহাই হউক, ইহা কিন্তু মৌলুদ শরীফ হইতেছে না। তখন লেখনী তুরঙ্গম গতিতে ছুটিয়াছে। তাহাকে আর থামাইতে পারিলাম না। থামাইতে আর চাহিলামও না। নূতন ধরনের একখানা পুস্তক হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার নাম রাখিলাম 'কোহিনূর কাব্য'।"[১৫]

মোট নয়টি স্বর্গে ২৬৮৯ লাইনের এই 'মহাকাব্য'। মোট ৩৭৬৪৬ টি অক্ষরে সৃষ্টির পূর্ব হতে হজরত আদমের পৃথিবীতে আগমন পর্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী পৌরাণিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত বাংলা ভাষায় এই বহুল আলোচিত মহাকাব্যের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এর স্থানে স্থানে আরবি-ফারসি ও উর্দু শব্দ অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। সে বিচারে বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে শেখ হবিবর রহমান কবি কাজী নজরুল ইসলামের পথিকৃৎ পূর্বসূরী। 'কোহিনূর' কাব্যের সমগোত্রীয় কাব্যগ্রন্থ কবি কায়াকোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) 'মহাশ্মাশান প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে এবং সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর (১৮৭৯-১৯৩১) 'অনল প্রবাহ' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। জুনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র শেখ হবিবর রহমান ১৯০৬ সালে 'কোহিনূর' কাব্য রচনার পাশাপাশি 'মহাশ্মশান' ও 'অনল প্রবাহ' পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা বলা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

তবে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য এবং হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য' পাঠ করেছিলেন বলে তাঁর 'আমার সাহিত্য-জীবনী'তে উল্লেখ করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি মনে মনে ভাবতেন 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিছুই নহে' কবিতা লিখার অক্ষমতা হেতু এই কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন বুঝেন নাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাহ্য মিলের নিগড় না থাকিলেও ইহার মধ্যে গোপন মিলনের মধুর লীলাখেলা যথেচ্ছাভাবে চলিতে থাকে। 'কোহিনূর কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করে শেখ হবিবর রহমান তৎকালীন সুধী সমালোচকগণের সপ্রশংস দৃষ্টি-আকর্ষণে সক্ষম হন, তবে একটু বিলম্বে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বিবেচনায় কায়কোবাদের তুলনায় (শেখ হবিবর রহমানের) ভাষার বন্ধন দৃঢ়তর। সুপরিচিত আখ্যানের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে এবং ধর্মানুগত্য অক্ষুণ্ণ রেখেও (কোহিনূর কাব্যে) আবেগ ও অনুভূতির চমৎকারিত্ব তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তবে এ-কাব্য যখন প্রকাশ পেয়েছে (রচনার ১৩ বছর পর ১৯১৯ সালে) তখন আর মহাকাব্যে বাঙালি পাঠকের কোনো রুচি ছিলো না। 'কোহিনূর কাব্য' প্রকাশের দীর্ঘদিন পর মাসিক 'সওগাত'-এ আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর সমালোচনায় উল্লেখ করেন–

> *"শেখ হবিবর রহমান সাহেবের প্রাথমিক রচনা 'কোহিনূর কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রোথিত। ... ইহা পড়িয়া কতগুলি ভাল ভাল তত্ত্বকথা শিখা যায় বটে, কিন্তু কাব্যরস পিপাসা তাহাতে মিটে না।"*[১৬]

শেখ হবিবর রহমান অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সংখ্যায় এ-সমালোচনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ১৩৩৪ সনের ১১ই বৈশাখ, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাহিত্য-সভায় কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক মৌলভী আব্দুল

মজিদ 'কোহিনূর' কাব্যের উপর একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরবর্তীকালে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি 'ইসলাম দর্শন' মাসিক পত্রে কার্তিক-১৩৩৪ থেকে মাঘ-১৩৩৪ সংখ্যাগুলোতে পর পর চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপসংহারে অধ্যাপক আবদুল মজিদ মন্তব্য করেন–

> *"(কোহিনূর কাব্য) মিল্টনের প্যারাডাইজ লস্ট, দান্তের ডিভাইন কমেডিয়া, মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' এবং হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহারের মতো এপিক বা মহাকাব্য। ... হেম, মধুসূদন এবং হবিবর রহমানে একটু তফাৎ এই যে, হবিবর রহমান সংস্কৃতের জায়গায় অনেক আরবী লফ্‌জ মোস্তমাল করিয়াছেন। হবিবর রহমানের ভাষা সংস্কৃত ও আরবী মিশ্রিত বাঙালী মুসলমানী সাধুভাষা।"* [১৭]

'কোহিনূর' কাব্যে লক্ষ করা যায় যে, এতে চরিত্রগুলির বর্ণনা আছে কিন্তু বিকাশ নাই, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত জনিত মনের নানাদিকের গতি-অন্বেষণের চেষ্টাও এ-কাব্যে নেই। পৌরাণিক কাহিনীকে জটিল ও গভীর করে পরিবেশন করার চেষ্টা কবি করেননি; তবে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তাতে স্থানে স্থানে নানা রসের সন্ধান পাওয়া যায়।

'কোহিনূর কাব্য' সম্পর্কে সে সময়ের বেশ কয়েকজন পণ্ডিত নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। বইয়ের প্রকাশক মোহাম্মদ মোবারক আলী দ্বিতীয় সংস্করণে মন্তব্যগুলো ছেপে দিয়েছেন। নিচে কয়েকটি অভিমত সংযুক্ত করা হলো:

মৌলবী আব্দুল লতিফ বি এ, 'কোহিনূর' কাব্য সম্পর্কে ২৭-০২-১৯১০ সালে লিখেছেন –

> *"নতুন কবি শেখ হবিবর ররহমান প্রণীত কোহিনূর কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থখানির ভাষা ও ভাব অত্যন্ত চিত্ত বিনোদক ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কবি সৃষ্টির প্রারম্ভকালীন ঘটনাগুলি ধর্মের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া কল্পনার সূক্ষ্ম তুলিকায়*

Dhaka University Institutional Repository

নিপুণতার সহিত অতি আশ্চর্যভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকখানি ধর্মপিপাসু ব্যাক্তিগণের পক্ষে অতিব উপাদেয় হইয়াছে। কবির কল্পনা শক্তিতে মৌলিকতা ও নীতির দৃঢ় সংমিশ্রন থাকাতে স্থানে স্থানে পারম্ভিক ভাবগুলির উদ্বোধন অতি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়াছে।

*'কোহিনু'র কাব্যে একটু নতুনত্ব দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ইহার স্থানে স্থানে অনেক জাতীয় শব্দ আরবী ও ফারসি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা তদানিন্তন কবিদের কাব্য গ্রন্থে প্রায়ই দেখা যায় না। বাঙলা ভাষার মধ্যে এরূপ আরবী পারসী শব্দের বহুল প্রচার অতীব আবশ্যক। বঙ্গ সাহিত্যে কবি তাঁহার এই নতুন প্রতিভা সংযোজিত করিয়া অবশ্যই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। মুসলমান ধর্মের বাঙ্গালায় লিখিত এরূপ সুন্দর কাব্য আমি ইতিপূর্বে আর কখনো পড়ি নাই। সমাজের সাহিত্যসেবীগণ কোহিনূর কাব্যকে প্রকৃত কোহিনূর জ্ঞানে গ্রহন করিলে সুখি হইবে।"*১৮

যশোহর জিলা স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ, কাব্যরত্ন, স্মৃতিতীর্থ, স্মৃতিরত্ন 'কোহিনূর কাব্য' সম্পর্কে লিখেছেন–

"অহমদ্য নবোম্মেষিত কুসুম কলিকামির জগতীতলে দ্বিতীয় কোহিনূর মিব, ভগবদ্‌তিপূর্ণং রসভাবসমঞ্চিং তৎকল্পনা প্রসুতং কোহিনূর কাব্যমধীত্য পরাং প্রীতিমনুভবামি

ত্বমিদানীমস্মাকমন্তেবাসী, বারন্ত তৎকর। বুধ কুত্রচিৎ জ্ঞানবৃদ্ধানামপি কল্পনা বিষয়মতিক্রান্তা অতোহম বিস্তিতোস্তি

*প্রার্থয়েহম করুণাময়ং ভগবত্তংতবনবেয়সাশালতা নবোদ্যম রসৈরাপ্লুতা নবফলৈর্ভূষিতা বদ্ধতাং নিতরামিতি"*১৯

'কোহিনূর' কাব্য সম্পর্কে বিদ্যাভূষণ বি এ, লিখেছেন –

*" কোহিনূর কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যের একটি স্থায়ী জিনিস হইবে।"*২০

ফরিদপুরের কোরকদী দর্শণ বিদ্যালয়ের শ্রী তারানাথ কাব্যতীর্থ তর্ক বাচস্পতি লিখেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

"অল্পবয়স্ক এসলাম ধর্মাবলম্বী নবীন কবির লেখনি মুখনিঃসৃত এই কোহিনূর কাব্যের অনেকাংশ পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আমি যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। প্রায় প্রতিশ্লোকে নতুন নতুন ভাবকল্পনা অলঙ্কারাদিতে অনুপ্রাণীত মাধুর্য্যগুণব্যঞ্জক মুসলমান কবি রচিত এমন কাব্য আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই। কোহিনূরের বিশেষ বিশেষ দোষগুলি পরিত্যক্ত হইলে সার্থক নাম 'কোহিনূর' কাব্য জগতে কোহিনূর বলিয়া গণ্য হইতে পারে, আমি এরূপ বিশ্বাস করি।" ২১

খান বাহাদুর আহসানসুল্লাহ 'কোহিনূর' কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন–

"শেখ হবিবর রহমান মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে এক নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পারস্যেদ্যান হইতে বহু যত্নসহকারে বিবিধ দুর্লভ কুসুম চয়ন করিয়া ভক্তপ্রাণ মুসলমানদিগকে যে মনোরম উপহার প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের নিকট অতীব ধন্যবাদাই। তাঁহার কবিতা পাঠে ভক্ত জীব বিশ্ব রহস্য ভেদ করিয়া, অলক্ষে স্বীয় মহবুবের সহিত প্রেমালাপ করেও ক্ষণেকের জন্য স্বীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। এরূপ কবিতা আজকাল বিরল। ইহার ক্ষমতা অলৌকিক। ইহা পাঠে মরু হৃদয় সিক্ত হয়। দগ্ধ প্রাণও শান্তি লাভ করে। প্রেমিক অনিত্য বিশ্বে অনন্ত প্রেমের উদ্‌ভাসন দেখিয়া প্রেমময়ের সান্নিধ্য লাভ করে।" ২২

'কোহিনূর' কাব্যগ্রন্থকে মহাকাব্য বলা যেতে পারে। কাব্যে মানব সৃষ্টির রহস্য লেখক ক্রমান্বয়ে সাজিয়েছেন। কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন কবি আপন মাধুর্যে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যগ্রন্থটি পাঠক সমাজেও ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল।

গুলশান

৬১টি কবিতার সংকলন 'গুলশান'। শেখ হবিবর রহমান এই কবিতাগুলো ১৯২৫-২৬ সালে কবি খুলনায় অবস্থানেকালে রচনা করেন। কাব্যগ্রন্থের 'ভুমিকায়' শেখ হবিবর রহমান উল্লেখ করেন–

Dhaka University Institutional Repository

> *"গোলাপ, যুই, চামেলী ইত্যাদি বিখ্যাত বিখ্যাত কুসুমের পাশে পাশে নানা অখ্যাত, অজ্ঞাত কুসুম ফুটিয়া থাকে, তাহাতে উদ্যানের সৌন্দর্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। তাই আমার সামান্য আরণ্য পুষ্পগুলির বিদ্যমানতায় আশা করি বাঙ্গালার সাহিত্যেদ্যানের সৌন্দর্য ও গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হইবে না।"*[২৩]

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বিবেচনায়–

> *"গুলশান কাব্যগ্রন্থের 'কাকলী' শীর্ষক গানগুলিতে রবীন্দ্র প্রভাব আরো স্পষ্ট। রবীন্দ্রথের গানের চরণ দিয়েই এসব কবিতার সূচনা। বস্তুত এগুলি 'বাঁশরীর' অন্তুর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কেননা ভাবের ঐক্য সমগ্র গুলশান কাব্যে অনুপস্থিত বরঞ্চ বলা যেতে পারে ভাবের দিক দিয়ে গুলশান খুব মিশ্র রচনা। 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে যে কবিতাটি দিয়ে এ কাব্যের শুরু, তা কায়কোবাদ সিরাজীর মুসলিম পুনর্জাগরণের কবিতার স্বগোত্র। এই কবিতার পাদটীকায় শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও বুদ্ধকে নবী বলে স্বীকার করতে আপত্তি করেননি, কুরআন শরীফের মর্মকে এই ব্যাখ্যার অনুকূল মনে করেছেন। প্রকৃতি বর্ণনামূলক কতকগুলো কবিতায় তিনি প্রাক রবীন্দ্র বাংলা কাব্যের ধারাকে অনুসরণ করেছেন। প্রেম বিষয়ক কয়েকটি কবিতা সম্পর্কেও সে মন্তব্য করা চলে। দু'টি ব্যঙ্গ কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণ করেছেন।"*[২৪]

বরাবরের মতো এ-কাব্যগ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায় নীতিকথা ও গ্রাম জীবনের সহৃদয় চিত্রও পরিলক্ষিত হয়। অনুভূতির প্রগাঢ়তায় চিত্র-রচনার দক্ষতায় এবং প্রকাশভঙ্গির নৈপুণ্যে এই গ্রন্থের 'কাকলী' নামক ১০ নং গানটি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের ভাষায় শেখ হবিবর রহমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা–

যাদুকরের খেলা এ যে
যাদুকরের খেলা রে।
এই খেলা মোর দেখতে দেখতে
ফুরিয়ে এল বেলা রে।
কোথা থেকে এক নিমেষে

Dhaka University Institutional Repository

সমুখে কে দাড়ায় এসে;
জানিনে কি মায়া-জালে
পূর্ণ ভব-মেলা রে।
যাদুকরের খেলা এ যে
যাদুকরের খেলা রে।
এত আশা, ভালবাসা
এত মায়া জীবনে
নিমেষে সব মিশিয়ে যায়
কি জানি কোন স্বপনে।
এখন একা বসে বসে;
ভাবি শুধু আপন দোষে
অমূল্যে এ জীবন আমার
করিয়াছ হেলা রে
ঐাদুকরের খেলা এ যে
যাদুকরের খেলা রে।২৫

এ-কাব্যগ্রন্থের 'প্রার্থনা' নামক কবিতাটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এ. সিলেকশনে গৃহীত হয়েছিলো। 'গুলশান' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মোবারক আলী। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে কলকাতার মখদুমী লাইব্রেরী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পারেস্যের মশহুর কবি শেখ মুছলেহ উদ্দীন শিরাজী-(১১৭৫-১২৯৬) পারস্য সম্রাট আবু বকর বিন সায়াদ-এর নামানুসারে উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে যিনি 'শেখ সাদী' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তার অমর কাব্য 'গুলিস্তাঁ'র বাংলা অনুবাদে পথিকৃৎ কৃতিত্ব শেখ হবিবর রহমানের। সর্বমোট ৩৮৬ পৃষ্ঠার 'গুলিস্তাঁ'র বঙ্গানুবাদ অনুবাদ সাহিত্যে একটি অনবদ্য সংযোজন এবং শেখ হবিবর রহমানের অমর অবদান।

Dhaka University Institutional Repository

'সদ্ভাব কুসুম বা সা'দীর কালাম' গ্রন্থটি শেখ হবিবর রহমানের আরো একটি অনবদ্য অনুবাদকর্ম। অনূদিত কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন শেখ ফজলর রহমান। বইটির প্রথম সংস্করণ ২০ জানুয়ারি ১৯২৬, ২য় সংস্করণ ১৯২৭, ৩য় সংস্করণ ১৯৩০, ৩য় সংস্করণ বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় কিন্তু সংস্করণ কপি পাওয়া যায় না। হয়ত সংখ্যাটি পরে আর প্রকাশ হয়নি। শেখ সাদীর সুপ্রসিদ্ধ 'গুলিস্তা' গ্রন্থ থেকে নীতিপূর্ণ কবিতাগুলোর অনুবাদ 'সাদীর কালাম'-এ পরিবেশিত হয়েছে।

নির্বাচিত শতাধিক বয়াত বাংলা অক্ষরে লিখিত এবং সাথে সাথে বাংলা কবিতায় অনুবাদ করা হয়েছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নুরজাহানের প্রেম কাহিনী অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠায় 'শের সংহার' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন কবি শেখ হবিবর রহমান। ১৯০৫ সালে অর্থাৎ কবির ১৪ বৎসর বয়সে লিখিত হয়েছিলো এ গ্রন্থটি। বইটি কখনো প্রকাশিত হয়নি। [২৬]

Dhaka University Institutional Repository

ছড়া

'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' শেখ হবিবর রহমানের বিখ্যাত ছড়ার সংকলন। বইটির প্রকাশক ছিলেন সৈয়দ ইমামুল হোসেন, মর্ডান লাইব্রেরী, খুলনা। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। বইটি পারিজাত সাহিত্য-কুটীর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির ২য় সংস্করণ ১৯৪৮ সালে কলিকাতা থেকে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৬ সালে খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়।

সুনিপুণ ছন্দ মাধুর্যে প্রণীত নীতি-উপদেশমূলক ছড়া কবিতায় শেখ হবিবর রহমানের অন্যতম মূল্যবান সংযোজন 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ'। ৫ মে ১৯৪৫ সালের গেজেটে এ বইকে যুক্তবাংলার সরকার কর্তৃক সমস্ত বাংলার স্কুলসমুহের পাঠ্য ও লাইব্রেরীসমূহের জন্য মনোনীত হয়। এ গ্রন্থের ছড়া কবিতাগুলোতে কবি শেখ হবিবর রহমানের সৃজনশীল ও কাব্যিক মনোভঙ্গির বিশেষ পরিচয় বহন করে। ব্যঙ্গ ও রঙ্গ রসমিশ্রিত যে কবিতাগুলো এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে সমাজ-সমালোচনার এবং হালকা নির্মল আনন্দ-বিতরণের দরদী মনের পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। 'কুড়ের বাদশা' এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য ছড়া। ছড়ার শেষ কটি লাইন হচ্ছে –

দেশ বিদেশে ছড়িয়ে গেছে তাদের মহা কীর্ত্তি
তাদের যশে পূর্ণ দেখ আজকে সারা পৃত্থি!

Dhaka University Institutional Repository

হেন ভাগ্য চাও যদি ত করো বারেক চেষ্টা

*আমার কাছে জানতে পাবে কোথা রাজার দেশটা।*২৭

'ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ'র 'ভূমিকা'য় প্রখ্যাত ছড়াকার ও ছন্দের যাদুকর শ্রী সুনির্মল বসু লিখেছিলেন–

"শ্রদ্ধেয় মৌলবী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রণীত 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' পাঠ ক'রে বারে বারে এই কথাই মনে হচ্ছে, শিশুদের আজ মহাসৌভাগ্য যে, একজন প্রতিভাশালী ও দরদী লেখক তাদের মনোরঞ্জনের জন্য আসরে নেমেছেন। এই গল্পের বইখানা আগাগোড়া কবিতায় লেখা। যে সব ছন্দের কবিতা পড়ে শিশুরা বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়, রহমান সাহেব আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে সেইসব ছন্দের খেলা দেখিয়েছেন এই শ্রাদ্ধের বাসরে। নীতিপূর্ণ সরস কবিতার কালোয়াতির সঙ্গে বিচিত্র ছন্দের সঙ্গত অতি উপাদেয় আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রেছে শিশুদের রং বাহারী শিশুমহলে। রহমান সাহেবের ছন্দের হাত অতি দুরন্ত, মিলগুলিও শুধু উচ্চ শ্রেণীর নয়, প্রথম শ্রেণীর; বিশেষত, শেষের কবিতাটি মিলে ও ছন্দে নিখুত।

*এই 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের' সভায় শুধু শিশুদের নিমন্ত্রণ নয়, আমন্ত্রণ তাদের অভিভাবকদেরও।"*২৮

তদানীন্তন সময়ের আরেক বিখ্যাত কবি কালিদাস রায় যে মন্তব্য করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

"এই কবিতাগুলির রস দিক হইতে বিচার করিয়া উপভোগ করিতে হইবে। প্রথম গল্পের দিক; গল্পগুলি সুনিবর্ক্কাচিত ও সুপরিকল্পিত। সেগুলির মধ্যেই কৌতুকের স্ফুলিঙ্গ নিহিত আছে। মৌলবী সাহেব গল্পগুলিকে কৌতুকের ফুলঝুরিতে পরিণত করিয়াছেন। আর একটা কবিতার দিক। ছন্দোবদ্ধ ভাষার পারিপাট্য ও কলাকৌশলের সাহয্যে কবি কৌতুকরসকে অপূবর্ক্ক রূপদান করিয়াছেন। আর একটা নৈতিক দিক। কবি কৌতুকরসের রচনায় শুধু আনন্দই দেন নাই, এই আনন্দের সুরভি পুষ্পগুলির মধ্যে একটি করিয়া নীতিসূত্র প্রচ্ছন্ন আছে। এই নীতিসূত্রটি কবির মানসোদ্যানের পুষ্পগুলির সহিত বালক বালিকাদের কণ্ঠের সহজ যোগাযোগ সাধন করিয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাগুলির পদবিন্যাস সম্পূর্ণ কলাসম্মত, ছন্দ কৌতুকরস পরিবেশনের সম্পূর্ণ উপযোগী। যে ছন্দে কবি কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন, বাঙ্গালার লোকসাহিত্যের তাহাই নিজস্ব ছন্দ। এই ছন্দ রচনায় কবি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ছোট ছেলেদের আবৃত্তির পক্ষে ইহা এমনই উপযোগী হইয়াছে যে, তাহারা এইগুলি সহজেই মালিকার মত কণ্ঠস্থ করিবে বলিয়া আমার মনে হয়। মিলের চাতুর্য্য কৌতুকরসের কবিতায় একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কবি সেদিকেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।"[২৯]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায়বাহাদুর ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৩ তারিখে এক অভিনন্দন পত্রে শেখ হবিবর রহমানকে 'পরিহাস রস বা ব্যঙ্গ রচনায় বিশেষ দক্ষ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে এ-গ্রন্থের ভূমিকা ও তাৎপর্য ছিল নানান কারণে অর্থবহ।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে নানা কারণেই মুসলমানদের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছে। বাংলা গদ্যের উন্মেষের যুগে মুসলমানদের কোন ভূমিকা না থাকায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়নি। তবে বিলম্বিত পদক্ষেপ হলেও পরবর্তী পর্যায়ে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখাতে সমর্থ হন। আধুনিক যুগে মুসলমান-সাহিত্যিকরা সমাজ-সচেতনতার যে পরিচয় দান করেছিলেন, তার স্বাক্ষর উপন্যাসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে। সে কারণে মুসলিম সমাজের চিত্র সন্ধানে মুসলিম-উপন্যাসিকগণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নিজেদের সমাজের অনগ্রসরতা ও দুঃখ দুর্দশা তাঁদের পীড়িত করেছিল। তাই সমাজ-চিত্র সন্ধান ও সংস্কার মানসে তাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন।

মুসলিম-উপন্যাসিকদের সারিতে প্রথম মুসলিম-উপন্যাসিক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস হলো 'রত্নাবতী'। এটিই মুসলিম-রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে 'বিষাদ সিন্ধু', 'উদাসিন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়ার বস্তানী', 'এসলামের জয়', 'রাজিয়া খাতুন', 'তাহমিনা', 'বাঁধা খাতা', 'নিয়তি কি অবনতি'।

Dhaka University Institutional Repository

তারই ধারাবাহিকতায় নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, আর্জমন্দ আলী চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ নজিবর রহমান, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ, ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, শাহাদাৎ হোসেন, নুরুন্নেসা খাতুন, কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ উপন্যাসিকদের সমসাময়িক লেখক হলেন শেখ হবিবর রহমান। শেখ হবিবর রহমান বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পদচারণা করেছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

শেখ হবিবর রহমানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'আলমগীর'। মোঘল সম্রাট সাজাহানের পুত্র মোঘল সাম্রাজের শ্রেষ্টতম শাসক আওরঙ্গজেব এই উপন্যাসের বিষয়। সাম্রাজ্যবাদী ও মুসলিম-বিদ্বেষী চক্রের লিখিত ইতিহাসে বাদশা আলমগীর এক বিতর্কিত চরিত্র। কিন্তু শেখ হবিবর রহমান সেই চরিত্রকে বিতর্কের বাইরে এনে শ্রেষ্ট শাসক হিসাবে, তাঁর মহাত্ম বৈরি শক্তির সাথে মোকাবিলার দৃঢ়তা, ইসলামি নীতিমালার অনুসরণ এবং সংস্কারের ধারায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন সম্মানের সাথে। উপন্যাসটির ভাষা এবং রচনাশৈলী অনন্য সাধারণ। উপন্যাসটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তিনি প্রকৃত ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন যথাযথ পাদটীকা সংযোজন করে। ইতিহাসের অঙ্গ-আবর্ত থেকে শেখ হবিবর রহমান যথার্থ বাদশা আওরঙ্গজীবকে উন্মোচন করেছেন, ফলে গ্রন্থটি না ইতিহাস না উপন্যাস। এ দুয়ের মাঝখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি মহান সম্রাট হাফেজ মওলানা মহীউদ্দীন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব ওরফে আলমগীর। মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে তিনি সম্মানিত। তাঁর যোগ্যতা ও কর্মকুশলতা, নবজাগ্রত বৈরী শক্তির সাথে সার্থক মোকাবিলা, ইস্পাতদৃঢ় চরিত্র মাহাত্ম, শাসন-ব্যবস্থায় ইসলামী নীতিমালার অনুসরণ ও সংস্কার ধারা তাকে এক গৌরবময় আসনে সমাসীন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক চক্রের লিখিত ইতিহাসে তিনি বিতর্কিত অথচ তাঁর জনকল্যাণমূলক শাসননীতি অবশ্যই নিরপেক্ষ মূল্যায়নের দাবীদার। Stainly Lane poole এবং Sir jadunath sarker লিখিত আওরঙ্গজেবের ইতিহাস-এর প্রতিউত্তরেই শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন 'আলমগীর' রচনা করেন। আল এসলাম মাসিক পত্রে ১৩২৫ সনের বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত পর পর ৪টি সংখ্যায় 'আলমগীর' এর কয়েকটি পরিচ্ছদ প্রকাশিত হলে, তা সচেতন সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

উপন্যাস আকারে লিখিত এ-গ্রন্থে সম্রাট আলমগীরের সিংহাসন আরোহণ-পূর্বের একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাবলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত। সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উওরাধিকারিত্ব নিয়ে তুমুল গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ সশস্ত্র নয়-কুটনৈতিক ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। কিভাবে বিচক্ষণ দৃঢ়চেতা নির্ভীক ও খোদাভীরু আওরঙ্গজেব অর্থাৎ আলমগীর সকল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র পরাস্ত করে ভারতবর্ষের বাদশাহ্‌ হতে পেরেছিলেন; এ গ্রন্থে তাই বিবৃত হয়েছে। সংকটে চরিত্রের উন্মোচন ঘটিয়েছেন লেখক ইতিহাসশ্রয়ী কথার মালা নির্মাণের মাধ্যমে। টীকা-টিপ্পনীর মাধ্যমে ইতিহাসের সত্যকে বর্ণনার আদলে

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে লেখকের ক্ষমতা এবং তা পাঠকের কাছে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপনের নমুনা নিম্নোদ্ধৃত অংশে পাওয়া যায়। সম্রাট শাহজাহানের সাথে কেন্দ্রে (দিল্লীতে) অবস্থান করছেন জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা। দাক্ষিণ্যাত্যে দায়িত্ব পালনরত আওরঙ্গজেব এবং বাংলায় দায়িত্ব পালনরত সুজা। সিংহাসন কুক্ষিগত করার ব্যাপারে দারার আগ্রহ এবং সম্রাট শাহজাহানের পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে আওরঙ্গজেবসহ অন্যান্য পুত্ররা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কেন্দ্র থেকে পাঠানো সেনাপতি সোলেমান-এর হাতে সুজা পরাজয় বরণ করে বাংলায়। এখন সমস্যা আওরঙ্গজেব। দারা আওরঙ্গজেবকে সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে। ইতিমধ্যে প্রেরিত যশোবন্ত সিংহ আওরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত হয়েছে। দারা তাই আরো বেশি প্রতিশোধের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এ-পর্যায়ে সম্রাট শাহজাহান দারাকে বলছেন–

> *"সম্রাট-বাবা, ক্ষান্ত হও। এ সমস্ত খেয়াল মন হইতে দূর কর। আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধের সঙ্কল্প ত্যাগ কর। আমি তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, আওরঙ্গজেবকে আগ্রা আগমনে বাঁধা দিয়া কাজ নাই। সে আমার সম্মুক্ষে কখনই অবাধ্যতা করিতে পারিবে না। মহামতি নাসির খা, লতাফত খাঁ ইত্যাদি যে মত দিয়াছিলেন তাহাই সঙ্গত; শাহ্যাদাগণের সম্মুখে আমি স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহারা কেহই মাথা তুলিতে পারিত না। আমি স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহাদের সৈন্য সেনাপতিগণও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে সঙ্কুচিত হইত। এমতাবস্থায় শাহ্যাদাগণকে আমার আদেশের বাধ্য করিয়া অনায়াসে যথাস্থানে প্রেরণ করা যাইত। কিন্তু তোমার জেদে তাহা হইল না। তোমার কোন কথা আমি না রাখিয়া পারি না। তাই না যশোবন্ত সিংহকে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে পাঠান হইল। তাহার ত এই শোচনীয় পরিণাম। এখনো বলিতেছি যাহা হইবার হইয়াছে, আর আওরঙ্গজেবকে বাঁধা দিয়া কাজ নাই। আমি স্বয়ং তাহাদিগকে সম্মুখে উপস্থিত হইলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।"*[৩০]

উপন্যাসের ভাষা ও রচনাশৈলী হৃদয়গ্রাহী। তথ্য সংগ্রহে পরিশ্রমের প্রমাণ পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। ইসলামের মূলনীতি ও আদর্শের আলোকে তদানীন্তন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক অবস্থান বিশ্লেষণ এবং তদ্বারা সমকালীন পুস্তক রচনাকালে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের অবস্থাগত সম্পর্ক নির্মাণে একটা গঠনমূলক প্রতীতির জন্ম দেয়া লেখক হবিবর রহমানের উদ্দেশ্য ছিল। মুহম্মদ আবদুল হাই-এর ভাষায়–

> *“৫৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ‘আলমগীর’ গ্রন্থে হিন্দু শাস্ত্রে ইসলামের প্রমান দান, ‘নিরাকার উপাসনার মুক্তি’ এবং মানব ই খুদা শীর্ষক পরিচ্ছেদ গুলোতে ‘আলমগীর’ রচনার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থটিকে Defence of Alamgir বলা যেতে পারে। এটি না ইতিহাস, না উপন্যাস, না ঐতিহাসিক উপন্যাস। এটিকে এক ধরনের crronicle বলা যেতে পারে।”*৩১

এ-গ্রন্থে ‘দারার সৈন্যদল’ নামক অংশটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা পাঠ্য বইয়ে গৃহীত হয়েছিল। গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট-৩ হিসেবে সংযোজিত হয়েছে ‘সম্রাট আওরঙ্গজেব ও সাম্প্রদায়িকতা’ অংশটি। এ অংশটি রচিত ও সংযোজিত হয়েছিলো এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। লেখক সে সম্পর্কে গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন–

> *“বর্তমান সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে দেশবাসীর বিশেষ করিয়া মুসলমান সমাজের সকল দিক দিয়া কত ক্ষতি হইয়াছে এবং ক্ষতির সম্ভবনা রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। মনে হয়, এদেশের মুসলমান সমাজের সম্মুখে এমন বিপদ আর কখনই আসে নাই। এই দুঃসময় ভারতের মুসলমান শাসনের শেষ যুগের আদর্শ মহাপরাক্রান্ত সম্রাট হাফেজ, গাজী মাওলানা মহীউদ্দীন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব ওরফে আলমগীর জিন্দাপীর মহোদয়ের পবিত্র জীবনের আদর্শ অনুসরণ*

Dhaka University Institutional Repository

*করিয়া চলা ভারতবাসীর বিশেষ করিয়া মুসলমান সমাজের একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করি। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সংকলিত ''ফতোয়ায়ে আলমগীর'' একখানি সুবিরাট ফিকাহ্‌র কিতাব বা ইসলামের আইনগ্রন্থ। এদেশের আলেমসমাজ এখনও এই কিতাব খানিকে বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। ইসলাম এদেশে সর্বশেষ শক্তি ও উন্নতি আওরঙ্গজেবের নিকটেই লাভ করিয়াছিল। (islam made its last onward movment in India in his reign- pro sarker) তিনি সমগ্রজীবন অত্যন্ত কঠোরভাবে কুরআন শরীফের নীতি এবং হযরত মুহাম্মদের জীবনের পবিত্র আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কার্যাবলী হইতে দেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট আবহাওয়ায় আমাদের কর্তব্যের একটা ইঙ্গিতলাভ করিতে চেষ্টা করা আশাকরি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।"*৩২

মাসিক 'সওগাত' এর ১৩৩৩ কার্তিক সংখ্যায় গ্রন্থখানির 'আলোচনায়' উল্লেখ করা হয়–

"মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে সিংহাসনারোহণ সময়ে যে সমস্ত প্রবল বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাই লইয়া এই গ্রন্থখানি উপন্যাসের ন্যায় মধুর ভাষাভঙ্গিতে লিখিত হইয়াছে। ইহা যেমন ইতিহাস নহে, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসও নহে। ইহাতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বিবৃতি নাই, তেমনি ইহাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উন্নত কল্পনা সৌন্দর্যও নাই। ইহাতে সেই সময়কার একটা স্থুল ঐতিহাসিক ধারণা পাঠকের মনে বিবৃত করিবার প্রয়াস আছে। তাই ইহা দ্বারা বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস পাঠের তৃপ্তি পাওয়া না গেলেও আমরা ইহাতে সেই বিপ্লব যুগের একটা সত্য ঐতিহাসিক চেহারা দেখিতে পাই। সে যাহা হউক সম্রাট আওরঙ্গজেবের আধুনিক ইতহাস চিত্রিত মসীমলিন চরিত্রকে উদ্ধার করিয়া লেখক বাঙ্গালীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। আওরঙ্গজেবের চরিত্র যে সত্যিই মসীমলিন নহে পরন্ত গৌরবদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল তাহা লেখক নানা ঐতিহাসিক reference দিয়া প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস না হইলেও অতঃপর এই সময়ের খাঁটি ইতিহাস প্রণয়নে ইহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইহার রচনা উপন্যাসের মত

Dhaka University Institutional Repository

*মধুর হওয়াতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস অপেক্ষা অধিক সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়।"*৩৩

দুটি অধ্যায়ে বিভাজন করে শেখ হবিবর রহমান আওরঙ্গজেবের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে যে উপন্যাস লিখেছেন, তা কেবল হাতে গোনা ক-জন শক্তিশালী লেখকের পক্ষেই সম্ভব। পরিচ্ছদগুলো হচ্ছে – গুপ্তচর, দারার কুটচক্র, শিবাজীর লুণ্ঠন, ঈশা বেগ কারাগারে, মুরাদের মুসাহেবা, মুরাদ চরিত, আলী নকীকে হত্যা, আওরঙ্গজেবের চিন্তা, আওরঙ্গজেবের সাহায্য, মুরাদের মোসাহেব, মীর জুমলার পরিচয়, ঈশা বেগের সমর, আওরঙ্গজেবের সমর সজ্জা, সুজার ভাগ্য বিপর্যয়, দারার পরিচয়, সাজাহান ও দারা, যশোবন্তের চিন্তা, মুরাদের মিলন, সাজাহানের উপদেশ, দরবেশের আস্তানায়, সামগড়ের সমরচিন্তা, অবসন্ন দারা, যুদ্ধাবসান, দারার দুর্গতি, হরিষে বিষাদ, জয়সিংহ ও দিলির খান, আওরঙ্গজেবের অভিযোগ, আওরঙ্গজেব ও শায়েস্তা খান, সাজাহানের আচরণ, কারবালার অভিনয়, সাজাহানের উপদেশ, মুরাদের মোসাহেব, মুরাদের শক্তি সঞ্চয়, সুজা ও আওরঙ্গজেব, আওরঙ্গজেব ও মীর জুমলা, সাময়িক সম্ভাষণ, যশোবন্তের ষড়যন্ত্র, খাজোয়া যুদ্ধ, দারার চিন্তা, দারার দুর্গতি, ভীতি বিহ্ক্ষল যশোবন্ত, বিশ্বাসঘাতক যশোবন্ত, সর্বহারা দারা, প্রমোদ কাননে, শোক বিহ্বল দারা, দারার প্রাণদণ্ড, প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায়, অভিষোকৎসব, অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার ও আওরঙ্গজেব, আওরঙ্গজেবের চরিত্র, সম্রাট আওরঙ্গজেব ও সাম্প্রদায়িকতা।

প্রথম পরিচ্ছদে 'গুপ্তচর' শিরোনামে একজন পথিক বেশী গুপ্তচরের বর্ণনার পাশাপাশি শেখ হবিবর রহমান দিল্লির শাসনকর্তা সম্রাট সাজাহান ও তাঁর চার পুত্রের শাসন-নীতি বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। অসুস্থ সাজাহানের পরিবর্তে কেন্দ্রে শাসন কাজ চালিয়েছেন দারা। বাংলার সুবেদারের দায়িত্বে রয়েছেন পুত্র সুজা। রণবীর মুরাদ বখশ, গুজরাটের সুবেদারের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আলমগীর দক্ষিণ প্রদেশের দায়িত্বে রয়েছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছদে 'দারার কুটচক্র' শিরোনামে লেখক 'বিজয়পুর' নামক শক্তিশালী রাজ্যের শাসন-নীতি ও কুটপ্রনালী বর্ণনা করেছেন। দারার সৈন্য-বাহিনী বিজয়পুর রাজ্য সম্মুখ-যুদ্ধে রক্তপাতের মাধ্যমে দখল নেন এবং এ-রাজ্যের অন্যতম দুর্গ কাসিয়ানি দখল করেন এবং এ-রাজ্যের সাথে সন্ধি-চুক্তি করার চেষ্টা ক'রতেই কেন্দ্র থেকে খবর আসে এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার জন্য। আলমগীর তাই চিন্তায় পড়ে যান। 'শিবাজীর লুণ্ঠন' পর্বে শিবাজী একজন জায়গীরদারের পুত্র হয়ে দলবল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে লুটপাটের মাধ্যমে একে একে অনেকগুলো পাহাড়ি অঞ্চল দখল করে নেয়। আলমগীর এ-খবর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং সকাল বেলায় সহস্র সৈন্য নিয়ে শিবাজীকে বধ করার জন্য কানার অঞ্চলে প্রবেশ করে।

অন্যদিকে কেন্দ্রের আদেশে ঈশা বেগকে আটক করে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। এদিকে সম্রাট সাজাহান ধীরে ধীরে সুস্থ হয়। সুস্থ হয়ে সাজাহান ঈশা বেগকে মুক্তি এবং সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য হুকুম করে। মুরাদের 'মোসাহেবা পর্বে' দেখা যায় – মুরাদের লম্পট মদ্যপ আচরণে অতিষ্ঠ হয় দেশবাসী। তাঁর মোসাহেবরা তাঁকে নানাভাবে হীন-কাজে রত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। কিন্তু সকল অপকর্মের বাঁধা হয়ে রয়েছেন পিতা সাজাহানের প্রেরিত প্রধানমন্ত্রী আলী নকী। আলী নকীর কারণে মুরাদ নানা অপকর্ম করতে গিয়ে বাঁধাগ্রস্থ হতে থাকে। তাই মুরাদ আলী নকীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আলী নকীকে

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা করে তাঁর সৈন্যরা। হত্যাকাণ্ডের এই খবর, পিতার শারীরিক অসুস্থতা এবং দারার সহিষ্ণু আচরণের খবরে আলমগীর চিন্তায় পড়ে যান।

এদিকে দারা পুত্র সোলায়মান এবং সেনা-নায়ক জয়সিংহকে পাঠায় বাংলা আক্রমণ করার জন্য। গোয়েন্দা মারফত এই খবর পেয়ে সুজা তাদের প্রতিহত এবং দিল্লি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয় । কিন্তু দুর্ভাগ্য সুজা কিছু বুঝে উঠার আগে সোলায়মান ও জয়সিংহ তাদের আক্রমন করে। এই আক্রমণে সুজার সৈন্য-বাহিনী নির্মমভাবে পরাজিত হয়। সুজা জীবন নিয়ে নৌকা যোগে পালিয়ে যায়। এদিকে মুরাদ ও আলমগীর মিলিত হয়। এদিকে মুরাদ চায় দিল্লি আক্রমণ করতে কিন্তু আলমগীর চায় পিতার সাথে দেখা করতে। আলমগীর পিতার বিরুদ্ধে কোনভাবেই যুদ্ধ করতে চায় না। সে চায় পিতার সাথে সাক্ষাৎ করে আশির্বাদ নিতে; তাই পিতার সাথে স্বাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চেয়ে দারার কাছে চিঠি লিখেছেন আলমগীর। কুটকৌশলী দারা আওরঙ্গজেবকে এ-সুযোগ না দিয়ে আলমগীরের সাথে সে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে দারার প্রেরিত সৈন্যরা দারুণভাবে পরাজিত হয়। পরাজিত সৈন্যরা কেন্দ্রে এসে দারার কাছে এ-খবর দিতেই দারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। পিতার বারণ সত্ত্বেও দারা সহস্র সৈন্য নিয়ে ক্ষিপ্ত বেগে ছুটে যায়। দারার সৈন্যরা আলমগীরের চারপাশ ঘিরে ফেলে। আলমগীর তাৎক্ষণিকভাবে এ-যুদ্ধ প্রতিহত করার ব্যবস্থা নেয়। প্রতিরোধমূলক এ-যুদ্ধে দারার সৈন্য-বাহিনী দারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। হাজারো সৈন্য নিহত ও আহত হয়। দারা কোন রকম প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দারা কেন্দ্রে এসে পরিকল্পনা করে কিভাবে এর প্রতিশোধ নেয়া যায়। তাই সে ভাই সুজার সাথে মিলিত হয়ে সৈন্য সামন্ত বাড়িয়ে কেন্দ্র আক্রমণ করার চিন্তা করে। দারা তাই পুত্র সোলেমানকে চিঠিতে জানিয়ে দেয় যে, সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে যেন তার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে এবং সুজার সৈন্য সহযোগে যেন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। তারা একত্রে আলমগীরের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু দুর্ভাগ্য পুত্র সোলেমানের আহ্বানে প্রধান সেনাপতিসহ আরো অনেকে এ-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে চাইল না, বরং তারা আলমগীরের সাথে মিলিত হতে একাত্মতা ঘোষণা করল।

এদিকে বৃদ্ধ পিতা সাহজাহান পুত্র আলমগীরের কাছে চিঠি লিখেন, তাকে যেন একবার দেখতে আসেন। পিতার চিঠি পেয়ে আলমগীরের মনটা আবেগ আপ্লুত হয়ে উঠে। এদিকে আলমগীরকে শায়েস্তা খান এবং খলিলুল্লাহ প্রস্তাব দেন যে, যেন পিতার এ চিঠি পেয়ে তিনি ছুটে না যান। কেন্দ্রে গেলে আলমগীর দারার হাতে নিশ্চিত বন্দি হবেন। এদিকে আগ্রায় বসে আলমগীর সুজা ও দারার আক্রমণের খবর পান। তাই আলমগীর কৌশল করে মুরাদকে সাথে নিতে চাইলেন এবং মুরাদকে দিল্লির সিংহাসনে বসার সুযোগ দিবেন, এই আশ্বাসে মুরাদ আলমগীরের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করল। মুরাদ স্বসৈন্য নিয়ে আগ্রায় এলে আলমগীরের সৈন্যরা তাকে আটক করে। এবার আলমগীর দারা ও সুজার সৈন্যদের মোকাবেলা করার জন্য ফজোয়ায় মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হন। সম্মুখ এই যুদ্ধে সুজা ও দারার সৈন্যরা আবার দারুণভাবে পরাজিত হয় এবং সুজা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় এবং দারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পালিয়ে যায়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে দারা বনে-বাদাড়ে পালিয়ে বেড়াতে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। তবুও দারা ধরা পড়ে যায় আলমগীরের সৈন্যদের হাতে। এভাবেই আলমগীরের হাতে ক্ষমতা এসে পড়ে। আলমগীর হয়ে উঠেন দিল্লিশ্বর। দারার কৃতকর্মের জন্য আলমগীর তার প্রাণদণ্ড দেয়।

মোঘল সম্রাট আলমগীরকে নিয়ে রচিত শেখ হবিবর রহমানের এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন জায়গা তৈরি করেছে। সম্রাট সাজাহানকে বন্দি করে, সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে নৃশংস হানাহানি, দারা পরিবারের অমানুষিক মৃত্যু, মুরাদের পরিণাম, সুজার পলায়ন প্রভৃতি ঘটনার সমন্বয়ে শেখ হবিবর রহমান 'আলমগীর' রচনা করেছেন। মানব হৃদয়ের সুক্ষ্ণ অনুভূতি ও জটিলতা, বিরোধ ও অন্তবিরোধ, প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, হিংসা, লোভ, ত্যাগ প্রভৃতি উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। কাহিনীর রসাবেদন সৃষ্টিতে ও নাটকীয় সামগ্রিকতার উন্নয়নে দারার মর্মন্তুদ দুর্দশা, সুজার দুর্ভাগ্য পীড়ন, অর্থের মোহ, পিয়ারার পরিহাস, উচ্ছলতা ও সেই সাথে প্রেমের আওর্ত দোলা, পিতৃভক্ত সোলেমান ও মোহাম্মদের বিশ্বাস ভঙ্গের নাটকীয়তা, জাহানারার তেজস্বিতা, আওরঙ্গজেবের শৌর্য ও কুটিলতা প্রভৃতি নানা ঘটনাদির আশ্রয় এবং তাদের একাগ্রতা ও অবিচ্ছিন্ন জীবন-ধারণ অত্যন্ত করুণ।

এই উপন্যাসের আবেদন এইভাবেই কেন্দ্রীভূত শক্তির বিন্দুগুলো স্পর্শ করে মানুষের কাছে হয়েছে মোহনীয় এবং দেশকালের সঙ্গে হয়েছে সম্পর্কিত। পাক-ভারত উপমহাদেশ জুড়ে ঘটনার এই মহাঘূর্ণী দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করে পাঠকের অন্তরেও ঘূর্ণি তুলেছে সহজ শিল্পগুণে। ট্রাজেডির ভয়াবহতা, গভীরতায় ঘটনার সেই গতি ও বাস্তবতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে পাঠক দৃষ্টিতে।

Dhaka University Institutional Repository

গল্প

শেখ হবিবর রহমানের গল্পের সংকলন মুলত ছয়টি। এই ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে 'নিয়ামত' তার উল্লেখযোগ্য রচনা। 'নিয়ামত'-এ গল্পের সংখ্যা বারো। এর মধ্যে প্রধান বিষয় সমকালীন মুসলিম-সমাজ-জীবনের নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতা। শেখ হবিবর রহমান বাঙালি মুসলমান-সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন এ গল্পে। সমাজ-হিতৈষী হিসেবে কবি তাঁর যৌক্তিক দায়িত্ব পালন করেছেন ছোট গল্প সমুহে। ছোট গল্পের শৈলী ও আঙ্গিক কুশলতায় গল্পগুলো কিছুটা দুর্বল হলেও সমকালীন মুসলিম সমাজ-সচেতনতায় এ গল্পগুলোর মূল্য স্বীকার করতেই হবে।

'নিয়ামত' গল্প-সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মোবারক আলী। গ্রন্থটি মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

'নিয়ামত' ছাড়া শেখ হবিবর রহমানের অন্যান্য গল্পে কখনো হাস্যরস বিতরিত হয়েছে, কখনো পরীর দেশের অলৌকিক আখ্যান বর্ণিত হয়েছে, কখনো কখনো প্রেমের উপাখ্যান হয়েছে। সব মিলিয়ে তিনি গল্প ব'লেছেন। এসব গল্পের আমেজ-ই বেশি এবং কাহিনী বর্ণনা করাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ছোটদের জন্য যে গল্প তিনি রচনা করেছেন, সেখানে উপদেশ প্রধান। ছোটদের গল্প বুস্তা, গুলিস্তার আরব্য রজনী এবং কোরআন শরীফের গল্প অন্যান্য উপকথাকে গল্পাকারে রূপান্তর ক'রেছেন শেখ হবিবর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান। ছোট গল্পের জন্য যে শৈল্পিক মননশীলতার প্রয়োজন, শেখ হবিবর রহমানের গল্পে তা সীমিত হলেও সমাজ এবং জনহিতকল্পে তাঁর গল্প অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।

'নিয়ামত' গল্প-সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মোবারক আলী। গ্রন্থটি মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

'যশোহর-খুলনা সিদ্দিকীয়া সাহিত্য-সমিতি'র বিভিন্ন অধিবেশনে পাঠ করার জন্য এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে লিখিত হ'য়েছে এই ১২টি গল্প। 'নিয়ামত'-এর মাত্র একটি সংস্করণই প্রকাশিত হয়েছিলো। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে কয়েকটি গল্প সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। গ্রন্থখানি লেখকের প্রিয় সাহিত্যিক বন্ধু 'আকরম হোসেন'কে উৎসর্গ করেছেন।

গ্রন্থের প্রথম গল্প 'প্রবাহ'। নজিমদ্দীন নামের এক দরিদ্র মুসলমান কৃষকের দুঃখ তাড়িত জীবনের কথা লিখেছেন শেখ হবিবর রহমান। মাঝালদিয়ার হিন্দু জমিদার কর্তৃক নজিমদ্দীনসহ অন্যান্য কৃষকরাও অত্যাচারিত হ'তো। জমিদার পুত্রের বিবাহে চাঁদা দিতে ব্যর্থ কৃষকগণকে জমিদার বেঁধে রেখে অত্যাচার ক'রেছে। দামোদরের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে জমিদারসহ সকলে পানির প্রবাহে সর্বস্ব হারায়। শেখ হবিবর রহমান গল্পে দারিদ্র কৃষকদের করুণ জীবনের কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি একজন জমিদারও প্রকৃতির ভাঙ্গা গড়া খেলায় কিভাবে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন, সে চিত্র তুলে ধরেছেন। বাহু বল সব নয়, স্রষ্টার বিচার যে কত সুক্ষ, তাই লেখক তাঁর 'প্রবাহ' গল্পে বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'মুন্‌শী সাহেব' গল্পে শরা-শরীয়ত নিয়ে গ্রামীণ সমাজে কলহ কোন্দলের চিত্র তুলে ধরা হ'য়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'ফক্কড় শা'। সে একজন ভন্ড ফকির। তাঁর অবৈধ কার্যকলাপে কত সাধারণ মানুষ কিভাবে তাঁর দ্বারা প্রতারিত হ'য়েছে– তা খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন শেখ হবিবর রহমান। 'চোখে আঙ্গুল' গল্পেও আরেক ভন্ড ফকিরের প্রতারণার স্বরূপ উন্মোচন করা হ'য়েছে। 'নুরুল হোসেন' গল্পে লেখকের চরিত্র চিত্রণের মুনশীয়ানা লক্ষ্য করা যায়। ভিন্নধর্মী দুই চরিত্র নুরুল হোসেন ও আবুল হোসেন। ইংরেজী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত নুরুল হোসেনের চরিত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধায় ঘটে দারুণ অবনতি, পক্ষান্তরে মুনশী আবুল হোসেনের মধ্যে ঘটে মানবতাবোধ ও সম্ভ্রম

466270

বোধের দারুণ বিকাশ। পরিবেশ, সঙ্গ ও শিক্ষা কিভাবে চরিত্রকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে– গল্পে তা তুলে ধরা হ'য়েছে। 'কুলীন' গল্পে সামাজিক ও বংশ মর্যাদার অহমিকার করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করা যায়। 'মোল্লা বাকাউল্লা' স্ববিরোধী মানব চরিত্রের উন্মোচন। 'ভদ্রলোক' গল্পটিতে তৎকালীন সমাজ অবস্থানে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যেকার বিরাট বৈষম্য ও অবজ্ঞামূলক সম্পর্ক তুলে ধরা হ'য়েছে। 'স্মৃতি' একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ক গল্প। 'রেবতী বেগম' ইতিহাস আশ্রিত গল্প। অতুলচন্দ্র সিংহ রেবতীকে ভালোবাসত। রেবতীর পিতা হনুমান সিং নবাবের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর মেয়েকে নবাবের সাথে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে, রেবতী অসম্মতি প্রকাশ করে। ফলে রেবতীর বিয়ে হয় অশতিপর এক বৃদ্ধের সাথে। অতুল সন্ন্যাসবরণ ক'রে। স্বামীর মৃত্যুতে সতীদাহের সময় নবাবের সিপাহশালারের হস্তক্ষেপে রেবতী বেগম রক্ষা পায় এবং নবাব বাড়ীতে সে আশ্রিতা হয়। অতুল সিংহ খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর দরগায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'রে আতোয়ার রহমান নাম প্রাপ্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নবাবের উদ্যোগে আতোয়ার রহমানের সাথে রেবতীর বিবাহ হয়। শ্বাশত প্রেমের হয় জয়। 'প্রেমের দীক্ষা' গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে। 'সে' একটি গল্পের শিরোণাম। এই গল্পে একজন মানুষের শৈশব-কৈশোর-যৌবন, কর্মজীবন, বৃদ্ধবয়স, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বৃদ্ধিদীপ্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

"নিয়ামত"-এর গল্পগুলো পর্যালোচনা ক'রলে দেখা যায় সমকালীন সমাজ-জীবনের কয়েকটি অনিবার্য সমস্যা ও জটিলতাকে কেন্দ্র ক'রে কাহিনীগুলো নির্মিত হ'য়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সমাজ সমস্যার ব্যাপারে লেখকের একটা যুক্তিবাদী ও গঠনমুখী বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের বাঙালী মুসলমান সমাজের চিত্রকর্ম হিসেবে 'নিয়ামত'-এর গল্পগুলোর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১৩২৬ শ্রাবণে মাসিক সওগাতে 'নিয়ামতে'-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়–

> *"মুসলমান লেখকগণের ছোটগল্প সমালোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। ছোটগল্প রচনায় যথেষ্ট আর্টের প্রয়োজন ও লেখকের সাধনা সাপেক্ষ। 'নিয়ামতের' অধিকাংশ গল্পে যদিও আমরা তেমন প্লটের অনুসন্ধান পাই নাই, তথাপি সমাজের দিক দিয়া লেখক কতকগুলি খাটি কথা বলিয়াছেন। সমাজ সংস্কারের দিকে লেখকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। ইহা যথেষ্ট প্রশংসার বিষয়। 'মোল্লা বাকাউল্ল্যা' ও 'চোখে আঙ্গুল' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। লেখকের ভাষা মন্দ নহে কিন্তু অনর্থক অতিমাত্রায় আরবী পার্শীর ব্যবহার করিয়া স্থানে স্থানে ভাষাকে আড়ষ্ট করা হইয়াছে। সে এই সবর্ক্ষনামটি গল্পের নামে ব্যবহার করিয়া লেখক তাহার পাঠকগণকে একটা মজার ধাঁ ধাঁ লাগাইয়াছেন। মোটকথা আমাদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে রূপ গল্প দেখিতে পাই তাহাপেক্ষা নিয়ামতে উচ্চ শ্রেণীর গল্প আমাদের নজরে পড়িয়াছে।"*৩৪

Dhaka University Institutional Repository

'নুরুল হোসেন' শেখ হবিবর রহমানের একটি বিখ্যাত গল্প।। 'নুরুল হোসেন' গল্পে লেখকর চরিত্র চিত্রণে ভাষার-ব্যবহারে যথেষ্ট আধুনিকতা এনেছেন। এঁকেছেন যেন বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। ইংরেজী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত নুরুল হোসেনের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি একদম শ্রদ্ধা নেই। পরিবেশ, সঙ্গ ও শিক্ষা কিভাবে চরিত্রকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে– এই গল্পে তা তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের শুরু হ'য়েছে এইভাবে–

> *"সন্ধ্যার রক্তিম রবি ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছিল। দিবা শেষে গাভীগণ সারি বাধিয়া গৃহাভিমুখে আসিতেছিল। পরিস্কার নীল আকাশের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি একত্রিত হইয়া যেন কি এক গভীর পরামর্শে ব্যাপৃত ছিল। ধীরে ধীরে সমীরণ নিঃশব্দে বহিয়া বহিয়া যেন জগতের প্রাণে কি এক নবীণ চেতনা জাগাইয়া তুলিতেছিল। এ হেন মধুর বসন্ত সান্ধ্য বাত্যান্দোলিত ফুল্লমুকুলবৎ দুইটি প্রিয়দর্শন বালক বিজয় নগরের ম্যাঠে সন্নিধানে বটবৃক্ষতলে বসিয়া তাহাদের অনন্ত মাধুরীর সহিত প্রকৃতির প্রশান্ত সৌন্দর্য্য মিলাইয়া দিয়া ভাবুকের প্রাণে কি এক নূতন তন্ময়তা ঢালিয়া দিতেছি।"*[৩৫]

নিয়ামত গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্পেই সমকালীন মুসলিম সমাজের নানা রকম জটিল সমস্যাগুলো লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন এবং এর থেকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন। হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলিম সাধারন কৃষকরা কিভাবে নির্যাতিত হতো তা যেমন ফুটে উঠেছে অন্যথায় মূর্খ বা অর্ধশিক্ষিত মোল্লা মৌলভীরা কিভাবে শরা-শরিয়ত দিয়ে মুসলিম সমাজে কোন্দল তৈরি হতো– তা পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া ধর্মান্তরিত হয়ে কিভাবে মুসলিম যুগল্লয় প্রেম ও প্রণয়ে লিপ্ত হয়– তাও তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পগ্রন্থে। বিশেষকরে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের সাথে মোল্লাদের যে মানসিক ও সামাজিক দ্বন্ধ হয়– তাও এ গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক। গল্পগ্রন্থটি সর্বকালীন আধুনিক।

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা বাকাউল্লা

'মোল্লা বাকাউল্লা' শেখ হবিবর রহমানের অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৪৭ সালে 'পারিজাত সাহিত্য কুটীর' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে' উল্লেখ করা হয়েছে–

"যে মোল্লা বাকাউল্লা" নামক হাস্যরসপূর্ণ অতুলনীয় গল্পটি পাঠ করিয়া ত্রিশ বৎসর আগে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সহস্র পাঠক স্তম্ভিত ছিল। এই পুস্তকে সেই অমূল্য গল্পটি ও আরো কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে।" ৩৬

'মোল্লা বাকাউল্লা' গল্পে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন মূলত মানব-চরিত্রের স্ববিরোধিতা উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। সীমাবদ্ধ হৃদয় বুদ্ধি ও স্বার্থবাদী মানুষ কিভাবে নিজের অজান্তে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে, মোল্লা বাকাউল্লার জীবনে যে রূপান্তর লক্ষ করা যায়, তা তার শ্রেণীভুক্ত মানুষ ও সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। চরিত্র চিত্রণ ও লিপিকুশলতায় 'মোল্লা বাকাউল্লা' তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে একজন মুসলমান গল্পকারের হাতে অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পটির শুরু ও কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে তাঁর আভাস পাওয়া যায়–

"ক্রমে ক্রমে মোল্লা বাকাউল্লার পরহেজগারীর কথা চারদিকে মশহুর হইয়া পড়িল। মোল্লাজীরও বিশ্বাস হইল যে তিনি সে অঞ্চলের মধ্যে বেশ একজন পাক্কা দীনদার আলেম।

আজ কয়েক বৎসর হইল মোল্লা সাহেব হিন্দুস্থান পাশ করিয়া আসিয়াছেন এইরূপই প্রকাশ; কিন্তু কোন মাদ্রাসা হইতে কি পাশ করিয়া আসিয়াছেন, সে সব তথ্য কেহই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিত না। কেহ মনে করিলেও গোস্তাখীর ভয়ে

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না। আজানুলম্বিত তাহার দোদুল্যমান চোগা এবং আন্দাজ করিয়া লইত।

আমাদের মোল্লা বাকাউল্লা সাহেবের ছাত্র-জীবন কিন্তু অন্য রকমের। শৈশবের গ্রাম্য পাঠশালায় যখন তিনি পড়িতেন, তখন স্কুলের সময় হইলে প্রায়ই তাহার মাথা ধরিত বা পেটে বেদনা হইত। অনেক সময়ে তাহাকে 'এস্তেক্‌বাল' করিয়া আনিবার জন্য গুরু মহাশয় লোক লস্কর পাঠাইয়া দিতেন। তাহারা তাহাকে সসম্মানে কেহ হাত ধরিয়া, কেহ পা ধরিয়া, কেহবা অতি আদরে কান ধরিয়া শূণ্যে শূন্য মহা সমারোহে পাঠশালায় লইয়া আসিত; আর সঙ্গে সঙ্গে বেহারাগণের অনুকরণের সমকণ্ঠে ঝুমর উঠিত–

''বোকা যাবে শ্বশুর বাড়ী সঙ্গে যাবে কে,
পাঠশালাতে জোড়াবেত নাচতে লেগেছে।''

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে বাকাউল্লাহকে তাহার সহপাঠিগণও গুরু মহাশয় বোকাউল্লাকে কখনও শুধু বোকা বলিয়া ডাকিত। আমরা কিন্তু তাই বলিয়া তাহার নামের কখনই এরূপ অসম্মান করিতে পারিব না।"[৩৭]

'মোল্লা বাকাউল্লা' গল্পটি শেখ হবিবর রহমানের সমাজ সচেতনামূলক গল্প। গল্পে বাংলার সামাজিক জীবনে 'মোল্লা বাকাউল্লার' মতো অগণিত বাকাউল্লা রয়েছে। লেখক খোঁচা দিয়েছেন বাবরবার এবং হাস্যরস ও ব্যঙ্গভাবে তুলে ধরেছেন বাকাউল্লাদের জীবন প্রণালী।

ছোটদের গল্প

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'ছোটদের গল্প' শেখ হবিবর রহমানের কিশোর পাঠ্য গল্প সংকলন। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন শেখ আমজাদ

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন। গ্রন্থটি মডার্ন বুক ডিপো, খুলনা থেকে ৮ জুলাই ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ নবম সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে।

নীতিকথা জাতীয় ৩৩টি গল্পের সংকলন নিয়ে 'ছোটদের গল্প' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ২টি গল্প বুস্তা থেকে, ১টি গল্প গুলিস্তা থেকে, আরব্য উপন্যাস থেকে ২টি এবং কোরআন শরীফের ১টি বাদে বাকী গল্পগুলো দেশের বিভিন্ন উপকথা ও কল্পকথা অবলম্বনে রচিত। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্কুল-সমূহের চতুর্থ শ্রেণীর দ্রুত পঠন হিসেবে অনুমোদিত হয়েছিলো।[৩৮] গ্রন্থটির কোন কপি খুজে পাওয়া যায়নি।

সংক্ষেপে বিষাদ সিন্ধু

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'সংক্ষেপে বিষাদ সিন্ধু' শেখ হবিবর রহমানের একটি ইতিহাসধর্মী গল্প গ্রন্থ। এটিকে গল্প না বলে ঐতিহাসিক আলেখ্য বলা যেতে পারে। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন কবির ভাই শেখ ফজলর রহমান। গ্রন্থটি ১৯৩৭ সালে বুনাগাতি, যশোহর হতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত ছিল যে, মীর মশাররফ হোসেনের অমর সাহিত্যকর্ম 'বিষাদ সিন্ধু'র একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করেছেন শেখ হবিবর রহমান। 'বিষাদ সিন্ধু'র মহাকাব্যিক ভাষা বর্ণনা-রীতি সাধারণ পাঠকের কাছে সব সময় সহজবোধ্য ও পাঠ্য হয়ে ওঠে না। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সাধারণ বাঙালি পাঠকের পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

যাতে এই মহাগ্রন্থখানির বক্তব্য বিষয় সহজে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে সহজ সরল ভাষায় ও ছোট ছোট বাক্য-বিন্যাসে 'বিষাদ সিন্ধু'র সংক্ষিপ্ত অবয়ব রচনা করেন। এ-সংক্ষিপ্ত করণের মধ্যেও নিজস্ব প্রকাশ শৈলী ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উপস্থাপনায় তাঁর স্বকীয় মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। কোমলমতি বালক-বালিকাগণের তথা কিশোর পাঠক পাঠিকাদের জন্য ছিলো এ এক অর্পূব উপহার।[৩৯] গ্রন্থটির কোন কপি খুঁজে না পাওয়ায় বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।

পরীর কাহিনী

'পরীর কাহিনী' শেখ হবিবর রহমানের আরো একটি বিখ্যাত প্রেমের গল্প গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ মোবারক আলী। ১৯১৬ সালের ২১ অক্টোবর কলকাতার মখদুমী লাইব্রেরী হতে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ৫টি সংস্করণ যথাক্রমে ১৯১৯, ১৯২৩, ১৯২৭, ১৯৩১ ও ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভুমিকায় গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন–

> *'পৃথিবীর সমস্ত দেশেই চিরকাল জেন, পরী, ভূত, প্রেত ইত্যাদির উপর সাধারণের বিশ্বাস আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে বা আমরা শুনিতে পাই, যাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। সেগুলি বিশ্বাস করিতে গেলে জেন পরী ইত্যাদির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা চলে না।*
>
> *এইরূপ একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক 'পরীর কাহিনী' রচিত। আখ্যায়ক একান্ত সরল হৃদয়ে মুক্তপ্রাণে যখন তাহার স্বীয় জীবনের অদ্ভুত কাহিনী আমার নিকটে বিবৃতি করা শেষ করিলেন, তখন ত্রিযামা রজনীর বিপুল গভীরতা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নিখিল ব্যাপিয়া। স্তব্ধ নীরবতা। সেই প্রশান্ত সময়ে তাহার প্রাণের প্রত্যেক*

Dhaka University Institutional Repository

কথা আমার প্রাণের মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার তৎকালীন উচ্ছ্বাস আবেশের ভাবে আমার হৃদয় ভাবময় হইয়া উঠিয়ছিল। বুঝিবা অলক্ষ্যে সহানুভূতির একবিন্দু তপ্ত অশ্রুও গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আমি একথা শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত নই যে, তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য। তবে তাহার বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিয়াছি ইহাই আমার বক্তব্য। কেহ ইহা বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"[৪০]

'পরীর কাহিনী' মূলত মানব-প্রেমের ট্রাজেডি কেন্দ্রিক গল্প। মানব সন্তান মণিরের সাথে পরীজাদী গোলবাহারের প্রেমের আলেখ্য নিয়ে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। ভাষার ভঙ্গিতে অভিনবত্বে লেখকের অতুলনীয় লিপি চাতুর্যে এ-কাহিনী বিন্যাস পাঠককে সম্মোহিত করে রাখে। বাস্তবের সাথে কল্পনা কখনো অমিল কখনো সমিল। নিত্যনৈমিত্তিক জগত জীবনের অনেক সাধারণ বিষয়ও কল্পলোকে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। পাঠকের মনে গোলবাহারের প্রেম ও সৌন্দর্য জ্ঞানের বিস্তয় বিমুগ্ধ উপস্থিতে এক বিশেষ মাদকতার সৃষ্টি করে। লেখক 'সত্য ঘটনাটা' অবলম্বন করে কল্পনার যে সৌধ নির্মাণ করেছেন, সেখানে তার সমকালীন সমাজ-চেতনাবোধের জাগরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শাস্ত্র-শাসিত মানব-সমাজ মনির গোলবাহারের অফুরন্ত উচ্ছাসে ভরা যেন এ এক অনিবার্য পরিণতি। মনির থেকে বিচ্ছিন্ন নির্বাসিতা গোলবাহারের সকরুণ আর্তি শাশ্বত মানব ট্রাজেডিরই অক্ষয় সংলাপ–

"মণির, আজ বোধ হয় চিরদিনের জন্য চলিলাম। আমার গভীর ভালবাসা মনে রাখিও। আমি আর তোমার নিকটে আসিতে পারিব না, কিন্তু দূরে দূরে আমার অস্তিত্ব অনুভব করিও। রাত্রির অন্ধকারে যখন তুমি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে, আকাশে তারাগুলি ফুলের মত ফুটিয়া থাকিবে, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার স্থির নয়ন দুটি ঐ তারকাগুলিরই মত বহুদূর হইতে তোমার পানে বেদনাভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া রজনী কাটাইয়া দিবে।

Dhaka University Institutional Repository

সান্ধ্য সমীরণে যখন তুমি পুলকিত হৃদয়ে ভ্রমণে বাহির হইবে, এ দাসী তখন বহুদুরে থাকিয়া ফুলে ফুলে, লতায় লতায়, পাতায় পাতায়, পাগলের ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া হৃদয়ের অসীম আবেগে ছুটিয়া বেড়াইবে। বসন্তের মলয় মারুত হিল্লোলে যখন জগৎ সংসার দুলিয়া উঠিবে, দিকে দিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়া যাইবে, কুসুমে কুসুমে লতায় লতায় পল্লবে পল্লবে আনন্দতরঙ্গ বহিয়া চলিবে, বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে নন্দনের অমিয় ধারার ন্যায় কল্যাণ আশীর্বাদ করিয়া পড়িবে, তখন এ দাসী কোহে কাফের অন্ধকার নিভৃত গভীর গহ্বরে মনের দুঃখে আত্মগোপন করিয়া প্রাণের অনন্ত সন্তাপে জ্বলিয়া সারা হইতে থাকিবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস. বৎসরের পর বৎসর কাল সাগরে মিশিয়া যাইবে; কিন্তু হায় আমার এ অনন্ত বেদনা আর থামিবে না, এ অসীম পিপাসা সপ্ত সমুদ্রের সমস্ত বারিপানেও নিবারিত হইবে না। ধীরে জগতের অন্তরালে জ্বলন্ত প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া কবে কোন নিস্তব্ধ নিশীথে আপনি আপনি নিবিয়া যাইবে, গভীর আধারে বিলান হইয়া যাইবে, কেহই তাহা জানিবে না। মনির, মনির মনে রাখিও আমি তোমারই; এ দাসী একান্ত তোমারই।

তোমার আমার জগতে আর মিলন হইবে না, আর পরস্পরে সাক্ষাৎ হইবে না। আমার নীরব জীবন তোমার   চিন্তায়-বিরহে শীঘ্রই নীরবে অবসান হইয়া যাইবে। তজ্জন্য ক্ষুণ্ন হইও না, আমার জন্য তোমার জীবন মাটি করিও না। জগতের এবং কূটিলতার ওপারে গিয়া আমরা আবার আপন হইব; সেখানে কেহই তোমাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। বিশ্বস্রষ্টা খোদাতালার চরণে মতি স্থির রাখিও। আমাদের ভালবাসা যদি প্রকৃত ও পবিত্র হয় তবে অবশ্যই সেই অনন্ত জগতে আমাদের পুনর্মিলন সাধিত হইবে।"[৪১]

এই গ্রন্থে ইংরেজি সাহিত্যের প্রমিথিউস চরিত্রের ছায়া লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পরীজাদী গুলবাহার

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে,'পরীজাদী গুলবাহার' শেখ হবিবর রহমানের আরো একটি বিখ্যাত প্রেমের গল্প। এই গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন শেখ হবিবর রহমানের আপন ছোট ভাই শেখ ফজলর রহমান। গ্রন্থটি যশোহর, বুনাগাতি থেকে ১৯১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

উক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এটি একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এর কাহিনী মূলত 'পরীর কাহিনী'র অনুরূপ। 'পরীর কাহিনী'র নায়িকা গুলবাহারের আরেকটি উপখ্যান নিয়ে এ-গ্রন্থের আখ্যান নির্মিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনে দাবী করা হয় 'এই পুস্তকের প্রত্যেক বিবরণই বর্ণে বর্ণে সত্য'।[৪২] গ্রন্থটির কপি পাওয়া গেলে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হতো।

জেন পরী

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'জেন পরী' শেখ হবিবর রহমানের রোমাঞ্চ ও ভৌতিক বিষয়ক প্রেমের গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থটি ২৬ জুলাই ১৯২৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় যশোহর থেকে। এই গ্রন্থটির প্রকাশকও ছিলেন শেখ ফজলর রহমান।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি সম্পর্কে আব্দুল মজিদ লিখেছেন, জনৈক মুসলমান বালকের সাথে একটি পরীর মধ্যে সাক্ষাতের ঘটনা অবলম্বনে কিশোর পাঠ্য এ-কাহিনীগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। এটি 'পরীর কাহিনী'র গোত্রভুক্ত। 'জেন পরী' সম্পর্কে গ্রাম-বাংলায় নানান বিশ্বাস, সংস্কার ও ঘটনাবলী প্রায়শ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জ্বীন-সম্প্রদায়ের কথা পবিত্র 'কোরআনে' উল্লেখিত হয়েছে। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও সংস্করাবদ্ধ আচার-নিষ্ঠ সমাজ ও জীবনে জ্বীন বিশেষ আকর্ষণ ও কৌতূহলের বিষয়।[৪৩] গ্রন্থটির কোন কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

হাসির গল্প

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'হাসির গল্প' শেখ হবিবর রহমানের ছোট ছোট কৌতুকধর্মী গল্প নিয়ে সাজানো গ্রন্থ। ১১৩ টি গল্প স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন মঈনদ্দীন হুমায়ন। ১২/১ সেরাং লেন, কলকাতা থেকে ১৯১৭ সালে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি পরবর্তীতে ৮টি সংস্করণ যথাক্রমে ১৯১৯, ১৯২২, ১৯২৫, ১৯২৯, ১৯৩৫, ১৯৩৯, ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি সম্পর্কে আব্দুল মজিদ লিখেছেন, নীতি-উপদেশপূর্ণ একশত তেরটি ছোট বড় গল্পের সমষ্টি 'হাসির গল্প'। সচিত্র এ-গল্পগুলো রচনার মধ্যে শিশুতোষ সাহিত্য-রচনায় শেখ হবিবর রহমানের পারদর্শিতা প্রকাশ পায়। শিক্ষাবিদ হিসেবে লেখক শিশু-কিশোরদের

Dhaka University Institutional Repository

মানসিক অভিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন এ-গ্রন্থের গল্পগুলো রচনায়। প্রতিটি গল্প সৎ-চিন্তা ও নীতি-কথায় পরিপূর্ণ। আবার সরলমতি শিশু কিশোরদের নির্মল আনন্দ প্রদানের প্রয়াসে সমৃদ্ধ। এ-গল্পগুলো সুবিখ্যাত ঈশপ-এর গল্পগুলোর আদলে বিবৃত হলেও এর মধ্যে বাংলাদেশী পরিবেশ-পরিস্থিতি, লৌকিকতা ও লোকচরিত্রের ব্যাপক প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিশু-কিশোর চরিত্র গঠনে তাদের মধ্যে দায়িত্ব সচেতনতা, কর্তব্যবোধ ও ভালোমন্দ জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগানোতে গল্পগুলোর ভূমিকা অবিসংবাদিত। দীর্ঘ দিনের মানব-চরিত্র ও জীবন-যাত্রা অধ্যায়নে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণিত বিষয় একই সাথে বয়স্ক পাঠকেরও মনোযোগ আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম। দীর্ঘদিন বাঙালির 'হাসির গল্প' নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‍্যাপিড রিডার হিসেবে মনোনীত ছিল।[৪৪] গ্রন্থটির কোন কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

গুলিস্তাঁর গল্প

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'গুলিস্তাঁ' শেখ হবিবর রহমানের অনুদিত বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' কাব্যের ৭৫ টি পরিচ্ছদ'কে গল্প আকারে বাংলায় অনুবাদ করে এ-গ্রন্থটিকে সাজানো হয়েছে। মূল বয়েতসমূহ প্রতিটি গল্পের সাথে বাংলায় উচ্চারণ ও অনুবাদসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মোট ৮টি অধ্যায়ে পৃথক পৃথক শিরোনামে গল্পসমুহ পরিবেশিত হয়েছে। আব্দুল মজিদ বইটি সম্পর্কে লিখেছেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

১. দিবাচা বা অবতরণিকা

২. প্রথম অধ্যায় : রাজচরিত্র

৩. দ্বিতীয় অধ্যায় : দরবেশ চরিত্র

৪. তৃতীয় অধ্যায় : কানায়াত বা সন্তোষ

৫. চতুর্থ অধ্যায় : নীরবতার উপকার

৬. পঞ্চম অধ্যায় : যৌবন ও ভালবাসা

৭. ষষ্ঠ অধ্যায় : বার্ধক্য

৮. সপ্তম অধ্যায় : শিক্ষার প্রভাব

৯. অষ্টম অধ্যায় : শেখ সাদীর তর্ক যুদ্ধ

১০. নবম অধ্যায় : নীতি ও শিষ্টাচার।

'গ্রন্থকারের দুটি কথা শিরোনামে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যররত্ন উল্লেখ করেছেন–

"পুস্তকখানি যতদূর সম্ভব সরল ও বালক-বালিকাগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। অনুবাদে সহজ সরল শব্দের ব্যবহার এবং বর্ণনাভঙ্গিতে শিশুতোষ আবহ বিনির্মানের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সে অর্থে গ্রন্থ সৃজনশীল মৌলিক সাহিত্যকর্মের পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে।" ৪৫

'বুস্তাঁর গল্প' শিরোনামে শেখ সাদীর বিখ্যাত একটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন শেখ হবিবর রহমান। গ্রন্থটি বর্তমানে দুস্প্রাপ্য। 'গুলিস্তাঁর গল্প' গ্রন্থের অনুরূপ এ-গ্রন্থখানির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। শেখ হবিবর রহমান রচিত 'আজও মনে পড়ে' শিরোনামে ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত হতো গল্পের অনুষ্ঠান। সাহিত্য-রস সমৃদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

বারোটি প্রাচীন-কাহিনী নিয়ে রচিত গল্পগুলো সে সময়ে প্রচারিত হয়েছিল। সংকলিত হয়ে এই কাহিনীগুলো গ্রন্থাকারে কখন কোথা হতে প্রকাশিত হ'য়েছে, তা বিস্তারিত জানা যায়নি।

'মজার গল্প' শেখ হবিবর রহমানের আরো একটি অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। 'হাসির গল্পে'র ধরণে লিখিত এই গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে নীতি-উপদেশপূর্ণ প্রায় শতাধিক হাসির গল্প।[৪৬] গ্রন্থগুলো খুঁজে না পাওয়ায় বিস্তারিত লেখা সম্ভব হলনা।

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমণকাহিনী

শেখ হবিবর রহমানের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম ব্যতিক্রমী সাহিত্য হল 'সুন্দর বনের ভ্রমণ কাহিনী'। গ্রন্থটির ভূমিকাতে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি বাক্যে সমগ্র বইটির মাধুর্যকে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন–

"এইরূপ বই দেশকে জানিতে সাহায্য করে এবং এইরূপ সং সাহিত্যের দারা সমগ্র দেশবাসির সেবা হয়।"[৪৭]

সাধারণের কাছে সুন্দরবন রহস্যঘেরা, অজনা পুরী, তাকে তিনটি পরিচ্ছেদে অত্যন্ত কাব্যিক অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ধরনের গ্রন্থে বস্তুগত ঘটনার চাক্ষুষ বর্ণনাকেই প্রধান্য দেয়া হয়, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে শেখ সাহেবের কবি মন প্রধান্য লাভ করেছে। এতদসত্ত্বে একথা স্বীকার করতে হয় যে, 'সুন্দর বনের ভ্রমণ কাহিনী' সুন্দর বনের উপর প্রথম একক গ্রন্থ। যার মধ্যে বর্ণিত হয় সুন্দর বনের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, জীব-জগৎ ও বৃক্ষ জগতের পরিচিতি। পরবর্তীকালে সুন্দরবন নিয়ে রচিত অন্যান্য গ্রন্থের পথিকৃৎ শেখ হবিবর রহমানের এ-গ্রন্থখানি-তা অবশ্যই স্বীকার্য।

ভ্রমণ বিষয়ক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন তাঁর ভাই মৌলভী শেখ ফজলর রহমান। 'পুলুম আঞ্জুমান' সংগঠন থেকে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১লা ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে। শেখ ফজলর রহমান এই সংগঠনের তখন অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি ছিলেন।

১৯৫৫ সালে ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে 'বিজ্ঞাপনে' বলা হয়–

'সুন্দরবনের গুরুগম্ভীর দৃশ্য এই পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে পাঠকের মানস আকাশে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। ইহার ভাষা, লালিত্যে ও মাধুর্যে অতুলনীয়। বহু বছর পর্যন্ত এর এক অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন রূপে সমগ্র বাঙ্গালার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অবশ্য পাঠ্য ছিল।' [৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ সংস্করণে শিল্পী কাজী আবুল কাশেমের স্কেচ ও তৈলচিত্র মিলিয়ে মোট ১৬টি চিত্র বইয়ে শোভিত হয়। তখন বইটির কলেবর বৃদ্ধি পায় ১৬ পৃষ্ঠায়। গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ লেখক উল্লেখ করেন–

> *"আবহমান কাল হইতে মৃগয়া বড়লোকদের অন্যতম ব্যসন বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সুন্দরবনে হরিণ শিকার রাজামহারাজাদের বিলাসব্যসন বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারে না। এত বিপদ এবং কষ্ট মাথায় করিয়া এই বনে কোন সৌখিন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে চাহেন না। সাধারণত দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজের ভদ্রলোকগণই সুন্দরবনে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে যাইয়া থাকেন; অনেক দরিদ্র মজুর শ্রেণীর লোকও পারিশ্রমিক না লইয়া শুধু সখের জন্য শত বিপদ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়া ইহাদের সহগামী হয়। সুন্দরবনে হরিণ শিকারের নামে ইহারা যেন মাতিয়া উঠে। ইহাতে তাহাদের একঘেয়ে জীবনে একটা নূতনত্বের মোহ জাগ্রত হয়। আমি যে শিকার অভিযানের সহগামী হইয়াছিলাম, তাহাও এই উভয় শ্রেণীর লোকদ্বারা গঠিত। দক্ষিণবঙ্গের এই শিকারিগণের পরিচয় দেশের লোক জানে না; ইহাদের বিপৎসঙ্কুল দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্যসমূহের কোন ছাপ আমাদের জাতীয় সাহিত্যে কখনই পড়ে নাই ; ইহা দেশের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।"*[৪৯]

গ্রন্থখানির 'ভূমিকায় ভাষাচার্য ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন–

> *"শ্রীযুক্ত মৌলবী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের লিখিত 'সুন্দরবনে ভ্রমণ কাহিনী' বইখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। মৌলবী সাহেব সুসাহিত্যিক। কবিতা, কাব্যগ্রন্থ, ছোট গল্প, উপন্যাস, শিশুপাঠ্য, ইতিহাস, জীবনী, অনুবাদ ও ভ্রমণ-কাহিনী- এতগুলি বিষয়ে তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; এইসব বিষয় সুন্দর ও সরল রচনা দ্বারা তিনি মাতৃভাষার ভান্ডার সমৃদ্ধ করিতে সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন।*
>
> *মৌলবী সাহেব যে কেবল কাব্যামোদী এবং কাব্যরসের পরিবেশক, তাহা নহে; তিনি স্বয়ং একজন কবি। দেখিবার চোখ এবং বলিবার ভাষা দুই-ই তাহার আছে। তাই একদিকে যেমন ফারসী-সাহিত্যের সযত্ন পালিত পুষ্পোদ্যানের গোলাপ ও জুঁইয়ের স্তবক এবং বুলবুলের গান তাহাদের সকল রমণীয়তা লইয়া তাহাকে মুগ্ধ করে, তেমনি অন্যদিকে*

Dhaka University Institutional Repository

আবার বাঙ্গালাদেশের অনাদিকালের অরণ্য দ্বারা আবৃত সুন্দরবনের মধুর-ভীষণ সৌন্দর্যও তাহাকে আকৃষ্ট করে। প্রস্তুত পুস্তকখানিতে মৌলবী সাহেব সুন্দরবনের চিত্র তাঁহার স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ভাষার তুলিকাপাতে আমাদের সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে; কারণ গুণজ্ঞ ও সাহিত্য-রসিক তথা দেশ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট মৌলবী সাহেবের ভ্রমণ-কাহিনী আমাদের স্বল্পপরিচিত একটি জগতের খবর দিবে। আমরা আমাদের দেশকে জানিবার জন্য চেষ্টা করি না; দেশের মধ্যে, ঘরের পাশেই যে কত দেখিবার ও জানিবার আছে, সে বিষয়ে আমাদের খেয়াল নাই, আমরা ছুটিয়া থাকি আফ্রিকার অরণ্যে, মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে এবং সুমেরু কুমেরুর বরফে ঢাকা প্রান্তরে পশুপক্ষীর জীবনের এবং মানুষের সাহস ও নির্ভীকতার কাহিনী শুনিতে; অথচ আমাদের সম্বন্ধে কবি যে গাহিয়া গিয়াছেন–

ব্যাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি–

সেই বাঘের শেষ আশ্রয় স্থল, বিপদ ও রোমান্স-এর রঙ্গভূমি, প্রকৃতির অদ্ভুত লীলানিকেতন সুন্দরবন সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও নাই, কৌতূহল-নিবৃত্তির উপায়ও নাই। এইরূপ অবস্থায় শেখ হবিবর রহমান সাহেবের এই উপাদেয় পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহার দ্বারা তাহার মাতৃভূমি সম্বন্ধে বাঙ্গালীর যে জানিবার ইচ্ছা নাই, এই অপবাদ কথঞ্চিৎ দুরীভূত হইবে।

''সুন্দরবনে ভ্রমণ কাহিনী'' সুন্দরবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের সব খবর দিবার উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত হয় নাই– নহিলে সুন্দরবনে সগ-মৎস্য-জীবীদের সম্বন্ধেও অন্য নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বহু তথ্য আমরা জানিতে পারিতাম। বইখানি গ্রন্থকারের প্রত্যাক্ষদর্শনের ও সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আলেখ্য ও আখ্যানের মালা মাত্র। বর্ণনার সরসতায় ইহা চিত্তাকর্ষক হইবে।

এইরূপ বই দেশকে জানিতে সাহায্য করে এবং এইরূপ সৎসাহিত্য দ্বারা সমগ্র দেশবাসীর সেবা হয়। মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া মৌলবী সাহেব হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বঙ্গভূমি জাতির সেবা করিতেছেন– তাহার এই চেষ্টা সাহিত্যবোধযুক্ত সকলেরই অনুকরণীয়, সকলেরই নিকট সাধুবাদ পাইবার যোগ্য।''[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

বইটিতে মোট ৩টি পরিচ্ছেদ– ১। সুন্দরবনে দুইদিন

২। সুন্দরবনে হরিণ শিকার এবং

৩। সুন্দরবনে নানা কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ বর্ণিত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন উপলক্ষে সুন্দরবনে ভ্রমণের কথা। এখানে সুন্দরবনে যাত্রা পথের বিবরণই বেশি। সুন্দরবনে মৎস্য শিকার এবং বনের দেব দেবী ও পীরগণের পরিচয় তুলে ধরা হলেও সুন্দরবনের চাক্ষুষ বিবরণ এখানে কম। বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যিক, যেমন–

"মাঝি তাহার নৌকা লইয়া বাহিরে পরিষ্কার স্থানে বসিয়া রহিল। আমরা সকলে সেই দ্বিতীয় নৌকায় উঠিয়া যে স্থান দিয়া নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকিতে লাগিলাম তাঁহার নাম আঁধার মানিক। আধার মানিক! বাস্তবিকই নামটি বড় সুন্দর, কবিত্বময়। যে এই খালটির নাম আঁধার মানিক রাখিয়াছে, তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করি। চারিদিকে বনের নিবিড়তায় যেন অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুকের মাঝখানে দিয়া যেন খালটি মানিকের মত হাসিতেছে। আমরা আঁধার মানিক বাহিয়া প্রায় কুড়ি মিনিট পর্যন্ত পূর্বদিকে চলিলাম; খালটি অধিক প্রশস্ত নহে। আমাদের দুই পার্শ্বে নিবিড় সুন্দরবন। সুন্দরী, পশর, গেউয়া, বান খলসি, ধোতল, গরান, কেওড়া, গোল, হেতাল, জানা, নাট্‌মে, সিঙ্গেড়, গড়ে, ধলই, গর্জন, অর্জুন, ঢালচাকা, কির্‌পে ইত্যাদি নানাজাতীয় বৃক্ষ চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বৃক্ষগুলি এত নিবিড় সন্নিবিষ্ট যে, বনের মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নহে। স্থানে স্থানে বন কাটিয়া ভিতরে ঢুকিবার পথ করা হইয়াছে। বৃক্ষগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট হইলেও সুন্দরবনের ভূপৃষ্ঠ বেশ পরিষ্কার, বেশ ঝরঝরে; কোনও স্থান অনধিগম্য নহে। বৃক্ষসমূহের ফাঁক দিয়া বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। অনেক গ্রামের মধ্যে যেমন নিবিড় জঙ্গল দেখা যায়, সুন্দরবনের কোথাও সেরূপ দেখিলাম না। জঙ্গল হইলেও বেশ ভদ্র রকমের–যেন প্রকৃতির সাধের সুন্দর বাগিচা। সুন্দরবন নামটি সম্পূর্ণ সার্থক; ইহার সবই কেমন সুন্দর মনোহর; এমন

Dhaka University Institutional Repository

*কি, ইহার যে বাঘের ভয়ে আমরা কম্পমান তাহারও অসাধারণ সৌন্দর্য দর্শনে আমাদের হৃদয় মন মুগ্ধ হয়।"*৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে হরিণ শিকারি দলের সাথে ৭/৮ দিন সুন্দরবনে ভ্রমণের রোমাঞ্চকর কাহিনী। সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া, দুবলার চরে অবতরণ, নীল কমলের মোহনা পাড়ি দেয়া, বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ, হরিণ শিকারের বিভিন্ন ব্যর্থ প্রয়াস, বাঘের ভয় ইত্যাদি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আলোকে সমৃদ্ধ ভাষাশৈলীতে বর্ণিত করেছেন শেখ হবিবর রহমান। তিনি সমুদ্রে সূর্যাস্তের দৃশ্য বর্ণনা লিখেছেন–

"আমরা সকলে বড় বড় লাঠিহস্তে সূর্যাস্ত দেখিবার জন্য সেই সমুদ্রতীরে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উন্মুখনেত্রে দণ্ডায়মান; কেহ কেহ পিছনে ফিরিয়া সতর্ক প্রহরীর ন্যায় বাঘ আসে কি না তাহা দেখিতে ছিল। মুখে যাহাই বলি না কেন, জীবনের মমতা আমাদের কাহারও কম ছিল না; বিশেষতঃ জীবিত অবস্থায় বাঘে তাহার বড় বড় দাঁত দিয়া এই তাজা শরীরটাকে কামড়াইয়া কামড়াইয়া ছিড়িয়া খাইবে ইহা কল্পনা করাও অসহ্য। সুতরাং আমরাও এক একবার ব্যাঘ্র-মহারাজের শুভাগমন সম্ভাবনায় ভয়কণ্টকিত হইতেছিলাম। এমন দোটানা অবস্থায় প্রশান্তভাবে সৌন্দর্যের উপভোগ সম্ভবপর নহে। সত্য কথা বলিতে কি, তখন বাঘের কল্পনাই আমাদের মনে সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

চন্দ্রে যেমন গ্রহণ লাগে ঠিক সেইভাবে সহসা সূর্যের নিম্নপার্শ্ব যেন সাগরজলে আবৃত হইয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে ইহা নিম্নে সলিলের অন্তরালে একটু একটু করিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। সেই কনক-প্রতিমা কে যেন নির্দয়ভাবে অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়া জগতের সমস্ত পদার্থের নশ্বরতা নীরবকণ্ঠে বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘোষণা করিতে লাগিল। আমি তখন স্থির ধীর ভাবে পৃথিবীর স্থলভাগের এক প্রান্তসীমা – সেই বঙ্গোপসাগরের তীরের একটি উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান। পশ্চাতে মুক্তপ্রান্তর ও বহুদূর প্রসারিত সুন্দরবন; সম্মুখে অনন্ত সাগর; আকাশে সুদূর পশ্চিম প্রান্তে যেন দিগন্তবিস্তারিত আগুনের খেলা। হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া মুক্ত বিশ্বের এই নগ্ন সৌন্দর্য প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিলাম। এই বিশাল সৌন্দর্য, প্রকৃতির এই অনন্ত মাধুর্য প্রাণের কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া লইলাম। যে

Dhaka University Institutional Repository

*অনন্ত সম্পদ, যে স্বর্গীয় বৈভব আজ এইখানে এই মুহূর্তে লাভ করিলাম দুনিয়ায় তাহার তুলনা নাই। চিরদিন তাহা আমার হৃদয় সঞ্জীবিত রাখিবে। মন নূতন নূতন মাধুরীতে পূর্ণ করিয়া রাখিবে।"*৫২

তৃতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণনা সূচিতে রয়েছে সুন্দরবনের বিশেষত্ব, সুন্দর বনের নদী, জীবজন্তু, উৎপন্ন দ্রব্য, সুন্দরবনের শাসন, গভর্ণমেন্টের ব্যাঘ্র-নীতি, ব্যাঘ্র শিকার, বেআইনী শিকার, সুন্দরবনের প্রত্নতত্ত্ব, সুন্দরবনের ঐতিহাসিক বিবরণ, সুন্দরবনের উপকার ও সুন্দরবনের বিপদ।

একথা সত্য যে, সুন্দরবনের ওপর বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম একক গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। এ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে প্রকাশিত শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে সুন্দরবনের কিছু তথ্যগত বিবৃতি ছিলো মাত্র। সতীশমিত্রের দ্বারাই শেখ হবিবর রহমান এ-গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং পরবর্তীকালে এ.এফ.এম আবদুল জলিলের [১৯৬১-১৯৭৮] সুবিখ্যাত 'সুন্দরবনের ইতিহাস' (১৯৬৮) রচনার প্রেরণা 'সুন্দর বনের ভ্রমণ কাহিনী' পাঠ বলে অনেকে মনে করেন।৫৩

Dhaka University Institutional Repository

জীবনী সাহিত্য

ভারত সম্রাট বাবর

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'ভারত সম্রাট বাবর' শেখ হবিবর রহমানের কিশোর পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক, কবির ছোট ভাই শেখ ফজলর রহমান। গ্রন্থটি ১৯১৯ সালে আলমগীর লাইব্রেরী, ঘোষগাতি, বুনাগাতি যশোহর (বর্তমান মাগুরা) থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে।

গ্রন্থটি সম্পর্কে আব্দুল মজিদ লিখেছেন যে, ইতিহাসের আলোকে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ভারতবর্ষের মোগল-সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের জীবন ও কর্মকাণ্ডের আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে এ-গ্রন্থে। গ্রন্থে অধ্যাবসায় মানুষকে কীভাবে মহিয়ান ও গরীয়ান করে তোলে; শত সহস্র বাঁধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে কিভাবে জীবন উন্নত হয়, তাই ফুটে উঠেছে বাবরের 'উদ্যমশীলতা ও অধ্যবসায়' শীর্ষক অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে–

> *"বাবর অদৃষ্টবাদী হইলেও আমাদের অনেকের ন্যায় কর্মহীন নিরুদ্যম ছিলেন না। বরং উদ্দমশীলতাই তাহার চরিত্রের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। জগতের ইতিহাসে তাহার ন্যায় অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তিনি বহুবার ভগ্নমনোরথ হইয়াছিলেন, বহুবার সৌভাগ্যের উচ্চগণ হইতে দুর্গতির নিম্নতম গভীর কূপে নিপতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি ভগ্নোৎসাহ হন নাই। ঈশ্বর নির্ভরতা হারান নাই।"*৫৪

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটির কোন কপি খুজে পাওয়া যায়নি, তাই বিস্তারিত লেখা সম্ভব হয়নি।

ছেলেদের হজরত মুসা

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'ছেলেদের হযরত মূসা' শেখ হবিবর রহমানের কিশোরপাঠ্য নবীজীবনী। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন এ আহমদ। দি গ্রেট ইস্টার্ন লাইব্রেরী কলকাতা থেকে ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি সম্পর্কে আব্দুল মজিদ লিখেছেন, হজরত মুসা (আঃ)-এর জীবনের প্রধান প্রাচীন ঘটনা কোরআন শরীফের এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্বস্ত তফসিরের আলোকে এ-ক্ষুদ্র গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থে শেখ হবিবর রহমান হযরত মুসার জন্ম-কৈশোর ও যৌবন বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষত গ্রন্থে হযরত মুসা (আঃ)-এর নুবয়ত প্রাপ্তি ও তার কর্মময় জীবনের নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। 'নিবেদন' এ উল্লেখ করা হয়েছে–

> *"জগতের সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই নবী বা মানবকে কর্ত্তব্য পথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সুরা নহলের ৩১ সংখ্যক আয়াতে এ কথা অতি পরিস্কারভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মুসলমানগণ তাহাদের সকলকেই সমানভাবে শ্রদ্ধা করিতে খোদা-কর্ত্তৃক অদিষ্ট হইয়াছেন (সুরা এমরান ৮৪ আয়াত)। এই সমস্ত নবীগণের অধিকাংশেরই নাম বা বিবরণ কোরান শরীফে প্রদত্ত হয় নাই। আরব, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি দেশের যে সমস্ত নবী যে অঞ্চলের অধিবাসীদিগের পরিচিত ছিলেন শুধু তাহাদের বিষয়ই কোরান শরীফে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত নবীর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম এবং তাহাদের ওম্মত বা*

Dhaka University Institutional Repository

অনুস্তরণকারিগণ সকলেই মুসলমান ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্বশেষ প্রেরিত বিশ্বনবী।

কোরান শরীফে হজরত মুসা (আঃ) এর বিবরণ বিভিন্নস্থানে অতিবিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহুদী ও খৃষ্টান-ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি মোজেজ নামে অভিহিত। তাহার জীবনের শিক্ষা সমস্ত যুগের সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্মজীবনের লাভের পক্ষে উপযোগী। শুধু মোসলেম জগতে নহে, সমগ্র প্রতীচ্য জগতেও তিনি বহু সহস্র বৎসর কাল অশেষ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন। এদেশের সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ যাহাতে তাহার জীবনের ঘটনার সহিত পরিচিত হইতে পারে, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।"[৫৫]

গ্রন্থটির কোন কপি খুজে পাওয়া যায়নি, তাই বিস্তারিত লেখা সম্ভব হয়নি।

কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা

'কর্মবীর মুন্সি মেহেরুল্লাহ' শেখ হবিবর রহমানের একটি বিখ্যাত জীবনালেখ্য। শেখ হবিবর রহমান ছোটবেলায় এই মহামনিষিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তার সংস্পর্শে এসেছেন। মুন্শী সাহেব তার কবির মূল্যায়ন করে তাকে শিশু-কবি উপাধিও দিয়েছেন। মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ছিলেন বাংলায় মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত। তিনি সুবক্তা ও সুপুরুষ ছিলেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন। এই মহা মনীষীর মৃত্যুতে শেখ হবিবর রহমান খুবই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তার স্তৃতি অম্লান করে রাখার জন্য তার নামানুসারে শেখ হবিবর রহমান 'মেহেরুল এসলাম সভা' নামে একটি সাহিত্য-সংঘটন প্রতিষ্ঠা করেন। তারও দীর্ঘদিন পর শেখ হবিবর রহমান তাঁর জীবন ও আদর্শের কথা জনমনে বপন করার জন্য রচনা করেন জীবনীগ্রন্থ 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা'। গ্রন্থটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশে দায়িত্ব নেন মৌলবী মোহাম্মদ মোবারক আলী। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা থেকে ১৯৩৪ সালের ২৪ এপ্রিল।

বাংলার অদ্বিতীয় বক্তা, অদ্বিতীয় সমাজ-সংস্কারক, বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজের জাগরণের অগ্রদূত মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ [১৮৬১-১৯০৭] লেখক জীবন ও কর্মের নানাদিক নিয়ে শেখ হবিবর রহমান এ-গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ শেখ হবিবর রহমান উল্লেখ করেছেন–

> *"আমি ব্যক্তিগতভাবে মুনশী সাহেবের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমরা একই জেলার অধিবাসী। সুতরাং তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য পালনস্বরূপ পবিত্র দায়িত্বের একটি বিরাট অংশ আমার উপরে ন্যস্ত আছে, সন্দেহ নাই। আমার ক্ষুদ্র পক্তিতে আমি এই কর্ত্তব্য পালনে বরাবরই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু তাহা দ্বারা কোনই কার্য্য হইতে পারে নাই। মুনশী সাহেবের পরলোক গমনের সময় আমি স্কুলের ছাত্র ছিলাম। বিশেষতঃ তাহার সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা অর্জনের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তাঁহার পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে 'মেহের বিলাপ' নামক একখানি শোকাচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা পুস্তক আমি লিখিয়া ছিলাম। উহা ছাপিতে হয়ত ৩০/৪০ টাকার অধিক লাগিত না। কিন্তু ঐ টাকার অভাবে পুস্তকখানি প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। যশোহর জিলা-স্কুলে পড়িবার সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া তাঁহার নামানুসারে "মেহেরুল ইসলাম সভা" নামক একটি বক্তৃতা-সমিতি কিছুদিন পরিচালিত করিয়াছিলাম। তাহার পর অপেক্ষা কত পরিণত বয়সে ছাতিয়ান তলায় গিয়া তাঁহার জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহে সচেষ্ট হই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশেষ কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। যখন "যশোহর খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য-সমিতি" আমাদের পরিচালনাধীনে ছিল, তখন আমরা উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া ১৯২০ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে ছাতিয়ান তলায় মুনশী সাহেবের স্মৃতিসভা করিয়াছিলাম। উক্ত সভায় বহু উপযুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

*ব্যাক্তি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী ভাবে কিছুই করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।"*৫৬

গ্রন্থে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর বাল্যজীবন, তাঁর জীবন-সাধনা এবং খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক মিশনারিদের সাথে তর্কযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা 'য়েছে। পাদ্রি জন জমিরুদ্দীন মুনশী সাহেবের যুক্তিতর্কানুমোদিত বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মিশনারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুক্তি-বক্তৃতার সংগ্রামে তাঁর সহযোগী হন। 'পিরোজপুরে তর্ক সংগ্রাম' এবং 'বক্তা মোহাম্মদ মেহেরুল্লা' পরিচ্ছদ দুটিতে মুনশী সাহেবের বাগ্মীতার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

এ-গ্রন্থে শেখ হবিবর রহমান মুনশী মেহেরুল্লাহর সৃজনশীল মৌলিক কর্মকাণ্ডের আরেকটি দিকের কথা তুলে ধরেছেন। বাংলা গজলে মুনশী সাহেবের অবদান ছিল পথিকৃতের। 'নানা কথা' প্রবন্ধে শেখ হবিবর রহমান মুনশী মেহেরুল্লার সমাজ ও শিক্ষাদর্শনের বর্ণনা দিতে লিখেছেন–

*"[তিনি] সমাজোন্নতিকর সমস্ত কার্য্যে সদা আগুয়ান থাকিতেন। ১৩১০ সালে রাজশাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। জাতীয় উন্নতির জন্য শিক্ষাই যে সর্বপ্রথম আবশ্যক, তা মরহুম খুব ভালভাবেই জানিতেনে। তাই তিনি প্রায় প্রত্যেক সভাতেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া জন-সাধারণকে শিক্ষাপথে উদ্বুদ্ধ করিতেন। এই কর্মযোগী শুধু বাক্য দ্বারা নহে নিজে বাঙ্গালার সর্বত্র বহু স্কুল মাদ্রাসা স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"*৫৭

বইটির শিরোনামে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন শেখ ফজলল করিম। তিনি তাঁর বক্তব্যে মুনশী মেহেরুল্লার সমাজহিতৈষণা, বাগ্মিতা, সাহচর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের স্মৃতিচারণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। উপসংহারে মুনশী সাহেব সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার জন্য শেখ হবিবর রহমানকে সাধুবাদ জানিয়ে শেখ ফজলল করিম উল্লেখ করেন–

> *"কাল চলিয়া যাইতেছে,--যাইবে। কিন্তু গুণীর গুণগৌরব কালজয়ী হইয়া থাকিবেই; সে স্তৃতি চির অমলিন। মুন্‌শী সাহেব সম্বন্ধেও এ কথা বেশ খাটে। আমরা তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছিলাম; কন্তি তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত মৌলভী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সাহেব জগতের সম্মুখে তাঁহার স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। যোগ্য ব্যক্তিই এ কাজের ভার লইয়াছেন। তিনি অল্পকথায় মুন্‌শী সাহেবের কর্ম্মবহুল জীবনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র আাঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বাসনা ফলবতী হউক এবং বাঙলার ঘরে ঘরে ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লার জীবন-কথা সযত্নে লোকে পাঠ করুক, ইহাই আমি প্রার্থনা করি।*
>
> *কারুণের সাথে ধনরাশি তার পাইয়াছে চিরলয়।*
> *ন্যায়পরায়ণ নৌশেরোঁয়ার আজো গাহে লোকে জয়।।"*

সৎকর্ম্মশীল মুন্‌শী সাহেবও অমর হইয়া থাকিবেন।[৫৮]

গ্রন্থটিতে মুন্সি মেহেরুল্লাহর জীবনাদর্শ ও সমাজসেবার নানাদিক ফুটে উঠেছে। লেখক মুন্সি মেহেরুল্লাহর স্নেহধন্য ছিলেন, তাঁর ওয়াজ শুনেছেন এবং সমাজ সেবায় তাঁর অবদান দেখেছেন। প্রেম ও শ্রদ্ধা থেকেই এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মেহেরুল্লাহর জীবনাদর্শ জেনে সমাজের সকলে যেমন উপকৃত হবে এবং ভবিষৎ-এ যদি কেউ তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ নিয়ে কাজ করতে চায়, তবে গ্রন্থটি যে কোন গবেষককে সহায়তা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

জিন্দাপীর আলমগীর

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'জিন্দাপীর আলমগীর' নামক সম্রাট আলমগীরের চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন শেখ হবিবর রহমান। গ্রন্থটি শেখ হবিবর রহমানের 'আলমগীর' উপন্যাসের অনুকরণে রচিত হলেও এটি একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। এতে আলমগীরের মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের সাথে সংগ্রামের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি শেখ হবিবর রহমান জীবিতাবস্থায় প্রকাশ করে যেতে পারেননি। তার মৃত্যুর পর আজো গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি। তবে দুঃখের বিষয় পাণ্ডুলিপিটি খুজে পাওয়া যায়নি।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ-সাহিত্য

শেখ হবিবর রহমানের প্রবন্ধগুলো বিশেষ করে যশোর সিদ্দিকিয়া সাহিত্য-সমিতি'র সাহিত্য-আসরে পাঠের জন্য রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধ-সমূহের মধ্যে প্রথম-দিকের একটি চেতনা উল্লেখযোগ্য, যার মূল ভিত্তি ইসলামের সুদৃঢ় চেতনা, ইসলামের আদর্শের উপর প্রবন্ধগুলো রচিত হলেও সকল ধর্মাবলম্বীতার জন্য ছিল সমানভাবে গ্রহণীয়। কিন্তু তাঁর তরুণ বয়সের রচনার চেয়ে পরিণত বয়সে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম, ধর্মবিদ্বেষ ও ইসলামনীতি যুক্ত বিশ্লেষণ এবং একটি সুমিত চিন্তা-চেতনার প্রকাশে পরিপূর্ণ। শেখ হবিবর রহমানের যথার্থ ও সার্থক রচনা 'আমার সাহিত্য জীবন'। উক্ত গ্রন্থে কবি নির্লিপ্ত এবং নির্মোহভাবে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কথাই বলেছেন। তার উত্থান-পতন, বাধা-বিপত্তি, অনগ্রসরতা-পশ্চাদপদতার কথা। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কিন্তু কবি এ-গ্রন্থ রচনার পরও দীর্ঘ সময় সাহিত্য চর্চা করেছেন, তাই গ্রন্থটি অসম্পূর্ণই বলা যেতে পারে। এবার কবি শেখ হবিবর রহমানের গ্রন্থসমূহের উপর আলোকপাত করা হবে।

চেতনা

চেতনা' শেখ হবিবর রহমানের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ-সংকলন। এই গ্রন্থের প্রকাশক শেখ ফজলর রহমান। গ্রন্থটি 'যশোহর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতি' থেকে ১৯১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ ১৯২৯ সালের ১০ই মে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক মোহাম্মদ মোবারক আলী। দু'টি সংস্করণই মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। 'অনন্তের আহ্বান', 'সত্য ও সাধনা', 'ব্যর্থজীবন' এবং 'মানব শক্তি ও তাহার ব্যবহার' শীর্ষক চারটি প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থটি। গ্রন্থের নিবেদনে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন উল্লেখ করেছেন–

"যশোহর খুলনা সিদ্দিকীয়া সাহিত্য সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে চেতনার প্রথম তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। 'মানব শক্তি ও তাহার ব্যবহার' নামক প্রবন্ধ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এক সভায় পঠিত ও সাহিত্যিক নামক মাসিক পত্রিকায় [১ম বর্ষ ঃ ১ম ও ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩৩] প্রকাশিত হইয়াছিল।"[৬০]

'চেতনা' গ্রন্থ প্রকাশের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়–

> *"মানুষের অনন্তকালস্থায়ী অচিন্তনীয় জীবনের তুলনায় আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান জীবন একরূপ স্বপ্নের মত; অনন্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানবের কর্তব্যের ইঙ্গিত ও নির্দেশ পাইবেন চেতনার [চারটি] প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধগুলি ইসলামিক ভিত্তির উপরেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অথচ সকল ধর্মাবলম্বীরই সমানভাবে গ্রহণীয়।"*[৬১]

প্রবন্ধগুলো যখন লিখিত হয় [১৯১১-১৪], তখন শেখ হবিবর রহমানের বয়স ২০-২৫-এর মধ্যে। তারুণ্যে ভরা যুবক শেখ হবিবর রহমান তখন কাব্যলক্ষীর একান্ত করায়ত্তে। সাহিত্য-সভায় পড়ার জন্য প্রবন্ধগুলো লিখিত হয়েছিল। 'যশোর খুলনা সিদ্দিকীয়া সাহিত্য-সমিতি'র অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সাহিত্যর সৃষ্টি ও সদস্যদের মধ্যে সাহিত্য চর্চার স্ফূর্ত সম্পাদন। এর অধিকাংশ সদস্যদেরই পূর্বে প্রধানত পদ্য লেখার অভিজ্ঞতা ছিল। সমিতিতে সবার জন্য গদ্য/প্রবন্ধ রচনা বাধ্যতামূলক করা হয়। সে কারণে

Dhaka University Institutional Repository

'চেতনার' প্রবন্ধগুলোর মধ্যে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, কাব্যিক ভাব-সম্পদের সমাহার এবং শাসিত গদ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু এরমধ্যে ও প্রবন্ধকারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার ছাপ স্পষ্ট। প্রথম প্রবন্ধ 'অনন্তের আহবান' শুরু হ'য়েছে এভাবে–

> *"উর্দ্ধে অনন্ত নীল গগণ অনন্ত দেহ প্রসারিত করিয়া স্থির ধীর গম্ভীরভাবে বিরাজমান। সাড়া নাই, শব্দ নাই, চঞ্চলতার চিহ্ন মাত্র নাই; যেন কি এক গভীর যোগে, গভীর সাধনায় সমাসীন। অনন্ত নক্ষত্র রাজী কি এক মহোৎসবে অনন্ত বক্ষে হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের সে মধুর হাসির মধুর প্রতিচ্ছবিতে দিগদিগন্ত নীরব অমিয় প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে! অনন্তের কি এক গভীর রহস্যে চারিদিক ভাবময় হইয়া উঠিয়াছে, আর আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম মানবজাতি নিম্নে অতি নিম্নে আপনভাবে বিভোর হইয়া থাকি।"*[৬২]

'চেতনা' প্রবন্ধ গ্রন্থটি চারটি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। চারটি প্রবন্ধ চার রকমের বিষয়বস্তু নিয়ে রচনা করেছেন লেখক। চারটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখেই লেখক প্রবন্ধের যথার্থ নামকরণ করেছেন।

শয়তানের সভা

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'শয়তানের সভা' শেখ হবিবর রহমানের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সচিত্র ব্যঙ্গ-রসাত্নক গদ্যরচনা। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন শেখ ফজলর রহমান। গ্রন্থটি বুনাগাতি, যশোহর হতে ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৯৫৩ সালে।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল মজিদ গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন, 'শয়তানের সভা' শেখ হবিবর রহমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ প্রবন্ধ। মানুষরূপী শয়তান আজ গ্রাম-গঞ্জ-দেশ-দেশান্তরে যেভাবে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে, মিথ্যা ও অসভ্যতার দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, লেখক তারই বিশদ আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। এমন এক যুগ আসছে, শয়তানগুলো একত্রে বসে মিথ্যার বেসাত করছে আর সমাজ-সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য তারা যে সভা করছে, মিটিং করছে, তাই তিনি তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে। বিজ্ঞাপনে এ-বইটি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়-

> *"বর্তমান যুগে সে সমস্ত শয়তান সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে ছাইয়া আছে তাহাদের সম্যক পরিচয় এই পুস্তকে পাইবেন। ইহা ব্যঙ্গ-রসপূর্ণ একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। এই পুস্তকে শয়তান সম্রাট ইব্লিসের স্বরূপ দেখিয়া বিস্ময় কণ্টকিত হইবেন।"* [৬৩]

আধুনিক রস-রচনা 'শয়তানের সভা'। শয়তান সম্রাট ইবলিশ, শয়তানদের বিশাল-মাহফিলে যে বক্তৃতা দেন, তার কিয়দংশ নিম্নরূপ-

> *'মানুষগুলোকে শয়তানী বিদ্যায় এমনভাবে তালিম দিতে হবে যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের দফাটা শেষ করতে পারে। তোমরা প্রয়োজনমত অলক্ষ্যে থেকে তাদের পরিচালনা করবে। চুরি, জোয়াচুরী, ঘুষখোরী, চোরাকারবারী, ধাপ্পাবাজী ও অন্যান্য বদমায়েসী কৌশলগুলি তাদের শিক্ষা দেবে।*
>
> *সকল দিক দিয়েই পৃথিবীতে আমাদের বিজয় সূচিত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নাই। আমাদের নীতিগুলি ধীরে ধীরে প্রায় সমুদয় মানব গ্রহণ করছে। খোদা চেয়েছিলেন মানুষের ভাল করতে, আমরা তার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবই।"* [৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ কুদরাত-ই-খোদা 'শয়তানের সভা' পাঠ করে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ১৮ জানুয়ারি ১৯৫৪ তারিখে শেখ হবিবর রহমানকে যে পত্র লেখেন, তার নিম্ন অংশটুকু বিশেষভাবে উল্লেখ্য–

"অদ্ভুদ পরিস্থিতির বিবরণ লিখতে গিয়ে আপনি বর্তমানের মানুষ ও শয়তানের যে চিত্র একেছেন, তা পরম উপভোগ্য হয়েছে। মানুষ শয়তানে দেশ আজ পরিপূর্ণ। ধর্ম ও কৃষ্টি প্রতিনিয়ত দ্বারে দ্বারে কেঁদে গড়াগড়ি দিচ্ছে; কিন্তু সেদিকে মানুষের লক্ষ্য নেই। শয়তানের সভায় যে সমস্ত সামাজিক দুর্নীতির প্রতি আপনি ইঙ্গিত করেছেন সেগুলি বীভৎস রূপ নিয়ে, সারাদেশকে শয়তানের লীলা ভূমিতে পরিণত করেছে। আপনি সত্যই বলেছেন আজ সব শ্লোগান ডুবিয়ে এই বুলিই উঠছে–

শয়তান কিলকিস্ জিন্দাবাদ
বাদশা ইবলিস জিন্দাবাদ। ।৬৫

'শয়তানের সভা' প্রবন্ধগ্রন্থটি শেখ হবিবর রহমানের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। লেখক দুষ্টু চিন্তার লোকদের শয়তান বা ইবলিস বলেছেন। এই দুষ্টু লোকেরা একত্রে বসে অর্থাৎ সভা করে সমাজ জীবনের ক্ষতিসাধনের চিন্তায় মত্ত থাকে। তারা মিথ্যার বেসাতি করে মানুষকে ধোকা দেয় এবং মানব জীবনের অনিষ্ট সাধন করে। লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁরা নিজেরাতো খারাপই এবং তারা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে চুরি, ঘুষ, ধাপ্পাবাজি কৌশলগুলো মানুষকে শিক্ষা দিতে। প্রবন্ধগ্রন্থটি সমাজ সচেতনামূলক উপদেশমূলক ব্যাঙ্গাত্বক প্রবন্ধগ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও অন্য ধর্ম।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ "ইসলাম ও অন্যধর্ম"। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন। গ্রন্থটি প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, ৮-নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। বইটির 'নিবেদন'-এ উল্লেখ করা হয়-

> *"যাহা মানবকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে তাহাকে ধর্ম্ম বলা হয়। কিন্তু অপপ্রয়োগের ফলে এই ধর্ম্মের জন্য মানবের যত ক্ষতি ও অনর্থ সাধিত হইয়াছে, বোধ হয় অন্য কোন কারণেই ততটা হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া তদনুসারে চলিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।*
>
> *"ইসলাম জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলির অন্যতম। এই ইসলামের স্বরূপ এবং ইহার সহিত অন্য ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, এইক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা এই বিষয়টি লিখিত হইলেই ভাল হইত; কিন্তু তেমন কেহ অগ্রসর না হওয়ায় আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই একান্ত সঙ্কোচের সহিত এই গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছি। আমার অনুপযুক্ততা ও অক্ষমতা আমি পদে পদে অনুভব করিয়াছি এবং তজ্জন্য বিনীতভাবে পাঠক সাধারণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি আমার সহজ ও সরল বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি, এই পুস্তকে তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার কোন কোন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রতিবাদ উঠিতে পারে। প্রতিবাদকারীর প্রতি আমার বিনীত নিবেদন তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ তিন পৃষ্ঠা (৭৯-৮১ পৃষ্ঠা) পাঠ করিবেন। আমার ভ্রমক্রুটী প্রদর্শিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত ভবিষ্যতে সংশোধনের ইচ্ছা রহিল।*
>
> *ইসলামী বিষয়ক যুক্তি প্রমাণগুলি সাধারণতঃ কোরান শরিফ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক বন্ধু দেশকর্ম্মী জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থ কোরান শরিফের অনুবাদের সাহায্য আমি সর্ব্বত্রই গ্রহণ করিয়াছি।"*[৬৬]

মোট ১৩টি পরিচ্ছদে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী বিশ্লেণের মাধ্যমে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যিরত্ন তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সর্বত্রই তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাশীলতা ও প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপস্থাপনার প্রয়াস সুস্পষ্ট।

- **প্রথম পরিচ্ছদ :** বর্ণিত বিষয় সার্বজনীন দর্শন, ইসলামের বিশ্বমুখিতা।
- **দ্বিতীয় পরিচ্ছদ :** এ পরিচ্ছদের মূখ্য আলোচ্য বিষয়– আল কোরান ও মুসলমান তথা সমগ্র মানবজীবন।
- **তৃতীয় পরিচ্ছদ :** ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে তাত্ত্বিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা।
- **চতুর্থ পরিচ্ছদ :** সনাতন হিন্দু-ধর্মাবলম্বীগণের সাথে আহ্‌লে কেতাবীদের সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ।
- **পঞ্চম পরিচ্ছেদ :** উপনিষদ ও গীতা হতে ইসলাম-সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কে উদ্ধৃতি সংকলন।
- **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :** ইসলাম ও সনাতন হিন্দুধর্মের ভিতর বিরোধ অপেক্ষা সামঞ্জস্য অধিক। মসনবীয়ে রুমীর একটি উপাখ্যান ও উপদেশ উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'নাম বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রকার হইলেও আসল জিনিস একই; জগতের সমস্ত দেশই মুসলমানের দেশ, সকল ভাষাই মুসলমানের নিজ ভাষা, সকল মানুষই মুসলমানের আপন।'

Dhaka University Institutional Repository

- **সপ্তম পরিচ্ছেদ :** এ পরিচ্ছদে তুলে ধরা হয়েছে অতি প্রাচীনযুগের মানবসমাজ ও তাদের ধর্ম সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা।

- **অষ্টম পরিচ্ছেদ :** কোরআনের আলোকে মানুষের শ্রেণীবিভাগ।

- **নবম পরিচ্ছদ :** কোরানের বিধানানুসারে নাস্তিকতা, ইহলৌকিক পরলৌকিক জীবন ও মূল্যবোধ বিচার।

- **দশম পরিচ্ছেদ :** অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ সংক্রান্ত আলোচনা, বেহেশ্‌ত ও দোযখ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণাসমূহ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

- **একাদশ পরিচ্ছদ :** এই পরিচ্ছদের মুখ্য বক্তব্য হলো, কোরান শরীফের ও ইসলামের সমগ্র-শিক্ষা হজরত মোহাম্মদ(সাঃ)-এর জীবনের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো–ইসলামের সমস্ত আইন-কানুন ও বিধি ব্যবস্থার ভিত্তিই হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শী। হজরতের অমুসলমান নীতি এই জন্যই বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। মানবতার উচ্চভূমিতে হযরত মোহাম্মদ ও একজন বিধর্মী প্রতিমা পূজক মহীয়ান বেশে পরস্পরের পরম বন্ধুরূপে কিভাবে পাশাপাশি দণ্ডায়মান হয়েছিলেন ইত্যাদি।

- **দ্বাদশ পরিচ্ছদ :** নির্দেশ করা হয়েছে কোরআন শরীফের উপদেশানুযায়ী কিভাবে অমুলমান পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ব্যবহার ক'রতে হবে।

- **ত্রয়োদশ অধ্যায় :** নিবেদিত হয়েছে কোরআন শরীফের তাৎপর্য ও অবিসংবাদী ভূমিকা।

১৯৪৬ সালে ভারত-বিভাগের প্রাক্কালে কলিকাতায় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় (যা Great Calcutta killing নামে ইতিহাসখ্যাত) বহু জীবনের যবনিকাপাতে মানবতাবাদী মুসলমান লেখক শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন বিচলিত হয়ে পড়েন। নিছক ধর্ম ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার কারণে মানুষের মধ্যে সম্ভ্রমযুক্ত সম্প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হবে, দেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিভাজন অনিবার্য হবে, এ-সর্ম্পকে তিনি ছিলেন নিদারুণভাবে বিক্ষুদ্ধ। তিনি ভারত-বিভাগকে মেনে নিতে পারেন নি। সম্ভবত তাঁর এ-সময়কার অনুভূতি ও চিন্তাচেতনার ফসল এ-গ্রন্থ। এ-গ্রন্থ প্রসঙ্গে ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ৬ মে, ১৯৪৯ তারিখে লীখত 'অভিমত' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য–

> *"জনাব মৌলবী হবিবর রহমান সাহেবের রচিত–'ইসলাম ও অন্য ধর্ম' পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য অতি সাধু। ইসলাম ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মসমূহের (বিশেষ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের) মিল যেখানে যেখানে মৌলভী সাহেবের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান পাঠকগণের নিকট উদঘাটন করিয়া দিয়া ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আধারে মানুষে মানুষে সদ্ভাব ও ভ্রাতৃত্বের প্রচার করাই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপ উদ্দেশ্যের সহিত প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি থাকিবেই। মৌলভী সাহেব নিষ্ঠাবান মুসলমান, ইসলামের আস্থার ভিত্তি ও সামাজিক রীতি-নিয়ম সমস্তই তিনি বিশ্বাসী মুসলমানের দৃষ্টিতে স্বীকার করেন ও পালন করেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরমতসহিষ্ণু এবং তাহার আদর্শমত ইসলাম ও পরমতসহিষ্ণু উদার ধর্ম্ম। তাহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্ঠিকোণ লইয়া আলোচনা করিব না; কারণ সে দিক হইতে বিচার করিলে পুস্তকে প্রকাশিত কতকগুলি মত ও ব্যাখ্যা যুক্তিসহ হইবে কিনা সন্দেহ। তবুও ভাবগ্রাহিতা*

Dhaka University Institutional Repository

অবলম্বন করিয়া চলিলে, মৌলভী সাহেবের প্রচেষ্টার মূল্য আছে। এইজন্য এই বইয়ের প্রচার কামনা করি, বিশেষ করিয়া মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের কাছে।

মূল বস্তুতে বিশ্বাস, ও সময়োপযোগী প্রগতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সৌভ্রাত্র ও পরমতসহিষ্ণুতা-এই কয়টি বস্তু আধুনিক মুসলমান-জীবনে তাহার কাছে পরম কাম্য।" ৬৭

শেখ হবিবর রহমানের অনবদ্য সৃষ্টিকর্ম হল 'ইসলাম ও অন্যধর্ম' প্রবন্ধ গ্রন্থটি। শেখ হবিবর রহমান নানাধর্ম গ্রন্থ গবেষণা করে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। উদ্ধৃতি ও নানা প্রমাণ দিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, সকল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ এক ও অভিন্ন। বিভিন্ন পথ বিভিন্নভাবে এসে একই পথে মিলেছে। শেখ হবিবর রহমান কোরআনের আলোকে বলেছেন যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর মতান্তরে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার পয়গম্বর পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁরা লাখো বছরের বিবর্তনে বিভিন্ন জাতি গোষ্টির ধর্ম প্রবর্তক হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত। আজকের আলোকে আমরা কেউ কাউকে মানি না অথচ সবাই আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসূল। প্রবন্ধকার মানব সমাজকে মানবতার মন্ত্রে এক হতে বলেছেন। মানুষের স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প বুদ্ধি, তাই মানুষ নিজেকে চিনতে ও বুঝতে পারে না। ১৩ টি অধ্যায়ই তথ্য প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থটি সকল ধর্মমতের মানুষের জন্য সঠিক পথ নির্দেশক হতে পারে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

মরণের পরে (স্পিরিচুয়ালিজম)

মরণের পরে শেখ হবিবর রহমানের বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন লেখকের ছোট ছেলে শেখ সামছুর রহমান। পারিজাত সাহিত্যকুটীর, কে ডি ঘোষ রোড, খুলনা থেকে গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। বিজ্ঞাপনে এ-গ্রন্থ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়–

> *"মরণের পরে মানুষের অবস্থা কিরূপ হইবে, পরলোকের স্বরূপ কি ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু মনীষী ও জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণের সুদীর্ঘ কালব্যাপী গবেষণাপ্রসূত অমূল্য তথ্যবলী এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।*
>
> *এ গ্রন্থ পাঠে ঈমান মজবুত হইবে। গোর আজাব, পুলসেরাত, ফেরেশতা ইত্যাদির সত্যতার প্রমাণ পাইবেন। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মনীতির সহিত ইহার কোনই বিরোধ নাই।"*[৬৮]

'উপক্রমনিকা'য় এ-গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন উল্লেখ করেন–

> *"স্পিরিচুয়ালিজম বা পরলোকতত্ত্ব একটি নূতন বিজ্ঞান। মৃত্যু কি, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে কিনা, থাকিলে তখন অবস্থা কিরূপ হয়, কিভাবে তখন তাহার সময় অতবাহিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত অতি দুরূহ বিষয় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে অবগত হওয়াই স্পিরিচুয়ালিজমের লক্ষ্য। ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু মনীষী ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রায় এক শতাব্দী কাল এই বিষয়টি লইয়া গভীর গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে এই গৌরবময় বিরাট বিজ্ঞানশাস্ত্র উদ্ভুত হইয়াছে।*

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের জনসাধারণ-এমন কি, বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও এই স্প্রি/রিচুয়ালিজম সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। অথচ প্রত্যেক মরণশীল মানবের পক্ষে ইহা যে শুধু কৌতূহলোদ্দীপক তাহা নহে; একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। মানব মাত্রেই মৃত্যুপথের পথিক; শীঘ্রই হউক অথবা কিছু বিলম্বেই হইক, প্রত্যেকেই মৃত্যুর দ্বার দিয়া পরলোকে নীত হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের ভবিষৎ আবাসভূমি সেই পরলোকের বিবরণ জানিতে, সেই দেশে উপনীত হইবার পর আমাদের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা অবগত হইতে আগ্রহ হওয়া সকলের পক্ষেই একান্ত স্বাভাবিক।

... ...পরলোক সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়েরই ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ, অথচ স্পিরিচুয়ালিষ্টদের সাধনা ও কর্ম্মপদ্ধতির সহিত কোন ধর্ম্মের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের সিদ্ধান্তগুলির পরস্পরের সহিত মিল নাই। বিশেষতঃ প্রায় ক্ষেত্রেই তাহাদের ভিত্তি অন্ধবিশ্বাস ও পূবর্ক্ষ সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জ্ঞানবিজ্ঞানোন্নত সংস্কারমুক্ত স্পিরিচুয়ালিষ্টগণ কোন ধর্ম্মের সহিত কিছু মাত্র সম্বন্ধ না রাখিয়া স্বাধীনভাবে যুক্তিতর্ক ও পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁহাদের সাধনার সামান্য আভাস এবং তাঁহারা যে সমস্ত তথ্য সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, এইরূপ তথ্যের কতকগুলি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই সমস্ত বিবরণ বাস্তবিকই সত্য কিনা, তৎসম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। যাহারা এই সমস্ত কথা মিথ্যা বলিয়া মনে করিবেন, তাহাদের পক্ষে এই পুস্তক পড়িয়া অহেতুক সময় ব্যয় না করিলেই ভাল হইবে। তবে জ্ঞানী, বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ আশাকরি সংস্কারমুক্ত অপক্ষপাত অন্তর লইয়া উদারভাবে বিষয়গুলি পড়িবেন এবং ইহার ভিতরে নূতন কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সাধারণভাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, স্পিরিচুয়ালিজমের ভিত্তি কোন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও কোন উন্নত ধর্মের সহিত ইহার কিছু মাত্র বিরোধ নাই; বরং এদেশে সবর্ক্ষাধিক প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্ঠান ধর্মের মূলনীতিসমূহ ইহা সবর্ক্ষতোভাবে সমর্থন করিয়াছে, এই পুস্তকের বিচক্ষণ পাঠকগণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ইসলামের তাসাওয়াফ বা খোদা প্রাপ্তি বিদ্যার সহিত স্পিরিচুয়ালিজমের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।”[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

মোট ১৫টি পরিচ্ছদে এ-গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিন্যাস করা হয়েছে।

- প্রথম পরিচ্ছদ : পরলোক বিজ্ঞান, মানবাত্মার অমরত্ব, কেয়ামত ও কবর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এ পরিচ্ছদে।
- দ্বিতীয় পরিচ্ছদ : বিজ্ঞান ও স্পিরিচুয়ালিজম, কয়েকজন পরলোকগত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মৃত্যুর পর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে পৃথিবীতে পুনরাগমন এবং পুলসিরাত প্রসঙ্গে আলোকপাত।
- তৃতীয় পরিচ্ছদ : আলোচ্য বিষয় থিওসফি, মানবের সূক্ষ্ম দেহ ও মিরাজ সমস্যার সমাধান।
- চতুর্থ পরিচ্ছদ : পরলোকগত দুই ব্যক্তির মৃত্যুকালীন অবস্থার বিবরণ দান।
- পঞ্চম পরিচ্ছদ : মৃত্যুকালে ফেরেশতা বা মৃত্যুদূতগণের দেখা দান।
- ষষ্ঠ পরিচ্ছদ : কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুর ঠিক পরে বা পূর্বে কয়েক স্থানে দেখা দান।
- সপ্তম পরিচ্ছদ : কি কি উপায়ে পরলোকগত ব্যক্তিদের সাথে পৃথিবীর লোকের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়।
- অষ্টম পরিচ্ছদ : মৃত্যুর ঠিক পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে পরলোক বিজ্ঞানীদের এবং ইমাম গাজ্জালীর অভিমত।

Dhaka University Institutional Repository

- নবম পরিচ্ছদ : মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে শেক্সপীয়ার ও ইংল্যান্ডের একজন বিচারকের বিবরণ।

- দশম পরিচ্ছদ : এই পরিচ্ছদে বর্ণনা করা হয়েছে মৃত মাতার সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় ও মৃত শিশুর পৃথিবীতে পুনরাগমন।

- একাদশ পরিচ্ছদ : বিলাতী ভূতের অদ্ভুত যুদ্ধ এই পরিচ্ছেদের বিষয়।

- দ্বাদশ পরিচ্ছদ : একটি অভিশপ্ত আত্মার মর্মন্তুদ কাহিনী,

- এয়োদশ পরিচ্ছদ : মৃত্যুর পরবর্তী নতুন-জীবন এবং পরলোকের বিবিধ সংবাদ বর্ণনা।

- চতুর্দশ পরিচ্ছদ : এই পরিচ্ছদে দেয়া হয়েছে কয়েকজন বিখ্যাত মৃত ব্যক্তির পরলোক জীবনের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

- পঞ্চদশ পরিচ্ছদ : নাস্তিকতা, মিথ্যা, বিশ্ব খোদার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত- এ উপসংহারের মাধ্যমে গ্রন্থের যবনিকাপাত।

'মরণের পরে' শেখ হবিবর রহমানের একটি মুল্যবান গবেষণা গ্রন্থ। তিনি নানা ধর্মীয় গ্রন্থ পড়াশুনা করেছেন এবং অসংখ্য গ্রন্থ থেকে উপমার পর উপমা দিয়ে সাজিয়েছেন গ্রন্থটি। মৃত্যু কি? মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে কি না, থাকলে তাঁর অবস্থা কিরূপ হয়? কিভাবে তখন তাঁর সময় অতিবাহিত হয় – এইসব বিষয় নিয়ে শেখ হবিবর রহমান রচনা করেছেন এই গ্রন্থটি।[৭০]

Dhaka University Institutional Repository

স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম কোন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও কোন ধর্মের সাথে এর কোন বিরোধ নেই বরং সর্বাধিক প্রচলিত ধর্ম হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ ধর্ম সর্বতোভাবে সমর্থন করেছে। ইসলামের তাসাওয়াফ বা খোদাপ্রাপ্তি বিদ্যার সাথে স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ৭১

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছদে স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম বা পরলোক-বিজ্ঞান কি? মানবাত্মার অমরত্ব, কেয়ামতের কথা, কবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শেখ হবিবর রহমান। তিনি মনে করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ধর্ম শাস্ত্রের উপর এক দল লোকের আস্থা কমে গেছে। তাই তাঁরা সুদীর্ঘকালব্যাপী অর্থাৎ প্রায় শত বৎসর পূর্ব থেকে স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম নিয়ে গবেষণা করছেন সত্যানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতরা। ৭২

লেখক মনে করেন খোদার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস নিয়েই এই অনুসন্ধানে ব্রতী হন গবেষকরা। ১৮৭০ সালে আমেরিকায় প্রথম 'সোসাইটি ফর দি সাইকিকাল রিসার্চ' নামে একটি সমিতি গড়ে উঠে এবং গবেষকরা স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম গবেষণা শুরু করেন। ৭৩

মহাপ্রলয়ের পর খোদা এই পৃথিবী নতুন করে সৃষ্টি করেন। সেই বিশ্বের সাথে এই বিশ্বের ধারণা করা যাবে না। ৪৯ আয়াত, সুরা ইবরাহিম, ১৩শ পারা ও ১০৪ আয়াত, সুরা আম্বিয়া, ১৭ পারা, এবং ৩য় আয়াত, সুরা আহকাফ, ২৬ পারা থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন।৭৪

মানব দেহের ভিতরে খোদার বসবাস। তিনি সুরা সেজ্‌দা, ৭৯ আয়াত, ২১ পারা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন – "মানব-দেহের ভিতরে তিনি স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছেন।"৭৫

Dhaka University Institutional Repository

গোর বা কবর বলতে শেখ হবিবর রহমান 'আলমে বরজখকেই বুঝিয়েছেন।৭৬ তিনি বিশ্বাস করেন প্রচলিত গোড় বা কবরে কোন শাস্তি হয় না। শাস্তি হয় আত্মার– তা হবে পুনজন্মের পর।৭৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছদে 'বিজ্ঞান ও স্পিরিচুয়ালিজম' শিরোনামে শেখ হবিবর রহমান ধর্ম নিরপেক্ষ গবেষণার মাধ্যমে পরলোকের অনুসন্ধানের নানা দিক তুলে ধরেছেন এবং পরলোকগত কয়েকজন বিজ্ঞানীর পৃথিবীতে সাক্ষাৎ দানের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন।

শেখ হবিবর রহমান মনে করেন ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দিন দিন কমে যাচ্ছে। ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষেরা পরলোকগত বিষয় নিয়ে যে বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে – তারই নাম 'স্পিরিচুয়ালিজম'। প্রবন্ধকার লিখেছেন– "ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনার উপর এক শ্রেণীর লোক আর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। ধর্মের প্রতি লোকের বিশ্বাস দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। ধর্ম নায়কদের চরিত্রের দুর্বলতা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁহাদের শোচনীয় মূর্খতা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রের মতবিরোধ ধর্মের প্রতি সাধারণ লোকের আস্থা দিন দিন একেবারে নষ্ট করিয়া দিতেছে। সুতরাং 'মরণের পরে' মানবের অবস্থা কিরূপ হইবে, এই অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য ধর্ম্ম নিরপেক্ষ স্বাধীন চিন্তা-গবেষণার পথে মানুষ অগ্রসর হইয়াছে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব হইতে। এই প্রচেষ্টার ফলে যে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'স্পিরিচুয়ালিজম'। ৭৮

বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমেই পরলোক তত্ত্বের গবেষণায় অগ্রসর হয়েছেন। উইল পাওয়ার, থট রিডিং, টেলিপ্যাথি ইত্যাদি পথে সাধনার মাধ্যমে এই পথে অগ্রসর হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরলোকগত মানবগণ স্বপ্নে অনেকের সাথে স্বাক্ষাৎ দেন। তাছাড়া পরলোকগত আত্মা নানা প্রকার উৎপাত করে মানব সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ এইসব বিশ্বাস করেনি কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা এইসব বিষয়কে উড়িয়ে না দিয়ে এর সত্যাসত্য দিক উন্মোচনের চেষ্টায় রত হলেন। ১৮৭০ সালে প্রথম আমেরিকার পরলোকতত্ব নিয়ে গবেষণা চালু হয়। [৭৯]

স্যার উইলিয়াম ক্রক্স এবং মিসেস ফ্লোরেন্স কুক এবং তাঁর কয়েকজন সাহসী শিষ্য এই গবেষণায় রত হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে লণ্ডনের বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতিটির নাম ছিল 'সোসাইটি ফর দি সাইকিক্যাল রিসার্স'।[৮০] 'হিউমেন পারসোনালিটি এণ্ড হিজ সারভাইভাল আফটার বডিলি ডেথ' গ্রন্থের লেখক প্রফেসর মেয়ার্স উক্ত সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বন্ধুদের কথা দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পর তিনি একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে তাঁদের সাথে দেখা করবেন। এমনকি মৃত্যুতে গমন সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন–

> *"তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা প্রথম প্রথম তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় তাঁহার মনে হইত, তিনি যেন এক অন্ধকার পথে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কোথায় চলিয়াছেন। যেন এক আশ্চর্যজনক অজানা নগরে তিনি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন।"*

যে সমস্ত লোক অনেকদিন পূর্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন, এমন বহু লোকের সাক্ষাৎ তিনি এই অবস্থায় পাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন তিনি বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছেন।[৮১] আমেরিকার শাখা সেক্রেটারি ডাঃ হজসন এবং বিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে উপস্থিত হয়ে মিডিয়াম মিসেস পাইপারের স্বয়ং লিখন যন্ত্রে তাঁর বক্তব্য লিখে জানিয়েছেন।[৮২]

মৃত্যুর পর মানব আত্মা ধ্বংস হয় না, বরং অনন্ত জীবন লাভের মাধ্যমে এক অভিনব বিশ্বে অবস্থান করে। শেখ হবিবর রহমান মনে করেন, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইয়াকুব, হযরত মুসা, হযরত ঈসা, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং অন্য সমস্ত পয়গম্বর যে ফেরেস্তাদের দেখেছেন এবং কথাবার্তা বলেছেন–"খোদার তরফ হইতে অহি বা প্রত্যাদেশ শুধু যে পূবর্ক্ষ যুগের নবী বা অলী-দরবেশদের নিকটেই অবতীর্ণ হইত–তাহা নহে, বর্ত্তমান যুগেও অলী-দরবেশ এবং ধর্মপ্রাণ সাধকদের নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়া থাকে।[৮৩]

শেখ হবিবর রহমান মনে করেন ইসলাম ও সনাতন হিন্দু ধর্মের মূলনীতির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তিনি লিখেছেন–"ইসলাম ও সনাতন হিন্দু ধর্মের মূলনীতির মধ্যে যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই একথা আমার 'ইসলাম ও অন্যধর্ম' পুস্তকে উভয় ধর্ম্মের বিবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। স্বামী অভেদানন্দ বহুক্ষেত্রে প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্পিরিচুয়ালিজমের প্রায় সিদ্ধান্তই এই উভয় ধর্মের মূলনীতি ও বিশ্বাসের সমর্থক।[৮৪]

তৃতীয় পরিচ্ছদে থিওসফি ও মানবের সূক্ষ্মদেহ এবং পরলোকগত ব্যক্তির সাথে থিওসফির সম্বন্ধ অতি নিবিড়। থিওসফির মতে মানবের এই জড়দেহই একমাত্র দেহ নয়। স্থূল দেহ ছাড়া আরো তিন প্রকার দেহ আছে। যথা :

১। জ্যোতিদেহ

Dhaka University Institutional Repository

২। মানস দেহ

৩। নিমিত্ত্ব দেহ।

এই দেহগুলিকে ইথারিক দেহ বলা যায়। স্থূল দেহের সাথে ইথারিক দেহ মিশে থাকে।৮৫ আত্মা হচ্ছে আসল বস্তু, দেহ হচ্ছে তার পোশাক। আমরা অনেক সময় যেমন পোশাক পরিবর্তন করে হালকা পোশাক ব্যবহার করি, তেমনি আত্মা স্থূল দেহ চেঞ্জ করে সূক্ষ্ণ দেহ ধারণ করে। স্থূল দেহ যখন ঘুমায়, আত্মা তখন ইথারিক দেহ ধারণ করে আধ্যাতিক জগতে ঘুরে বেড়ায়।৮৬

সব দেহই আত্মার বশীভূত। যে মানুষের আত্মিক শক্তি যত প্রবল, সে ততই দেহগুলিকে বশ করতে পারে। জাগ্রত অবস্থাতেও সে অপর যে কোন দেহ নিয়ে সর্বত্র বিচরণ করার ক্ষমতা রাখে। এই স্থূল দেহ নিয়ে ইচ্ছা করলে শত মাইল দূরে যে কোন ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। একই সময়ে এ্কই মানুষ ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় তাহার নিজের চেহারায় অন্যত্র দেখা দিতে পারে। ৮৭

পরলোকের অবস্থার কি রূপ – সে সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের মৃত ব্যক্তির সাক্ষ্যের আলোচনা এবং দুইজন পরলোকগত ব্যক্তির পরলোকের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন প্রবন্ধকার চতুর্থ পরিচ্ছদে। মানব আত্মাকে স্পিরিচুয়ালিষ্টরা 'স্পিরিট' বলে থাকত। তাঁরা মনে করেন আত্মা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক পদার্থ। ইহার কোন শরীর নাই। এই জড় জগতে অবস্থানকালে মানবের শরীরের সাথে সম্বন্ধ থাকে। আত্মার তিরোধানে শরীরও ধ্বংস হয়ে যায়।৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক জড় দেহের সাথে ঠিক এই দেহেরই অনুরূপ একটি সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে সূক্ষ্ম জগতে অবস্থান করে। [৮৯]

মানুষ মৃত্যুর পর যে জগতে বসবাস করে তাহা ঠিক অনুরূপ এই জগতের মতো এবং মানুষ সেখানে নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। এই প্রসঙ্গে শেখ হবিবর রহমান তাঁর লেখায় লিখেছেন–"মানব মৃত্যুর যে জগতে বাস করে, তাহা ঠিক আমাদের এই জড় জগতের অনুরূপ। সেখানে এই পৃথিবীর মতো সবই আছে। এই পৃথিবীর মতই সেখানে পরলোকগত ব্যক্তিরা সর্বদা নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, এই জন্য কোন পরলোকগত আত্মা পৃথিবীতে আসিলে তিনি বিলম্ব করিতে চাহেন না।"[৯০]

প্রবন্ধে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, জড় জগৎ ছেড়ে যে সে পর জগতে চলে গেছে বহু আগে, এটা অনেক স্পিরিট বহুদিন পর্যন্ত বুঝতে পারে না। তাদের সেখানকার জীবন এই পার্থিব জীবনের মতই।[৯১] স্বপ্ন সম্পর্কে লেখকের অভিমত হচ্ছে যে, আমরা স্বপ্নে অনেক স্থানে গমন করি, অনেকের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করি, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আমরা বাস্তবে ফিরে আসি এবং স্বপ্ন অবাস্তব মনে করি। স্বপ্নে থাকাকালীন সময়টুকু হচ্ছে সূক্ষ্ম দেহে আত্মার পরিভ্রমণ। সে সময় স্পিরিট সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে। স্বপ্ন অনেক সময়ই বাস্তব হয় এই কারণে।[৯২]

প্রবন্ধে দুটি স্পিরিট তাঁদের মৃত্যুকালীন বর্ণনা সম্পর্কে লিখেছেন। ১ম স্পিরিট বলেছেন–"কিছুদিন পর্যন্ত আমি রাত্রিতে শুনিতে পাইতাম, কে যেন অলক্ষ হইতে মিষ্ট স্বরে আমার সহিত কথা বলিত, এখন আমরা একত্রিত হইব। কে কথা বলিতেছে, তাহা ভাবিয়া

Dhaka University Institutional Repository

আশ্চর্য্যন্বিত হইতাম। আমি এই ব্যাপারের রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। ক্রমে আমার শেষ দিন ঘনাইয়া আসিল। মৃত্যুর দিনও 'আজ আমি মরিব' একথা বুঝিতে পারি নাই। সকাল বেলায় বসিয়া আছি, তন্দ্রাছন্ন অবস্থায় শুনিলাম, কে যেন বলিল– 'সব শেষ'। মাত্র এই দুটি শব্দ শুনিলাম। আমি শান্ত হইয়া শুইয়া ছিলাম, তখন শরীরের একটা অস্থিরতা অনুভব করিতে লাগিলাম। মাকে দুধ দিতে বলিলাম। দুধটুকু খাইয়া আমি চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলাম। আমার নিকটে তখন অনেক লোক বসিয়া ছিল। আমি তন্দ্রাছন্ন অবস্থায় দেখিলাম, একটি সুন্দর বাগানে দুইজন লোক রহিয়াছে। তখন তাহাদিগকে মানব বলিয়া মনে হইলেও এখন বুঝিয়াছি তাঁহারা ছিলেন ফেরেশতা, খোদার দূত। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার একটু ভয় হইল না। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, আর কত সময় বাকি আছে? অপর ব্যক্তি বলিলেন, এই লোকই কি সেই লোক? তুমি যেন শেষে ভুল করিয়া না বস। অপর লোকটি উত্তর করিলেন–'না, না, এই লোকই সেই লোক'। আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম। তখন তাঁহারা তাঁহাদের হাত উত্তোলন করিলেন। ইহার পর কি ঘটল তাহা জানি না।

কিছুক্ষণ পর সচেতন হইয়া দেখিলাম, আমি একটি ভয়ঙ্কর স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থান দেখিয়া আমি ভীত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। ইহার পর কি ঘটিল। কোন স্থান দিয়া আমি কোথায় গেলাম, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।[৯৩]

দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির 'স্পিরিট' জানিয়েছেন–"আমি মৃত্যুকালে কয়েকজন ফেরেস্তা দেখিতে পাইলাম; তাঁহাদিগকে মানুষের মতই দেখাইতেছিল, তাহারা আমাকে তাহাদিগের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে যাইতে বলিলেন। আমরা একসঙ্গে কোন এক নিরুদ্দেশ পথে চলিতে লাগিলাম। পথে অনেক মানুষ আমি দেখিয়াছিলাম। আমাদের একটি নদী অতিক্রম হইয়াছিল। নদীটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহা পার হইতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। যাহারা উন্নত ধামে গমন করেন, তাঁহাদের সকলেই এই নদী অতিক্রম করিতে হয়।৯৪

পঞ্চম পরিচ্ছদে জাঞ্জিরার দ্বীপে অদ্ভুত মাছ ও তাঁর দেহে আল্লাহর বাণী দেখা গেছে এবং কয়েকজন মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট ফেরেস্তা কিভাবে উপস্থিত হন এবং দৃশ্যামান হন তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধকার নিজ চোখে দেখেছেন যে, জাঞ্জিবার দ্বীপে একটি অদ্ভুত মাছ পাওয়া গেছে। মাছের গায়ে লেখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা এবং এক পাশে 'শানে আল্লা'। এই লেখা থেকে খোদার অস্তিত্ব এবং ক্ষমতা বোঝা যায়।৯৫

মৃত্যুর সামান্যপূর্বে মানুষের অন্তচোখ খুলে যায়, তখন মৃত্যুপথযাত্রী অন্তলোকের বাণী শুনতে পান। তাঁছাড়া তাঁর আত্মীয় স্বজনরাও নমুনা বুঝতে পারেন। 'পরলোক তত্ত্ব' গ্রন্থের লেখক শ্রী কানাইলাল নাগ লিখেছেন যে, তাঁর গ্রামের এক বিত্তশালী ভদ্রলোক বিসুচিকা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে খাটে রেখে দুতলায় যাইতেই সিঁড়িতে রক্তবর্ণের পোশাক পরা এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। লোকটির মাথায় পীত বর্ণের পাগড়ি, হাতে লাঠি, মুখ মণ্ডল প্রফুল্ল ও সুন্দর। তিনি ভয়ে নিচে রোগীর কাছে চলে এলেন। বিকেল বেলায় রোগী কিছুটা সুস্থ হলেন। তখন তিনি রোগীর শয্যার পাশে লোকটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তাঁর চিৎকারে বাড়ির সকলে একসাথে হয় এবং দণ্ডায়মান লোকটি অদৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যায়। রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। গ্রন্থের লেখক সেই রমনী থেকে এই কথাটি শুনেছেন বলে শেখ হবিবর রহমান উল্লেখ করেন।৯৬

লেখক তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট শুনে আরেকটি বিবরণ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, "আপনারা বোধ হয় দেখিতে পাইতেছেন না যে, আমার পায়ের দিকে দুইটি লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা আমাকে ভ্রুকুটি দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ৯৭

আরেক ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, ছেলে মৃত্যু শয্যায় চিৎকার করে বলেছেন, "বাবা, দুইজন বিকট বেশী পুরুষ আমার শয্যার পাশে দণ্ডায়মান। তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ কি? এরূপ বিকটকার লোক আমি কখনও দেখি নাই। উহাদের শরীরের বর্ণ কালি অপেক্ষাও কালো মুখ অতি কুৎসিৎ ও ভয়াবহ, চক্ষু দুইটা লাল বর্ণ। তাহাদিগের হস্তে লাঠি। তাহারা কোন কথা বলিতেছে না। কেবল এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে যেন তাহারা আমাকে ধরিবার উপক্রম করিতেছে। বোধ হয় এ পীড়ায় আমার রক্ষা নাই।"৯৮

রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই রকম কয়েকজন মৃত্যুপথযাত্রীর মৃত্যুপূর্বকালীন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এই প্রবন্ধে।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছদে প্রবন্ধকার মৃত্যুর পূর্বে ঘনিষ্ঠজনরা কিভাবে সূক্ষ্মদেহে সাক্ষাৎ করে যায়, কথা বলে যায়– এই রকম অনেকগুলো স্পিরিটের সাক্ষাৎকার বিভিন্ন রকম সাক্ষাৎদানের বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে ইংলেন্ডের রানী ইসাবেলার মৃত্যুর পাঁচশত বছর পরে যে সাক্ষাৎ দিয়েছেন এবং বড়পীর সাহেবকে সংবর্ধনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লিখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাদরি আলেকজান্ডার স্টার্ন তাঁর 'স্পিরিট ওয়ার্ল্ড' নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, তাঁর বাবা কাজের প্রয়োজনে জাভা দ্বীপে যান, কয়েক মাস পরে তাঁর বাবা একদিন দেখতে পান তাঁর মা শুভ্র পরিচ্ছদ পরে মলিন মুখ মণ্ডল নিয়ে বসে আছে। তাঁর মা তখন বিলাতে ছিলেন। কয়েকদিন পর তাঁর বাবার চিঠির মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ঐদিন ঐ সময়েই তাঁর মা মারা গেছেন।[৯৯]

প্রবন্ধকার দ্বিতীয় ঘটনায় উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের দাক্ষিণাত্যের এক গির্জার পাদরি মারা যাবার পর, নতুন পাদরি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি দেখতে পান গির্জার টাকা-পয়সার হিসাব এলোমেলো। তিনি মনে মনে পাদ্রিকে খারাপ জানতে লাগলেন। একদিন পড়ার ঘরে বসে নতুন পাদরি যখন হিসাব কষছেন, এমন সময় স্বশরীরে প্রাক্তন পাদরি উপস্থিত হয়ে একটি চিরকুট রাখলেন। চিরকুটে টাকার আয়-ব্যয় এবং দেনা-পাওনার হিসাব দেয়া হয়েছে।[১০০]

এই রকম অসংখ্য উদাহরণ ও বাস্তব ঘটনা নিয়ে লেখক সাজিয়েছেন এই প্রবন্ধ। বিশেষ করে খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ সাহেবের পুত্র বিয়োগ। ইংল্যান্ডের দুই বন্ধুর বর্ণনা, ঘোষগাতি গ্রামের দক্ষিণে বামনখালি গ্রাম নিবাসীর বর্ণনা। খুলনার মনীন্দ্রনাথ মজুমদার একজন মৃত মানুষকে প্রাতভ্রমণে দেখেছেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিস্টল পত্রিকায় ৩০ জানুয়ারি ৫২ তে প্রকাশিত একটি সংবাদের সূত্র ধরে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ২১ শে মাঘ আজাদ সংখ্যায় "হৈ হৈ ব্যাপার!!, রৈ রৈ কাণ্ড!! লেডি ইসাবেলার প্রেতাত্মার সোমারসেটের গ্রামাঞ্চলে অধিবাসীদের আতঙ্ক" শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি

Dhaka University Institutional Repository

হল–"সোমারসেটের ইয়টন গ্রামের অধিবাসীগণ রাত্রে স্থানীয় গির্জ্জার অতি নিকটে যাইবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। দুইজন পল্লীযাজক ধূসর বর্ণের পোশাক পরিহীতা একজন মহিলাকে রাত্রিকালে ঐ অঞ্চলে করজোড়ে উপাসনা রত দেখিয়াছেন।

উক্ত মহিলা লেডি ইসাবেলা নিউটন বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে উক্ত গীর্জায় সমাহিত করা হয়। উক্ত মূর্ত্তির একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন যে, তিনি অত্যন্ত সাহসের সহিত মুর্ত্তির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করিলে উহা ইসাবেলার সমাধির দিকে অগ্রসর হয় এবং তৎপরে অদৃশ্য হইয়া যায়।"[১০১]

শেখ হবিবর রহমান এই প্রবন্ধে তওহীদ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওহাব সিদ্দিকী প্রণীত "গওসেল আজম হযরত বড় পীর" গ্রন্থ থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন–"শেখ সাদী এবনে হিতি বর্ণনা করিয়াছেন, "এক সময় আমি এবং শেখ বাকা এবনে বাতু বড় পীর সাহেবের সহিত এমাম আহমদ এবনে হাম্বলীর কবর জিয়ারত করিতে গিয়াছিলাম। আমরা দেখিতে পাইলাম কাহারো গৃহে কোন সম্মানীত অতিথি আসিলে যেমন তিনি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন, এমাম হাম্বলী সেইভাবে কবর থেকে উঠিয়া বড়পীর সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং আলিঙ্গনের পর তাঁহাকে সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ একখানি গাত্র পরাইয়া দিলেন। অতপর এমাম সাহেব বড় পীর সাহেবের নিকট শরিয়ত, মারেফত ও হকিকত সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা করেন।"[১০২]

পরলোকগত ব্যক্তি যে জড়দেহ ধারণ করে জীবিত লোককে সংবর্ধনা গ্রহণ করতে পারেন এবং আলাপ-আলোচনা করতে পারেন, তাই প্রমাণিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। কি কি

Dhaka University Institutional Repository

উপায়ে পরলোকগত ব্যক্তির সাথে পৃথিবীর মানুষের আলোচনা সম্ভব? মুসলমান-অমুসলমান সকলেই যে সাধনা দ্বারা মৃতব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখা, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সৎ ব্যক্তিগণ যে, খোদার অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন – কোরআনের উদ্ধৃতিসহ প্রবন্ধকার সাজিয়েছেন সপ্তম পরিচ্ছদটি।

হাদিস শরীফে আছে, “আন্ নাওমে আখাল মওত’ অর্থাৎ নিদ্রা মৃত্যুর ভাই। নিদ্রাকালে তাই মানুষ পরলোকবাসীদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে সহজে।১০৩

মৃত ব্যক্তির সাথে কয়েকভাবে সাক্ষাৎ করা যায়, বিশেষ করে ঋষি বা সূফিগণ ধ্যান যোগে পরলোকে পৌছাতে পারেন। দ্বিতীয়ত. স্পিরিচয়ালিস্টগণের উদ্ভাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে। এ সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন–“এই পন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ একটি ক্ষুদ্র ঈষৎ অন্ধকার প্রকোষ্টে একখানি টেবিলের চতুষ্পার্শে বসিয়া পরপারের হাত ধরিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে খোদার ধ্যানে নিমগ্ন হন এবং তন্ময়চিত্তে একান্ত আন্তরিকতার সহিত খোদার দরগায় প্রার্থনা জানাইতে থাকেন, যেন তিনি তাহাদিগের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির আত্মাকে তাঁহাদের নিকটে পৌছাইয়া দেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা অপেক্ষা সমবেত প্রার্থনার মূল্য মানবের মত খোদার নিকটেও অনেক বেশি। সেইজন্যে ইসলামে জামাতের নামাজের ব্যবস্থা হইয়াছে। হিন্দুগণও সমবেতভাবে সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।”১০৪

মিডিয়ামের মাধ্যমে আত্মা হাজির হন। অনেক সময় মিডিয়াম ছাড়াও জড়দেহ ধারণ করে উপস্থিত হতে পারেন। এ সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত থিওসফিষ্ট ডাঃ এনি বেসান্ত লিখেছেন–“আগন্তুক তখন তাঁহার চতুষ্পার্শস্থ জড় প্রকৃতি হইতে কিছু কিছু জড় উপাদান

Dhaka University Institutional Repository

আকর্ষণ করিয়া এমনভাবে ঘনীভূত হইয়া দাঁড়ান যে, তখন তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষেই দেখিতে পান এবং চিনিতে পারেন।"[১০৫]

অনেক সময় জীবিত জড়দেহর মতো মৃত জড়দেহ অপরকে ছুইতে পারেন, অনুভব করতে পারে এবং নিমিষেই বিলীন হয়ে যেতে পারে।

প্রবন্ধকার প্রবন্ধে কোরআনের সুরা সাদ ৭২ আয়াত ২৩ পারার উদাহরণ দিয়েছেন যে, "তন্মেধ্যে আমি স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলাম।" এবং সুরা বকর ৩৩৮ আয়াত ১ম পারার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, "মানুষ আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত"।[১০৬]

হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকের মধ্যেই আল্লাহ বিরাজ করছেন। প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর প্রিয়। এ সম্পর্কে মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমীর "মসনবীয়ে রুমী" থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন–"আজ্ হাজা'রা কা'বা এক দিন বেহেস্ত"[১০৭] অর্থাৎ "সহস্র সহস্র কা'বা শরিফ অপেক্ষা একজন মানবের হৃদয় শ্রেষ্ঠ।" [১০৮]

প্রবন্ধে লেখক অমুসলিম অনেক স্বর্গীয় আত্মার বর্ণনাও দিয়েছেন এই প্রবন্ধে।

অষ্টম পরিচ্ছদে মৃত্যুর ঠিক পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে স্পিরিটগণের এবং গাজ্জালীর অভিমত দেয়া হয়েছে, তাছাড়া পরলোকগত কয়েক ব্যক্তির বিবৃতি এবং শেক্সপিয়ারের স্পিরিটের সাথে কথোপকথনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। "মানব জীবিতকালে যেমন তাঁর নিজ দেহকে 'আমি' বলিয়া মনে করে, মৃত্যুর পর হইতে তাহার নবলব্দ দেহকেও সেইরূপ নিজের সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। এই দেহ মানবের পার্থিব দেহ অপেক্ষা বহুগুণে সুন্দর ও কার্যোপযোগী।[১০৯]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে মি. ফ্লোরেন্স ম্যারিয়াট এর 'দেয়ার ইজ নো ডেথ' এবং মি. ডভ ডি ঋষি এল এল বি এর তাঁর 'লাইফ আফটার ডেথ' গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে লেখক লিখেছেন যে, মৃত্যুর পরও মানুষের একই রকম অনুভূতি থাকে। অনেক স্পিরিট বুঝতেও পারে না যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অনেক স্পিরিট মৃত্যুর পর নতুন দেহ ধারণ করে ঘুরতে থাকে। তখন তার জড় শরীর দেখে সে অবাক হয় এবং দেহকে বিশ্রী ভাবে এবং ক্রন্দনরত আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে। প্রবন্ধে লেখক দুটি স্পিরিটের কথোপকথনের বিবরণ দেন। যশোহর ঝিকরগাছার অমৃতবাজারে একদিন এক স্পিরিটের সাথে আলাপকালে স্পিরিট বলেন যে, 'মানুষের মৃত্যু নাই।'[১১০]

নবম পরিচ্ছদে মি. লব নামের ইউরোপের এক লেখক তাঁর 'দিস লাইফ বিওণ্ড ডেথ' নামক গ্রন্থে শেক্সপিয়রের আত্মাকে কিভাবে সিয়ান্সে এনেছিলেন সে আত্মার বিবরণ দিয়েছেন। শেক্সপিয়র তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন–"আমি মৃত্যুকালে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করি নাই। নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ জাগরিত হয়, আমি সেইরূপ অন্য অবস্থায় জাগরিত হইয়াছিলাম। মৃত্যুতে যে-সময় আমার সূক্ষ্ণ দেহ স্থুল দেহ হইতে বহির্গত হইল, তখন আমার শয্যাপার্শ্বে ফেরেস্তাকে অবলোকন করিলাম। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি মৃত না জীবিত? তাহারা বলিলেন, আপনি মৃত। মৃত না হইলে আপনি আমাদিগকে দেখিতে পাইতেন না। আপনার মৃত্যুর অনেকক্ষণ পূর্ব্ব হইতে আমরা আপনার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাড়াইয়া আছি। তখন আপনি আমাদিগকে দেখিতে পান নাই।"[১১১]

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিচ্ছদে মি. অ্যাডমণ্ড নামক একজন জজের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনামলে একটি সেনাক্যাম্পে একজন মৃত সৈনিক কিভাবে এসে তাঁর মায়ের নাম ও ঠিকানা লিখে গেল, তাঁর বর্ণনা এবং একজন মৃত মাতা তাঁর সন্তানের জন্য দুধ নিয়ে এনে দিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং একাদশ পরিচ্ছদে 'ফ্যান্টম অব দি ডন' পত্রিকা থেকে একটি ভূতের বাড়ির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছদে একটি অভিশপ্ত আত্মার মর্মান্তিক করুণ অবস্থার বর্ণনা এবং পরলোকে সত্য সুবিচার ও পাপের ভীষণ শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মি. অ্যারিয়েট তাঁর 'স্পিরিট ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে একটি ভূতরে বাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন। সে বাড়ির একটি স্পিরিটকে ডেকে এনেছেন। স্পিরিটটি সূক্ষ্ম দেহে উপস্থিত হয়েছেন বিভৎস দেহ নিয়ে। প্রায় ১৫০০ বছর আগে সে তাঁর কন্যা সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল– তাই তাকে পরলোকে যে শাস্তি পেতে হচ্ছে, তার বর্ণনা এবং স্পিরিটটির এখনো ধারণা সে মরেনি, সে জীবিত আছে। আত্মহত্যাকারী একটি স্পিরিট সাক্ষাৎকারে বলেন–"কেউ যেন আত্মহত্যা না করেন, আত্মহত্যার শাস্তি ভয়ানক। এই সম্পর্কে লিখেছেন–"পৃথিবীতে অবস্থিতিকালে মানবগণ যে পাপ করে, পরলোকে গমনের সঙ্গে সঙ্গে সেজন্য তাহাদিগকে কোন না কোন শাস্তি সহ্য করিতে হয়।"[১১২]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছদে লেখক বলেছেন যে, আমাদের চারপাশে সব সময় স্পিরিট বা মৃত ব্যক্তির আত্মা ঘুরে বেড়ায় নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায়। স্পিরিচুয়ালিজম একটি বিজ্ঞান। এটি

Dhaka University Institutional Repository

অল্প সময়ে আয়ত্বে আনার মতো বিষয় নয়, তার জন্য বহু বছরব্যাপী কঠোর সাধনা করতে হয়।"[১১৩]

স্পিরিটগুলো তাদের কৃতকর্ম অনুসারে বিভিন্ন লোকে বাস করে। লেখক লিখেছেন–"মৃত্যু আমাদের জন্য দ্বিতীয় জীবন, মৃত্যুর বিষ আমাদের নিকটে মিষ্টি মধু অপেক্ষাও মধুরতম।"[১১৪]

চতুর্দশ পরিচ্ছদে স্টার ফ্লোরেন্স মেরিয়েটের সাথে পরলোকগত মিস আয়মীর আলাপ আলোচনার বিবরণ দিয়েছেন এবং মৃত্যুপরবর্তীকালে খোদা মানুষের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মিস আয়মী পরলোকে ৪/৫ জন শিশুর সেবায় নিয়োজিত। সে পরলোকের পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ বিবাহ রীতি সম্পর্কে বলেছেন এবং পরলোকের শাস্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, "হয়ত সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসর গত হইয়া যাইবে, তাহার পর সকলেই পাপের শাস্তি হইতে মুক্ত হইয়া খোদাকে পাইতে পারিবে। খোদা যখন মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার মধ্যে আত্মা ফুৎকার করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, মানবের আত্মা খোদার সত্তারই এক অংশ। খোদার সত্তার কোন অংশ নিশ্চয়ই চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইতে পারে না, তাহলে খোদার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।" [১১৫]

পঞ্চদশ পরিচ্ছদ হচ্ছে গ্রন্থের বিশেষ পরিচ্ছদ। এই পরিচ্ছদে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক জন স্টুয়াট মিল ও তাঁর প্রিয় শিষ্যা দার্শনিক হেরিয়েট মার্টিনার এর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জন স্টুয়াট মিল নাস্তিক ছিলেন। খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর মন সংশয়ে ছিল। মৃত্যুকালে তিনি বলেছিলেন–"যদি মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ কর, হীন স্বার্থপরতা পরিত্যাগ কর, যথাসাধ্য পরোপকার কর, প্রধান রিপুসমূহের বশীভূত না হও, প্রাণী মাত্রে দয়া কর, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর বা না কর ক্ষতি নাই, তথাপি মৃত্যুর পর উৎকৃষ্ট লোকপ্রাপ্ত হইবে।"[১১৬]

জন স্টুয়াট মিলের প্রিয় শিষ্য ছিলেন হেরিওট মার্টিনা। তিনি পরলোকের সুখকর শান্তিময় বর্ণনা দেন এবং পরিশেষে বলেন–"আপনারা বিশ্বাস করুণ, মানবের আত্মার স্থায়িত্বে কোন সন্দেহ নাই। বিশ্ব খোদার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।"[১১৭]

প্রবন্ধকার শেখ হবিবর রহমান সকল ধর্মগ্রন্থ এবং সকল শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের উপর গবেষণা চালিয়ে নিরলস শ্রম দিয়ে এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি তথ্য প্রমাণে ভরপুর। বৈচিত্রময় প্রতিভার অধিকারি লেখক শেখ হবিবর রহমানের এই গবেষণা গ্রন্থটি সর্বকালের আধুনিক গ্রন্থ বলে আমি মনে করি।

গোড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, খোদার শ্রেষ্ঠ দান বিবেক ও বিচারবুদ্ধি উপেক্ষা করে দেশের একদল মুসলমান যেভাবে প্রকৃত ইসলাম বিসর্জন দিয়ে ধ্বংসের পথে ছুটে চলছে, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে লিখিত 'গোড়ামি ও

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধবিশ্বাস' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থটি। গ্রন্থটির সর্বত্রই কোরান শরীফ ও হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে বলে জানা যায়।১১৮ গ্রন্থটি কোথাও খুজে পাওয়া যায়নি।

পরলোক প্রসঙ্গে–

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'পরলোক প্রসঙ্গে' শেখ হবিবর রহমান 'মরণের পরে'র গ্রন্থটির আলোকে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়। এটি 'মরণের পরে'র দ্বিতীয় খণ্ড কিন্তু প্রকাশিত হয়নি।

তাছাড়াও 'সত্যের সন্ধানে', 'ভাবিবার কথা', 'খোদাপ্রাপ্তির সোজাপথ' নামে শেখ হবিবর রহমান আরো তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে আব্দুল মজি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থগুলো তিনি প্রকাশ করে যেতে পারেননি। বর্তমানে পাণ্ডুলিপিগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না।'১১৯

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ সাহিত্য

গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

'গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ' শেখ হবিবর রহমানের একটি বিখ্যাত অনুবাদ কর্ম। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১আগস্ট ১৯৩৩ সালে কলকাতা থেকে। ২য় সংস্করণ ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। ৩য় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের জুন মাসে কিতাব মহল থেকে।

পারস্যের মশহুর কবি শেখ মছলেহ উদ্দীন শিরাজী-(১১৭৫-১২৯৬) পারস্য সম্রাট আবু বকর বিন সায়াদ এর নামানুসারে উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে যিনি 'শেখ সাদী' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তার অমর কাব্য 'গুলিস্তাঁ'র বাংলা অনুবাদের পথিকৃৎ কৃতিত্ব শেখ হবিবর রহমানের। ১২৫৮ সালে শেখ সাদী 'গুলিস্তাঁ' রচনা শেষ করেন। ইউরোপে সর্বপ্রথম আমস্টার্ডামে ল্যাটিন ভাষায়, জার্মানিতে ১৬৫২ ও ১৮৪৬ সালে, ১৮৮০ ও ১৮৮৫ সালে ফরাসি ভাষায় এবং ১৮০৮, ১৮৫১, ১৮৫২ ও ১৮৭৪ সালে ইংরেজিতে গুলিস্তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে মীর শের আলী কর্তৃক উর্দু ভাষায়, গুজরাটি ও ব্রজভাষায় "গুলিস্তাঁ"র অনুবাদ প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় শেখ হবিবর রহমানই গুলিস্তার প্রথম অনুবাদক। আমরা আগেই জেনেছি মাদ্রাসার শিক্ষাজীবনে হবিবর রহমান পারসি ভাষা ও সাহিত্যর অনুরক্ত ভক্ত ও পাঠক হয়ে ওঠেন। শিক্ষকের প্রশস্তি রচনায় তিনি যে পারসি বয়াত সে সময় রচনা করেছিলেন, তাতে তার পারসি-কাব্য-সাহিত্য প্রীতির

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো এবং তাঁর পক্ষেই শেখ সাদীর অমর কাব্য বাংলায় ভাষান্তর করা সম্ভব ছিল।

'উপক্রমনিকা'তে অনুবাদক শেখ হবিবর রহমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পারস্য দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির, বিশেষ করিয়া শেখ সা'দীর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তিনি উল্লেখ ক'রেন–

"যে পারস্য ভাষা অল্পদিন পূর্বেও এদেশে রাজভাষারূপে হিন্দু মুসলমানের সকলেরই বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল, যে ভাষার সাহিত্যে অসংখ্য কোকিল কবির সুকণ্ঠ বিনিসৃত ললিত ঝঙ্কারে মর্ত্তে অমরায় মাধুরী জাগাইয়া তুলিত, সময়ের নির্মম গতিতে আজ বিশ্বের দরবারে তাহার স্থান নাই। এতদিন এদেশের মুসলমান সমাজে ইহার যাহা একটু আদর ছিল, ভাষা সমস্যার সমাধানের উৎকট চেষ্টার মহিমায় অধুনা তাহাও লয় হইতে চলিয়াছে। ...পারস্যের অন্যান্য কবিদের কথা ভুলিতে পারিলেও মহাকবি শেখ সা'দী'কে জগতের মুসলমান ভুলিতে পারে না। তিনি জগতকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই প্রায় সাত শত বছর পরেও সুদূর বঙ্গ পল্লীর নিভৃত নিকেতনে বহু মুসলমান বালক-বালিকা তাহার পদ্মনামা হাতে লইয়া পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকে। তাহার গুলিস্তাঁ বুস্তাঁ না পড়িলে কেহ 'মুনশী মৌলভী' হইতে পারে না। সা'দীর দু একটি বয়াত আওড়াইতে না পারিলে মজলিশ জমকিয়া ওঠে না, বক্তৃতায় জোশ আসেনা। কী গভীর তত্ত্বকথা, কি কঠোর রাজনীতিকতা, কি চুটকির চাটনী, কি প্রেমের গভীরতা, কি সরস রসিকতা, কী সরল নীতিকথা, যাহাই অনুসন্ধান কর, সা'দীর রচনার মধ্যেই তাহাই প্রচুর রূপে প্রাপ্ত হইবে। সর্বত্র এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উপযোগী এত অধিক রচনা বোধ হয় বিশ্বের অন্য কোন কবিরই নাই। এত ব্যাপকভাবে, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাদৃত হইবার সৌভাগ্যও বোধ হয় অন্য কোন কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই। রাজদরবার হইতে কৃষকের সামান্য পর্ণকুটীর পর্যন্ত সর্বত্রই শেখ সা'দীর বয়াতের অবারিত গতি, সকলেই ইহা আবৃত্তি করিতে বিশেষ গৌরব অনুভব করেন।"[১২০]

Dhaka University Institutional Repository

'গুলিস্তাঁ' উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে লিখিত ছোট গল্প সমূহের সংকলন। প্রত্যেকটি গল্পের মাঝে মধ্যে সুললিত বয়াত দ্বারা বক্তব্য বিষয়কে গভীর তাৎপর্যবহ করে তোলা হয়েছে। মোট ৮টি অধ্যায়ে সর্বমোট ২৪০টি বিষয় গল্পাকারে 'গুলিস্তাঁ'তে স্থান পেয়েছে। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম হল–

দিবাচা বা অবতরণিকা

১. প্রথম অধ্যায় : রাজচরিত্র

২. দ্বিতীয় অধ্যায় : দরবেশ চরিত্র

৩. তৃতীয় অধ্যায় : কানায়াত বা সন্তোষ

৪. চতুর্থ অধ্যায় : নীরবতার উপকার

৫. পঞ্চম অধ্যায় : যৌবন ও ভালবাসা

৬. ষষ্ঠ অধ্যায় : বার্ধক্য

৭. সপ্তম অধ্যায় : শিক্ষার প্রভাব

৮. অষ্টম অধ্যায় : শেখ সাদীর তর্ক যুদ্ধ

৯. নবম অধ্যায় : নীতি ও শিষ্টাচার।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা-টীপ্পনীর মাধ্যমে মূল বিষয়কে অনুবাদে আরো স্পষ্ট করে তোলার সযত্ন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। শেখ সা'দীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জীও সংযোজিত হয়েছে শেষের চারটি পৃষ্ঠায়। সর্বমোট ৩৮৬ পৃষ্ঠার গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে একটি অনবদ্য সংযোজন এবং শেখ হবিবর রহমানের অমর অবদান।

অনুবাদ শৈলী বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়ে–

১. মূল গুলিস্তাঁর ভাষা প্রধানত গদ্য এবং বয়াতগুলো পদ্যে লিখিত। অনুবাদের এ-রীতিই অবলম্বন করা হয়েছে। লক্ষণীয়, বয়াতগুলো নানা ছন্দে রচিত, বুস্তাঁর ন্যায় একই ছন্দ-রীতির নয়। শেখ হবিবর রহমান মূলানুসারী বিভিন্ন ছন্দ-রীতিই অনুবাদে সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন।

২. বাঙালি পাঠকের সুবিধার্থে বয়াতগুলোর অনুবাদিত কাব্যাংশগুলো যতিভাগ করে মুদ্রিত হয়েছে অর্থাৎ পারসী ছন্দ-রীতি বাঙালি পাঠকের কাছে সহজ পাঠ্য করানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৩. বাংলা ভাষার প্রকাশ-রীতি (idiom)-কে বজায় রেখে মূল লিখনের মর্মানুবাদ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কবির ভাব বা বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করার জন্য ব্যাখ্যাস্বরূপ কিছু বেশি কথা লিখিত হয়েছে।

৪. অত্যুৎকৃষ্ট বিচেনায় ৩৫৫টি পারসি বয়াত বাংলা অক্ষরে পাদটীকায় লিখিত হয়েছে, যার সর্বমোট পংক্তিসংখ্যা ১০৯০।

Dhaka University Institutional Repository

৫. বাংলা সাহিত্য যে সমস্ত আরবি-ফারসি শব্দ, সাধারণত দন্ত্য 'স' দিয়ে লিখিত হ'তো সেগুলো 'স' দিয়ে এবং অন্যান্য শব্দ সাধারনের পড়ার সুবিধার্থে 'ছ' দিয়েই লিখিত হয়েছে।

উপক্রমণিকার উপান্তে অনুবাদক শেখ হবিবর রহমান বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন–

"এই অনুবাদকালে আমি পদে পদে নিজের অক্ষমতা অজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি এবং সে কথা অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতেছি। আমি মূল সৌন্দর্য রক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, ইহাই আমার একমাত্র কৈফিয়ত। আমার আশঙ্কা হইতেছে এই অনুবাদের প্রকাশের দ্বারা হয়ত আমি বহুক্ষেত্রেই মহাগ্রন্থ গুলিস্তার সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই। মহাকবি শেখ সা'দীর আত্মার উদ্দেশ্যে আমার সহস্র সালাম। আশা করি তিনি তাহার এই অকিঞ্চন ভক্তের অজ্ঞতাজনিত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"[১২১]

'গুলিস্তাঁ' শেখ হবিবর রহমানের অনবদ্য অনুবাদকর্ম। শেখ সাদী'র অমর এই কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এই দেশের পাঠক সমাজকে যেমন তিনি নতুন সাহিত্যের সন্ধান দিয়েছেন তেমনি পাঠক ওই সাহিত্যপাঠে নিজেদের ধনি করেছেন। সাবলীল ভাষার এই অনুবাদকর্মটি নিঃন্দহে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের বড় প্রাপ্তি।

সদ্ভাব কুসুম বা সা'দীর কালাম

"সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম" শেখ হবিবর রহমানের এক অনবদ্য অনূদিত কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন শেখ ফজলর রহমান। গ্রন্থটি বুনাগাতি, যশোহর হতে ২০ জানুয়ারি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির কপি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় ১৯২৭

Dhaka University Institutional Repository

সালে ২য় সংস্করণ এবং ৩য় সংস্করণ ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশের বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় কিন্তু বইটি আর প্রকাশিত হয়নি বলে জানা যায়।

শেখ সাদীর সুপ্রসিদ্ধ 'গুলিস্তাঁ' গ্রন্থ থেকে নীতিপূর্ণ কবিতাগুলোর অনুবাদ সাদীর কালাম এ পরিবেশিত হয়েছে। নির্বাচিত শতাধিক বয়াত বাংলা অক্ষরে লিখিত এবং সাথে সাথে বাংলা কবিতায় অনুবাদ করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন উল্লেখ করেছেন–

"দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় শেখ সা'দীর রচনাবলী নীতি উপদেশ প্রদান করে। অনুবাদে ভাবের ঐক্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমার এই অনুবাদে মূল বয়াতের সৌন্দর্য যে বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ন হইয়াছে তাহতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি মূল সৌন্দর্য রক্ষার জন্যক্রটি করি নাই, ইহাই আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ।"[১২২]

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলা হয়–

"(অনুদিতগুলো) যাহাতে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে পড়িবার সুবিধা হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যতি বিভাগ করিয়া মুদ্রিত হইল। 'সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম' উৎসর্গীত হয়েছে 'গৌরবোন্নত ফুলতলা মাদ্রসার সংস্থাপক, সমাজের অক্লান্তকর্মী আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন জনাব মৌলভী মোহাম্মদ কাছেম সাহেবের কর কমলে।"[১২৩]

১৩৩৩ কার্তিক সওগাত-এ "সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম"-এর অনুবাদ শৈলী সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনায় উল্লেখ করা হয়– 'ভাবকে চরণ মিলাইয়া দিতে পারিলেই কাব্যানুবাদ হয় না। সৌন্দর্যগ্রাহীতাও তার জন্য আবশ্যক। এর প্রতি উত্তরে শেখ হবিবর রহমান পরবর্তী 'সওগাত'-এ 'বাদ প্রতিবাদ' কলামে উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

ক'রেন– "সমাজ কি সওগাত কি সমালোচকের কথাকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে?"[১২৪]

গ্রন্থের প্রস্তাবনায় শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন–

"পারস্যের অমর কবি শেখ সাদী (আঃ) এর নাম কেনা শুনিয়াছেন? তাঁহার গ্রন্থগুলি সমগ্র জগতে দীর্ঘকাল ধরিয়া সর্বসাধারণ কর্তৃক যেরূপভাবে পঠিত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে, অন্য কোন দেশের কোন কবির গ্রন্থ তদ্রুপ হইয়াছে কিনা দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় শেখ সাদীর রচনাবলী নীতি উপদেশ প্রদান করে।

উক্ত মহাকবি শেখ সাদীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গুলিস্তা হইতে কতকগুলি নীতি উপদেশ এই ক্ষুদ্র পুস্তক 'সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কলামে' প্রকাশ করা হইল। উপরে মূল বয়াতটি বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া নিম্নে কবিতায় তাঁহার অনুবাদ দেয়া হইয়াছে। অনুবাদে ভাবের ঐক্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমার এই অনুবাদে মূল বয়াতের সৌন্দর্য যে বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি মূল সৌন্দর্য রক্ষ্যার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; ইহাই আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ।

বাঙ্গলা অক্ষরে ফারসী বয়াত ঠিকভাবে লিখিত হওয়া সম্ভব নহে। কোন ফারসী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে পড়িলে উচ্চারণ নির্ভুল হইতে পারিবে। আরবী বা ফারসী ভাষার শব্দে 'স' স্থলে ছ অক্ষরের উচ্চারণ হইবে। আশা করি আমার এই সামান্য পুস্তকখানি সুধিবৃন্দের দৃষ্টি লাভে ধন্য হইবে।"[১২৫]

দ্বিতীয় সংস্করণে শেখ হবিবর রহমান ভূমিকায় লিখেছেন–

"দয়াময় খোদা তায়ালার অনুগ্রহে 'সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম' নিঃশেষিত হওয়ায় উহা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল। বর্তমান সংস্করণে দু'একটি অনুবাদের সামান্য পরিবর্তন করিয়াছি। কবিতাগুলি যাহাতে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে পড়িবার সুবিধা হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যতি বিভাগ করিয়া মুদ্রিত হইল।"[১২৬]

Dhaka University Institutional Repository

বইটি উৎসর্গ করেছেন মৌলভী মোহাম্মদ আকরাম সাহেবকে। উৎসর্গ পাতায় শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন−

" গৌরবোন্নত ফুলতলা মাদ্রাসার সংস্থাপন সমাজের অক্লান্তকর্মী আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন জনাব মৌলভী মোহাম্মদ কাছেম সাহেবের করকমলে।"[১২৭]

উৎসর্গ পাতার পরের পাতায় সাদীর কবিতার দুটি পংক্তি লিখে তার অনুবাদ দিয়েছেন একটু নিচে−

মূল−

সায়ীদ আওয়ারাদ কওলে সাদী বজায়ে

কে তকফিরে মোলক আস্ত ও তদবির ও রায়ে

অনুবাদ−

ভাগ্যবান জানে সাদীর কালাম

অনুযায়ী সদা করে কাজ

জ্ঞান উপদেশ দেশের কল্যাণ

সকলি পাইবে এরই মাঝ।[১২৮]

তারপর প্রথম পৃষ্টা থেকে শুরু হয়েছে সাদীর কাব্য ও হবিবর রহমানের অনুবাদ। প্রথম কবিতাতেই মহান স্রষ্টার গুনগান করা হয়েছে। তাঁর মহিমা যে কত উর্ধ্বে, তা কবির কল্পনা ধরতে পারে না। কবি নিজেকে মহান স্রষ্টার কাছে খুবই তুচ্ছভাবে উপস্থাপন করেছেন।

মূল−

বালাগাল ওলা বে কামালিহা

কাশাফাদ্দোজা বে জামালিহী

হাসানাত জামিয়ে খেশালিহী

সল্লু আলাইহে অলিহী

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ–

অতি উচ্চ তব মহিমা মহান

পূর্ণতার হেতু হে নবী

তব মাধুরিতে আমার আঁধার

বিদূরিত আজি রে সবি

অতি সুন্দর অতিব সুন্দর

তোমার সকল স্বভাবই

সহস্র দুরুদ উপরে তোমার

হে নবী রসুলে আরবী ।[১২৯]

কবি মহান আল্লাহকে সম্বোধন করে চতুর্থ কবিতায় লিখেছেন যে, চাঁদ-সূর্য-নক্ষত্র সব কিছুই তোমার বন্দেগীতে ব্যস্ত দিবা-রাত্রি। সাদীর কলাম কাব্যের সপ্তম এবং অষ্টম কবিতায় মৃত্যু-ভাবনায় তাড়িত হওয়ার জন্য জানিয়েছেন এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতিমূলক সব কাজ সম্পুর্ণ করার উপদেশ দিয়েছেন। দশ কবিতায় কবি রুটির অর্ধেক অর্থাৎ খাবারের অর্ধেক দারিদ্রদের মাঝে বিলীয়ে দিতে বলেছেন। মানবতাবাদী কবি শেখ সাদী দ্বাদশ কবিতায় বুঝাতে চেয়েছেন যে, যেহেতু মানুষ এক আদমের বংশ, তাই আদম শরীরের এক অংশে ব্যথা পেলে সকল আদম শরীর ব্যথা পায়। যথা–

মূল–

তুকেজ মেহনতে দিগরা বেগমী

নশায়দ কেনামত্ নেহদ্ আদমী

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ–

পরের বিপদে থাক উদাসীন কেমনে
মানব নামের অযোগ্য তুমি এই ভুবনে। [১৩০]

কবি তাঁর দশম কবিতায় খাঁটি বন্ধুত্বের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, সম্পদের সখা কখনো সখা হতে পারে না অর্থাৎ অর্থের লেনদেন দিয়ে বন্ধুত্ব হয় না। বিপদের কালে যে বন্ধুর হাত ধরে পাশে এসে দাঁড়ায় ছায়ার মতো; সেই হলো প্রকৃত বন্ধু। তাই কবি লিখেছেন–

বন্ধু সেই জন, বিপদের কালে যে ধরে হাত
ছায়ার মতন তখনো যে পাশে পাশে রয়[১৩১]

মহান মনের অধিকারী কবি মানুষকে কবিতার মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ কারো কাছ থেকে বেদনা পেলেও সে বেদনা যেন পুষে রাখা না হয়। ভুলেও যেন তাঁর উপর বিরক্ত না হয়। কবি বিপদে ধৈর্য ধরতে বলেছেন; দোষী ব্যাক্তিকে ক্ষমা করতে বলেছেন। মাটির সাথে মিশে যাবার আগে নিজেকে মাটি করতে বলেছেন। কত রাজা, রাজ্য, ধন এই পৃথিবীতে বিলীন হয়ে গেছে। সেই অভিমান কোথায় লুকিয়েছে মানুষ? তাদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ আজ অন্যের হাতে; একদিন তাও চলে যাবে অন্যের হাতে। কবি তাই তাঁর কবিতায় ধন-সম্পদ আর শক্তির গর্ব করতে বারণ করেছেন বারবার। নিজেকে দারিদ্রের সেবায় বিলীয়ে দিতে বলেছেন। কবি রাজার ক্ষমতা সম্পর্কে লিখেছেন যে, ভিখারি যদিও রাজার অধীন; তবুও রাজা তাঁর সেবক ব্যতিত আর কিছুই নন। কবি উদাহরণ দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন– যেমন রাখালের তরে মেষ পাল নয়, মেষপালের দেখাশুনার জন্য ব্যস্ত থাকে রাখাল। তাইতো সাদী লিখেছেন–

"পাদ্‌শাহ পাশবানে দরবেশস্ত
গরচে রমেশ বফর্রে দওলতে উস্ত"[১৩২]

গায়ের শক্তিতে যে লড়াই করে, কবি তাকে বীর কিংবা মহাবীর বলেননি। যে ব্যাক্তি ক্রোধকে দমন করতে পারে, কবি তাকেই মহাবীর বলেছেন। কবি তাঁর কাব্যে মুর্খদের কাছে অর্থ এবং জ্ঞানীদের আর্থিক সমস্যা দেখে ব্যতীত হয়েছেন। কবি মহৎ ও জ্ঞানী মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য লিখেছেন–

মূল–

বোজর্গশ্‌ নখানন্দ আহলেখেরদ্‌
কে নামে বোজর গাঁ রাজেশদি বরদ

অনুবাদ–

মহৎ তাহারে কভু জ্ঞানীগণ নাহি কয়
মহতের নাম যারা অশ্রদ্ধার সাথে লয়।[১৩৩]

ধন জন সিংহাসন কিছুই থাকবে না। সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। শুধু মানব সেবা আর রেখে যাওয়া কাজ ছাড়া সব কিছুই অন্যের দখলে চলে যাবে। কবি তাঁর বিভিন্ন কাব্যে এ-কথা বলে গেছেন এবং শ্রেষ্ট মানবের নিদর্শন হিসেবে বলেছেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

যারা খোদার পথের পথিক, তারা অন্যের মনে কখনো কষ্ট দিতে পারে না। বন্ধুর সাথে ঝগরা বিবাদ কিংবা যুদ্ধ করার চিন্তাও করতে পারে না।

কবি নিন্দাকারীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন, যে অপরের নিন্দা তোমার কাছে করতে পারে, সে তোমার নিন্দাও অপরের কাছে করতে পারে।

মূল–

ঘরকে আয়বে দিগরাঁ পেশে তু আওরদ্ ও শোমর্দ্দ

বে গোঁমা আয়রে তু পেশে দিগরাঁ যাহাদ বোর্দ্দ

অনুবাদ–

কহে যে পরের দোষ তোমার নিকটে

তব নিন্দা অপরে সে কহে অকপটে।[১৩৪]

কবি আহারাদি সম্পর্কেও লিখেছেন। তিনি মানুষকে অল্প আহার করতে বলেছেন। অল্প আহারের অভ্যাস থাকলে, দুর্দিনেও সে বিপদে পড়বে না। আর বেশি আহারকারীর দুর্দিন দেখা দিলে সে সামাল দিতে পারে না। কবি আহারকে জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে আহারের কথা বলেছেন–

মূল–

খোর্দ্দন ববায়ে জীওন ও জেকর কর্দ্দনস্ত

তু মোতকদ কে জীস্তন বরায়ে খোদ্দনাস্ত

অর্থাৎ–

আহারের তরে কভু নহে এ জীবন

আহার জীবন আর সাধনা কারণ। [১৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

অভাব-অনটনে দিন যায় অনেক মানুষের। কর্মহীনতার কারণে তাদের কত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় সমাজে। মানুষ নানা পেশা গ্রহণ করে এই অভাব মেটাতে। এই জন্যেই আজ পৃথিবী চলছে সম্মুখ পানে। না হয় থমকে থাকতো সব। অভাব থাকলেও মানুষের স্বভাব যেন নষ্ট না হয়, সে কথা কবি তার কবিতায় বারেবার বলেছেন। কবি আরো বলেছেন যে, বিপদে পড়েও কেউ যেন ভিক্ষার পথে না যায়। এই পথে গেলে অভাব কোন কালে যাবে না। জীবনে শান্তির জন্য অর্থের দরকার। অর্থ সঞ্চয়ের জন্য এ জীবন নয়। আমাদের সমাজে এই দুই শ্রেণির মানুষ আছে। এক শ্রেণির মানুষ শুধু অর্থ সঞ্চয় করে ক'রে জীবনটা নিশেষ করে দেয়। আরেক-শ্রেণি জীবন ও জগতকে ভোগ করার জন্য সঞ্চয় করে থাকে। কবি তাই আক্ষেপ করে ব'লেছেন–

মূল–

"করিমারা বদাস্ত আন্দর দেরম নিস্ত

খোদা ওন্দানে নিয়ামত বা করম নিস্ত।

অনুবাদ–

দয়া যার আছে

টাকা তার কাছে নাইরে

ধনির হৃদয়ে

দয়ার নাহিক ঠাঁইরে[৩৬]

নীতি-উপদেশ, প্রেম-ভালবাসা ও সমাজ-সংস্কার নিয়ে শেখ সাদীর ১০৬ টি কবিতা অনুবাদ করে শেখ হবিবর রহমান 'সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কাব্যগুলো আবাল-বৃদ্ধ-জাত-দেশ- কাল-পাত্র ভেদে সবার প্রয়োজন মিটাতে পেরেছে। সাধক কবি শেখ সাদীর কাব্যের ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার ঠিক রেখে অনুবাদে শেখ হবিবর রহমান যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। সহজ সরল ভাষায় ছন্দবদ্ধ কবিতাগুলো পাঠককে যেমনি সুচেতনা যোগায় তেমনি সমালোচকদের মুগ্ধ ও অভিভূত করে।

Dhaka University Institutional Repository

গুলিস্তাঁর গল্প

শেখ হবিবর রহমানের আরো একটি বিখ্যাত অনুবাদ কর্ম 'গুলিস্তার গল্প'। শেখ সাদীর 'গুলিস্তা' কাব্যের ৭৫টি পরিচ্ছদ গল্প আকারে বাংলায় অনুবাদ করে এ-গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন তিনি। মূল বয়েতসমূহ প্রতিটি গল্পের সাথে বাংলায় উচ্চারণ ও অনুবাদসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মোট ৮টি অধ্যায়ে পৃথক পৃথক শিরোনামে গল্পসমুহ পরিবেশিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় :	'রাজচরিত্র'। গল্প সংখ্যা ১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় :	'দরবেশ চরিত'। গল্প সংখ্যা ২২
তৃতীয় অধ্যায় :	'সন্তোষ'। গল্প সংখ্যা ১৩
চতুর্থ অধ্যায় :	'নীরবতার উপকার'। গল্প সংখ্যা ৭
পঞ্চম অধ্যায় :	'যৌবন ও ভালবাসা'। গল্প সংখ্যা ৪
ষষ্ঠ অধ্যায় :	*বার্ধক্য। গল্প সংখ্যা ২*
সপ্তম অধ্যায় :	'শিক্ষার প্রভাব'। গল্প সংখ্যা ১০টি
অষ্টম অধ্যায় :	'দারিদ্র ও ধনবত্তা'। গল্প ১

'গ্রন্থকারের দুটি কথা' শিরোনামে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন উল্লেখ করেছেন–

> *'পুস্তকখানি যতদুর সম্ভব সরল ও বালক বালিকাগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। অনুবাদে সহজ সরল শব্দের ব্যবহার এবং বর্ণনাভঙ্গিতে শিশুতোষ আবহ বিনির্মাণের*

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সে অর্থে গ্রন্থ সৃজনশীল মৌলিক সাহিত্যকর্মের পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে। নমুনা হিসেবে ১৪ নং গল্পটির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো–

"একটি গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হওয়ায় বাদশা নও শেরওয়ার মন্ত্রীগণদের মন্ত্রিসভায় সমবেত হইয়া পরামর্শকার্য্যে নিযুক্ত করেছিলেন। এক এক জন এক এক রূপ অভিমত ব্যক্ত করিতে ছিলেন, কাজেই কোন বিষয়ের কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইল না। অন্য মন্ত্রীগণের ন্যায় বাদশাও তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিলেন। বোজর্চমেহের নামক বিখ্যাত মন্ত্রী বাদশার মতই সমর্থন করিলেন।

সভাঅন্তে অন্যান্য মন্ত্রীগণ বোজর্চমেহেরকে বলিলেন–আপনি অন্যান্য জ্ঞানী সচীবগণের মতের প্রতিকূলে বাদশাকে সমর্থন করিলেন কেন? তাঁহার মত এমন কি মূল্যবান ছিল?

বোজর্চমেহের উওর করিলেন–সমস্যাটি অতি গুরুতর ভবিষতে কি ঘটিবে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। আপনারা যিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তদানুসারে কাজ করিলে ফল ভাল কি মন্দ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আমিও নিঃসন্দেহরূপে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ ক্ষেত্রে বাদশাহের মতের সমর্থনই সঙ্গত ও নিরাপদ মনে করিলাম। কারণ তাহা হইলে পরিণাম ভাল না হইলেও ইহা বাদশাহের নিজেরই মত বলিয়া কোন বিপদের বা অপ্রীতিভাজন হইবার ভয় থকিবে না। একটি বয়াত আছে–

রাজার মতের বিপরীত কথা বলাটা
তরবারি তলে রাখা যেন নিজ গলাটা
রাজা ক'ন যদি দিন নহে ইহা রজনী,
ঐ তারা চাঁদ বলা চাই ভাই তখনি।

পাদটীকা ঃ

খেলাফে রায়ে সুলতান রায়ে জুস্তন্
বখনে খেশ বাশদ দস্ত শোস্তন
আগর শাহ রোজরা গোয়াদ শবস্তইঁ
বে বায়দ গোফ্‌তন ইনক মাহ ও পরভিঁ।[১৩৭]

এই মোসাহেবী নীতিটা কখনই কর্তব্যপরায়ণ ও তেজস্বী ব্যক্তিগণ গ্রহণ করতে পারেন না। জগতে এক শ্রেণীর লোক এই নীতির অনুসরণ করে থাকে। উপরোক্ত গল্পে বোজর্চমেহেরের এই নীতি গ্রহণ অন্যায় হয়নি, কারণ তাঁর উক্তিতেই ব্যক্ত হয়েছে।

'গুলিস্তাঁর গল্প' শেখ হবিবর রহমানের অনবদ্য এক সৃষ্টি। কাব্যকে গল্পে রূপান্তর করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন লেখক নৈপুণ্যের সাথে। সহজ-সরল ভাষায় ও সাবলীল বাক্যগঠনে সাধারণ পাঠকেরা অনায়াশে বুঝতে পারে। আটটি অধ্যায়ে আটটি গল্প, প্রতিটি গল্পই ভিন্ন ধরণের।

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, শেখ হবিবর রহমানের 'বুস্তাঁর বঙ্গানূবাদ' গ্রন্থটি দুস্প্রাপ্য। ফলে এ-গ্রন্থ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞাপন থেকে দেখা যায় এ-গ্রন্থের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে জানা যায়, এ অনুবাদ গ্রন্থটি ১৯৩৩ সালে 'গুলিস্তা'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সমকালেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং গুলিস্তার ন্যায় বুস্তার অনুবাদে আশীর্বানী লিখেছিলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। অনুবাদ কৌশল ও উপস্থাপনা গুলিস্তার বঙ্গানুবাদের অনুরূপ এটাও ধারণা করা হয়।[১৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

বুস্তাঁর গল্প

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত জীবনী সিরিজমালায় আব্দুল মজিদ রচিত 'শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ও তাঁর অবদান' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, শেখ হবিবর রহমানের এ অনুবাদগ্রন্থখানিও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। 'গুলিস্তার গল্প' গ্রন্থের অনুরূপ এ গ্রন্থখানির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।[১৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ

শেখ হবিবর রহমানের আত্মজীবনীমুলক-গ্রন্থ 'আমার সাহিত্য জীবন'। ১৯২৭ সালে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। স্বভাবতই ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সময়ে তাঁর সহিত্যিক-জীবনের বিবৃতি এতে ঠাঁই পেয়েছে। সে সময় তাঁর বয়স ছিলো ৩৬ বছর। এরপরও তিনি ৩৪ বছর জীবনলাভ করেছিলেন। সুতরাং এটি একটি অসম্পূর্ণ জীবন-কাহিনী। শেখ হবিবর রহমানের সক্রিয় সাহিত্যিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে এ-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তার অধিকাংশ গ্রন্থের প্রকাশ ও রচনাকাল ১৯২৯ সালের মধ্যেই। সুতরাং এটি তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আত্মজীবনীমূলক এই গ্রন্থে শেখ হবিবর রহমানের ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক জীবন-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এটি সম্পূর্ণ তাঁর জীবন-সাধনার একটি বিশেষ দিকেরই বিবৃতি।[১৪০]

এই আত্মজীবনীমুলক-গ্রন্থের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুসাহিত্যিক এস.ওয়াজেদ আলী লিখেছেন–

"যে কয়েকজন জাতিগতপ্রাণ সাহিত্যিকের নিকট আমাদের সমাজ বিশেষভাবে ঋণী, বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক তাদের অন্যতম। নানা অভাব-অসুবিধা সত্ত্বেও যেরূপ অক্লান্তভাবে তিনি সাহিত্য-সাধনায় আজীবন ব্যাপৃত আছেন, তার তুলনা আমাদের সমাজে কেন, যে কোন সমাজে বিরল। লেখক সাহেবের এই সাধনা যে ব্যর্থ হয়নি, সে কথা তাঁর গ্রন্থসমূহের পাঠকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন। তার গদ্য এবং পদ্য পুস্তকগুলি যে

Dhaka University Institutional Repository

অসামান্য শক্তির পরিচায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেগুলি পড়ে যে নির্ম্মল আনন্দ আমি পেয়েছি, তার জন্য মুক্তকণ্ঠে শেখ সাহেবের নিকট আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শেখ সাহেবের ন্যায় একাগ্র সাহিত্য-সাধকের জীবন কাহিনীর মূল্য অপরিমেয়। অসংখ্য পাঠক তার এই আত্মচরিত পড়ে নূতন আশা, নুতন প্রেরণা, নুতন উদ্দীপনা লাভ করবেন। পরশমণি পাথরের মত তাঁর এই গ্রন্থ অসংখ্য তরুণ সাহিত্য-সাধককে প্রকৃত সাহিত্যিকে পরিণত করবে। অবিচলিত সাধনার মহামন্ত্র তাঁর কাছ থেকে লাভ করে যথা সময়ে তারা সাফল্যের বিজয়-মাল্যে ভূষিত হবে। লেখক সাহেবের দরবেশ-বিরল সাধনা বঙ্গের উদার মোসলেম সমাজকেও সাহিত্যের বিচিত্র ফলে-ফুলে শোভিত করেতুলবে। তার লেখনী সার্থক হবে।

বক্ষ্যমান গ্রন্থ কেবল সাহিত্য-সাধকের পথপ্রদর্শক হিসাবে মূল্যবান নয়। লেখক সাহেব মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের যে ছবি তাঁর এই গ্রন্থে এঁকেছেন, তার তুলনা আমাদের সাহিত্যে নাই বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবেনা। তার এই ছবির জন্য পরবর্তী যুগের সুধি সমাজ তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারবেন না। আমাদের সমাজের প্রকৃত ছবি আমাদের সমাজে পাওয়া যায় না বলে অনেক সময় আমরা আক্ষেপ করে থাকি। লেখক সাহেবের এই গ্রন্থ সে অভাব যে অনেক পরিমাণে পূরণ করতে পারবে তা নিঃসন্দেহ রূপেই বলা যেতে পারে। আর সেই জন্যই মনে হয়, এই পুস্তকাটি বাঙ্গালা সাহিত্যে একটী স্থায়ী আসন লাভ করবে।

শেখ সাহেবের মত একনিষ্ঠ সাহিত্যিক সাধক যে সমাজের এখনও স্ব-শরীরে বিরাজ করছেন, সে সমাজের যে একটা ভবিষৎ আছে তাতে সন্দেহ করবার কোন যুক্তি যুক্ত কারণ নাই। সামাজের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করে যখন আমাদের মন শোকে মুহ্যমান হয় এবং আমাদের কর্ম্মশক্তি অবশ হয়ে আসে, তখন লেখক সাহেবের একাগ্রতার এবং নিষ্ঠুর জলন্ত কাহিনী পড়ে আমরা নুতন আশা নুতন উদ্যম লাভ করবো নুতন বলে আমাদের বাহু বলীয়ান হয়ে উঠবে। আজ তাই আমি মুক্তকণ্ঠে শেখ হবিবর রহমান সাহেবকে আমাদের সমাজের একজন গৌরবান্বিত পথ প্রদর্শক রূপে আভনন্দিত করছি।"[১৪১]

Dhaka University Institutional Repository

'সহজ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় বাংলা আত্মচরিত জাতীয় রচনায় খুব কম দেখা যায়। সমকালীন একজন সাহিত্য-সমালোচকের এ-মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ লক্ষ করা যায়, তথ্য ও কবিত্ব হাত ধরাধরি করে আনন্দলোকে যাত্রা করেছে। আরো লক্ষণীয় প্রেমই সিদ্ধির সোপান, সাহিত্য ক্ষেত্রেও একথা সমান ভাবে সত্য। প্রেম ব্যতীত আর যে কাজই হউক, সাহিত্য-সাধনা চলতে পারে না। শেখ হবিবর রহমান তাঁর আত্মজীবনী 'আমার সাহিত্য-জীবনী'তে কবিতার শিল্পরূপ সম্পর্কে লিখেছেন–

> *সৌন্দর্যের অনুভূতি, সৌন্দর্য্য উপভোগ, কাব্য ও কবিতার সর্ব্বশ্রেষ্ট অবলম্বন। ভাবুকের মনের ভিতর যে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণেই আমাদের মন বাঁধা পড়ে থাকে। যার মধ্যে যতখটুকু কবিত্ব আছে, সে ততখানি সৌন্দর্য্যের অনুরাগী, আবার যে যে পরিমাণে সৌন্দর্য্যের অনুরাগী, সে সেই পরিমাণে কাব্য ও কবিতার ভক্ত। যে অন্তরে অন্তরে কবি নহে, সে কখনোই কাব্যের সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারে না। আমরা কবিতা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বলি, আহা কি সুন্দর! এই সৌন্দর্য্য কবি-হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে না, সে কাব্য বুঝিতে পারে না। কবিতা সুন্দরীর সিংহ-দুয়ারে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। শুধু ভিতরের সৌন্দর্য্যে নহে, বাহিরের সৌন্দর্য্যেও কবি-হৃদয় আত্মহারা হইয়া থাকে। এই জড় প্রকৃতির দিকে দিকে প্রতিনিয়ত যে সৌন্দর্য্যের লীলাখেলা চলিতেছে, কবি-হৃদয় তাহাতে ডুবিয়া থাকে, 'বিহ্বল হইয়া থাকে! এই সৌন্দর্য্য তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া উৎসারিত হয়। বিশ্ববীণার তারে তারে প্রতিনিয়ত যে মহাসঙ্গীত গীত হইতেছে, তাঁহার কবিতার মধ্যে তাহারই প্রতিধক্ষনি নূতন সুরে বাজিয়া থাকে। কত নির্জ্জন রজনী কবিতা পড়িয়া পড়িয়া কাটাইয়াছি কতদিন গভীর নীরবতার মধ্যে একাকী দূর অনন্তে নিজেকে ডুবাইয়া দিয় স্তব্ধ*

Dhaka University Institutional Repository

হইয়া ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। জগত ভুলিয়া, বিশ্ব সংসার ভুলিয়া নিজেকে কোথায় বিলীন করিয়া দিয়াছি।" ১৪২

আত্মচরিত যে কথা-সাহিত্যের মতো সুখপাঠ্য হয় 'আমার সাহিত্য জীবন' পাঠ করলে তা বোঝা যায়। এ-গ্রন্থে সমকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত-সমাজ জীবনের উপাদান ছড়িয়ে আছে। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমকালীন অনেক সাহিত্যক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য এ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। একজন লেখকের বই প্রকাশে কত যে বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হয় এবং প্রকাশকরা লেখকের প্রাপ্য দিতে কত যে কুণ্ঠাবোধ করে, তা লেখক ও প্রকাশকের ইতিহাস খুঁজলে জানা যাবে। তৎকালীন একজন লেখকের বিব্রতকর জীবনের যে চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন, আজো তা কমবেশী বিদ্যমান–

"বহি ছাপিয়া কলিকাতার পথে পথে ভিখারী ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়ানো, প্রকাশকের নিকট নির্ল্লিজ্জ ধন্না দেওয়া, প্রেসে দুই বেলা ঘোরা ফেরা করিয়া বকিয়া, ঝকিয়া মাথা খারাপ করা" ।১৪৩

'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থখানির করেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এখানে নতুন লেখক ও কবিদের লক্ষ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাদটীকায় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদত্ত হয়েছে। শেখ হবিবর রহমান তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এসব পরামর্শ প্রদান করেছেন – যা নতুন সাহিত্যিকদের পথ-নির্দেশনা হিসেবে মূল্যবান বৈকি। অনুরূপ একটি পরামর্শ পাদটীকায় বর্ণিত হয়েছে–

Dhaka University Institutional Repository

"নূতন লেখকগণের নিকট আমার অনুরোধ ভিতর হইতে প্রেরণা না পাইলে কেহ যেন কবিতা লিখিতে চেষ্টা না করেন; কারণ সেরূপ অবস্থায় প্রকৃত কবিতা হয় না। পক্ষান্তরে অন্তরে যখন কবিতা লিখিবার আগ্রহ জন্মে, মনের কথা সুরে সুরে বাহিরে প্রতিধ্বনি হইতে চায়, সাধ্যমত কবিতা লিখিবার সে সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নহে। কবিতা লেখকগণকে অনেকে উপহাস ও অবজ্ঞা করেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত কবিতা ও কবিত্বের মূল্য বিশ্বের দরবারে কখনই কম নহে।"[১৪৪]

'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থটি পরিপূর্ণ আত্মজীবনী নয়। এই গ্রন্থটিতে লেখকের ৩৬ বছরের জীবনকার কথা এসেছে। রচনার পরেও লেখক ৩৪ বছর বেঁচে ছিলেন। তবে তাঁর সাহিত্য রচনার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। লেখক তাঁর শৈশব, কৈশোরের কথা যেমন বলেছেন তেমনি স্কুল জীবন, সাহিত্য চর্চার সূচনা ও অন্যান্য এমনকি সংসার জীবনের কথাও অকপটে বলেছেন। লেখক আত্মজীবনীতে তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়দের কথা ও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বারবার। সাবলীল ভাবে নিজের ভুলগুলোর কথাও স্বীকার করেছেন প্রতি পদে পদে। আত্মজীবনীতে একজন সহজ-সরল সাদামাটা জীবন-যাপনে অভ্যস্থ অসাধারণ এক বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিকে খুঁজে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. অধ্যাপক সুশান্ত সরকার। সমকালীন প্রেক্ষাপট, শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্যের রূপরেখা, জন্মশতবার্ষিকী– শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, খুলনা একাডেমি, ১০ জানুয়ারি-১৯৯১, পৃষ্ঠা–৮

২. ঐ, পৃষ্ঠা–১১

৩. ঐ

৪. ঐ

৫. মোহাম্মদী, ২৫ মাঘ ১৩১৯

৬. মাসিক হাকিম, আগষ্ট ১৯১৩

৭. The Bengoli, 10th February, 1913

৮. আব্দুল মজিদ। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (জীবনীমালা সিরিজ), বাংলা একাডেমী, পৃষ্টা– ৩১

৯. দৈনিক সঞ্জীবনী, ১৭ আশ্বিন, ১৩১৯

১০. দৈনিক হাবলুল মতিন, ৬ ফাল্গুন, ১৩১৯

১১. শেখ হবিবর রহমান। ভূমিকা। বাঁশরী (কাব্যগ্রন্থ), ১ম সংস্করণ, ১৯১৭, মখদুম লাইব্রেরী, কলকাতা।

১২. শেখ হবিবর রহমান। আমার সাহিত্য-জীবন, বুনাগাতি, যশোর, প্রথম সংস্করণ–১৯২৭, পৃষ্ঠা–৮২

১৩. শেখ হবিবর রহমান। সন্ধ্যা কবিতা। বাঁশরী (কাব্যগ্রন্থ), ১ম সংস্করণ, ১৯১৭, মখদুম লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৮

১৪. ড. আনিসুজ্জামান। ভূমিকা, শেখ হবিবর রহমান গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৭০, পৃষ্ঠা ৮–৯

১৫. শেখ হবিবর রহমান। আ. সা.জী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩০–৩১

১৬. আবুল কালাম সামসুদ্দীন। বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান, সওগাত, চতুর্থ বর্ষ, ৪ র্থ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৩

১৭. আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা– ৩৫

১৮. মৌলবী আব্দুল লতিফ বি এ। ভূমিকা "কোহিনূর কাব্য", দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯২৬, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯.শ্রীযুক্ত বাবু রামাদাস ভট্টাচার্য। ঐ

২০.বিদ্যাভূষণ বি এ। ঐ

২১.শ্রী তারকানাথ কাব্যতীর্থ তর্কবাচস্পতি। ঐ

২২.খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ। ঐ

২৩. শেখ হবিবর রহমান। ভূমিকা। 'গুলশান' কাব্যগ্রন্থ, ১৯২৮, মখদুম লাইব্রেরি, কলকাতা।

২৪.ড. আনিসুজ্জামন সম্পাদিত। ভূমিকা। পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা- ৯

২৫.ঐ

২৬.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১-৪৩

২৭.ঐ, পৃষ্ঠা-৫৯

২৮.শ্রী সুনির্মল বসু। ভূমিকা। 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' (ছড়ার বই), ৩য় সংস্করণ-১৯৫৬, খুলনা।

২৯.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬০

৩০.শেখ হবিবর রহমান। "আলমগীর", ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা- ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৩৫৮

৩১.মুহম্মদ আব্দল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৬০

৩২.শেখ হবিবর রহমান। 'আলমগীর', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৮

৩৩.মাসিক সওগাত, কার্তিক- ১৩৩৩

৩৪.মাসিক সওগাত, আশ্বিন- ১৩২৬

৩৫.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮

৩৬.ঐ।

৩৭.শেখ হবিবর রহমান। 'মোল্লা বাকাউল্লা', গল্প গ্রন্থ, ১ম সংস্করণ-১৯৪৭, পারিজাত সাহিত্য কুঠির, কলকাতা, পৃষ্টা-৯

৩৮.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৫

৩৯.ঐ। পৃষ্ঠা- ৭৯

৪০.শেখ হবিবর রহমান। ভূমিকা, 'পরীর কাহিনী', ৫ম সংস্করণ-১৯৪৩, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্টা-৩

Dhaka University Institutional Repository

৪১.ঐ। পৃষ্ঠা-৪০

৪২.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা– ৫৭

৪৩.ঐ। পৃষ্ঠা– ৫৮

৪৪.ঐ। পৃষ্ঠা– ৫৮–৫৯

৪৫.ঐ। পৃষ্ঠা– ৪৩

৪৬.ঐ। পৃষ্ঠা– ৮০

৪৭.ভূমিকা, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শেখ হবিবর রহমান, 'সুন্দর বনের ভ্রমন কাহিনী', কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃষ্ঠা-৭

৪৮.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা– ৬৫

৪৯.নিবেদন, শেখ হবিবর রহমান। 'সু, ব, ভ্র, কা', কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃষ্ঠা-৫

৫০.ভূমিকা, ড. সু. কু. চ.। শে, হ, র। সু.ব.ভ্র.কা। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৫১.শেখ হবিবর রহমান। 'সু,ব,ভ্র,কা'। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮–১৯

৫২.ঐ। পৃষ্ঠা- ১০৫–১০৬

৫৩.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা– ৬৯

৫৪.শেখ হবিবর রহমান। 'ভারত সম্রাট বাবর', ১ম সংস্করণ-১৯১৯, বুনগাতি, যশোহর, পৃষ্ঠা–২২

৫৫.নিবেদন, শেখ হবিবর রহমান। "ছেলেদের হযরত মুসা", ১ম সংস্করণ-১৯৩৪, দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্টা–৪

৫৬.নিবেদন, শেখ হবিবর রহমান। 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা', ১ম সংস্করণ-১৯৩৪, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্টা–৩,

৫৭.পূর্বাভাস, শেখ হবিবর রহমান। ঐ, পৃষ্টা–৬

৫৮.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৭৬

৫৯.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৮০

৬০.নিবেদন, শেখ হবিবর রহমান। 'চেতনা', ১ম সংস্করণ-১৯২৯, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্টা–৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬১.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪৫

৬২.শেখ হবিবর রহমান। 'চেতনা', ঐ, পৃষ্টা–৯

৬৩.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৭২

৬৪.শেখ হবিবর রহমান। 'শয়তানের সভা', ২য় সংস্করণ-১৯৫৩, বুনাগাতি, যশোহর, পৃষ্টা–১২

৬৫.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৭৩

৬৬.শেখ হবিবর রহমান। 'ইসলাম ও অন্যধর্ম', ১ম সংস্করণ-১৯৪৯, প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃষ্টা–৪

৬৭.আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৭৬

৬৮.ঐ

৬৯.উপক্রমনিকা, শেখ হবিবর রহমান। 'মরনের পরে', ১ম সংস্করণ-১৯৫৫, পারিজাত সাহিত্য কুটীর, পৃষ্টা–৩,

৭০. শেখ হবিবর রহমান। ঐ। পৃষ্ঠা–১

৭১.ঐ। পৃষ্ঠা–২

৭২.ঐ। পৃষ্ঠা–৩

৭৩.ঐ। পৃষ্ঠা–৪

৭৪.ঐ। পৃষ্ঠা–৫

৭৫.ঐ। পৃষ্ঠা–৫

৭৬.ঐ। পৃষ্ঠা–৫

৭৭.ঐ। পৃষ্ঠা–৭

৭৮.ঐ। পৃষ্ঠা–৮

৭৯.ঐ। পৃষ্ঠা–৯

৮০.ঐ। পৃষ্ঠা–১০

৮১.ঐ। পৃষ্ঠা–১১

৮২.ঐ। পৃষ্ঠা–১২

Dhaka University Institutional Repository

৮৩.ঐ। পৃষ্ঠা–১৩

৮৪.ঐ। পৃষ্ঠা–১৪

৮৫.ঐ। পৃষ্ঠা–১৫

৮৬.ঐ। পৃষ্ঠা–১৬

৮৭.ঐ। পৃষ্ঠা–১৭

৮৮.ঐ। পৃষ্ঠা–১৮

৮৯.ঐ। পৃষ্ঠা–১৯

৯০.ঐ। পৃষ্ঠা–২০

৯১.ঐ। পৃষ্ঠা–২১

৯২.ঐ। পৃষ্ঠা–২২

৯৩.ঐ। পৃষ্ঠা–২৩

৯৪.ঐ। পৃষ্ঠা–২৪

৯৫.ঐ। পৃষ্ঠা–২৫

৯৬.ঐ। পৃষ্ঠা–৫৪

৯৭.ঐ। পৃষ্ঠা–৫৫

৯৮.ঐ। পৃষ্ঠা–৫৫

৯৯.ঐ। পৃষ্ঠা–৬১

১০০. ঐ। পৃষ্ঠা–৬৪

১০১. ঐ। পৃষ্ঠা–৬৭

১০২. ঐ। পৃষ্ঠা–৭২

১০৩. ঐ। পৃষ্ঠা–৭৩

১০৪. ঐ। পৃষ্ঠা–৭৫

১০৫. ঐ। পৃষ্ঠা–৭৭

১০৬. ঐ। পৃষ্ঠা–৭৯

১০৭. ঐ। পৃষ্ঠা–৮০

১০৮. ঐ। পৃষ্ঠা–৮০

১০৯. ঐ। পৃষ্ঠা–৮৫

১১০. ঐ। পৃষ্ঠা–৯২

১১১. ঐ। পৃষ্ঠা–৯৩

১১২. ঐ। পৃষ্ঠা–১৩০

১১৩. ঐ। পৃষ্ঠা–১৩৩

১১৪. ঐ। পৃষ্ঠা–১৩৪

১১৫. ঐ। পৃষ্ঠা–১৪৪

১১৬. ঐ। পৃষ্ঠা–১৫৩

১১৭. ঐ। পৃষ্ঠা–১৫৬

১১৮. আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৮০

১১৯. ঐ।

১২০. শেখ হবিবর রহমান। ভূমিকা, 'গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ', ২য় সংস্করণ-১৯৪৯, কিতাব মহল, ঢাকা

১২১. উপক্রমনিকা, ঐ

১২২. শেখ হবিবর রহমান। প্রস্তাবনা, 'সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম', ২য় সংস্করণ-১৯৩০, বুনাগাতি, যশোহর

১২৩. ঐ

১২৪. মাসিক সওগাত, কার্তিক ১৩৩৩

১২৫. শে, হ, র,। প্রস্তাবনা। স, কু, বা সা, কা, ঐ

১২৬. ঐ

১২৭. শে, হ, র,। উৎসর্গ। স, কু, বা সা, কা, ঐ

১২৮. শে, হ, র,। উৎসর্গ পৃষ্ঠার পরের পৃষ্ঠা। স, কু, বা সা, কা, ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১২৯. শে, হ, র, । স, কু, বা সা, কা(৩য় নং কবিতা), ৩য় সংস্করণ-ঢাকা, ১৯৩০, ঐ

১৩০. ঐ । ১২ নং কবিতা, ঐ

১৩১. ঐ । ১০ নং কবিতা, ঐ

১৩২. ঐ ।

১৩৩. ঐ । ১৪ নং কবিতা, ঐ

১৩৪. ঐ । ১৫ নং কবিতা, ঐ

১৩৫. ঐ । ১৭ নং কবিতা, ঐ

১৩৬. শেখ হবিবর রহমান। 'গুলিস্তাঁর গল্প'(অনুবাদ), ১ম সংস্করণ, কিতাব মহল– ঢাকা, পৃষ্ঠা–৪০–৪১

১৩৭. আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৭৯

১৩৮. ঐ ।

১৩৯. ঐ ।

১৪০. আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪৩

১৪১. শে, হ, র। ভূমিকা, শেখ ওয়াজেদ আলী। আ, সা, জী, ১ম সংস্করণ-১৯২৭, ঢাকা।

১৪২. শে, হ, র। ঐ। পৃ.১০-১১

১৪৩. ঐ, পৃষ্ঠা–০৯

১৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শেখ হবিবর রহমানের পত্রিকা-প্রকাশ, আনুষঙ্গিক কর্ম ও সাহিত্যরত্ন উপাধিপ্রাপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমানের পত্রিকা-প্রকাশ, আনুষঙ্গিক কর্ম ও সাহিত্যরত্ন উপাধিপ্রাপ্তি

শেখ হবিবর রহমান উনিশ-শতকের শেষদিকে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ বিশ-শতকের শুরুতেই। এই সময়ে তিনি লেখালেখির পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সাথে এবং সাহিত্য সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। যশোহর স্কুলে পড়ার সময় শেখ হবিবর রহমানের উদ্যোগে 'মোজকারায়ে মোজহারুল মোসলেমিন' নামে সাহিত্য-চর্চা, বক্তৃতা, শিক্ষা বিষয়ক সাহিত্য-সমিতি গঠিত হয়। মুনশী মেহেরুল্লাহ্র মৃত্যুর পর এ-সমিতির নামকরণ করা হয় মুনশী মেহেরুল্লাহর নামে 'মেহেরুল এসলাম সভা"। এই সভা ধীরে ধীরে 'যশোহর খুলনা সিদ্দিকীয়া সাহিত্য সমিতি' নামে প্রতিষ্ঠা পায়। এটা বাঙালি মুসলমানদের প্রথম সাহিত্য সংগঠন। এ-সমিতির মুখপত্র হিসেবে সমিতির যশোহর শাখা হতে 'শুকতারা' নামে হাতে লেখা একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ লাভ করত। 'শুকতারা'র সম্পাদক ছিলেন শেখ হবিবর রহমান। শেখ হবিবর রহমানের সম্পাদিত এটাই প্রথম পত্রিকা। (পত্রিকার কোন কপি না থাকায় বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হল না।)১

১৫ ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে শেখ হবিবর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বঙ্গনূর পত্রিকা'। শেখ হবিবর রহমান এই পত্রিকাটি সম্পাদনায় বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটির প্রথমেই কবি আব্দুল হাকিমের বিখ্যাত 'প্রার্থনা' কবিতাটি ছাপা হয়। এরপর অবতরণিকায় বঙ্গনূরের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান লেখেন –

"বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ হইতে নবনূরের বিশ্বোজ্জ্বল দীপ্তি এবং কোহিনূরের কমনীয় কান্তি বিলীন ও বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম সাহিত্যভুবন যে ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, পুনঃদীপ্ত ইসলাম দর্শনের অকাল তিরোধানে ধর্মপ্রাণ-মুসলমানের জীবন বীণার জাতীয় সুর যেরূপভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; সে অন্ধকার নীরবতা যে কারণেই হউক, এখন পর্যন্তও অপসৃত হইবার কোনই কারণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং বাঙ্গালী মোসলেম সমাজের অবসাদ ও জড়তা দূরীভূত করিয়া তাহাদের জীবন সাহিত্যরসে অভিসিক্ত ও দেহমন জাতীয়তার নব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার জন্যই 'বঙ্গনূর' আপনার অকিঞ্চিৎকর শক্তি ও ক্ষীণদীপ্তি লইয়া সাহিত্য সংসারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ধর্মই হউক, সমাজ হউক, কোন বিষয়েই সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশ দর্শিতার বজ্রনিগড়ে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। উন্নতিশীল বাঙ্গলাভাষা, ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষে জর্জরিত ও কণ্ঠকিত হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা সাহিত্যক্ষেত্রে রাশি রাশি অপদার্থ ও আবর্জনা সঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছে।"২

বঙ্গনূর পত্রিকার ম্যানেজার ও প্রকাশক ছিলেন মুহম্মদ আব্দুল হামিদ। কলকাতার তাতিবাজার লেন হতে 'এইচ এম বশিরুজ্জামান বশিরি প্রেস' থেকে এই সংখ্যাটি মুদ্রিত

Dhaka University Institutional Repository

হত। এই পত্রিকার সংখ্যাসমূহের পৃষ্ঠা সংখ্যা সর্বনিম্ন ছিল ৩৮ এবং সর্বোচ্চ ছিল ৫২। ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ – এই ৬টি সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিল এই প্রেস থেকে। তারপর 'বঙ্গনূর' কর্তৃপক্ষ নিজেরাই প্রেস স্থাপন করার ফলে সম্পাদক কর্তৃক 'বঙ্গনূর' প্রেস থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ৩য় সংখ্যা ৯০০ কপি করে ছাপা হতো। চতুর্থ সংখ্যা ছাপা হয়েছিল ৫০০ কপি।

বঙ্গনূরের চাহিদা দিনদিন কমে যাওয়ার ফলে ১৯২১ সালের নভেম্বরে দ্বিতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অতপর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি সংখ্যায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস (ধারাবাহিক) ছাড়াও সাহিত্য সন্দেশ, সাময়িকী চয়ন (বিখ্যাত সাহিত্যিক রচনার পুনঃপ্রকাশ, উদ্ধৃতি), অনুবীক্ষণ (সাহিত্য সমালোচনা, বই, পত্রিকা পরিচিতি), ফৎওয়া (ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সমস্যা সমূহের সমাধান নির্দেশ), নীতিকথা (হাদিস) প্রভৃতি বিভাগ প্রায় প্রতি সংখ্যাতে থাকত। বঙ্গনুর-এর সকল শ্রেণীর পাঠকের মনের খোরাক যোগানোতে যত্নশীলতার পরিচয় পত্রিকার আঙ্গিক ও বিষয় বিন্যাসে পাওয়া যায়। বঙ্গনূরের লেখকদের মধ্যে ছিলেন– কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেখ মোহাম্মদ ইদরীস আলী, মীর আব্দুল গনি (ফরিদপুরী), মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ, আলতাফ হোসেন, এ হাদি, শেখ হবিবর রহমান (সম্পাদক), নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, এ লোহানী, দেওয়ান সামসউদ্দিন আহমদ নীতপুরি, মোহাম্মদ রুহুল আমিন, এম হাতেম আহম্মদ, ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আবু ওমর মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, আফসার উদ্দিন আহম্মদ, দবিরুদ্দিন,

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ, গোলাম গাওস খাঁ, মোহাম্মদ এসহাক (বি. এ.), ওয়ারেস উদ্দিন, গোলাম কাসেম মোহাম্মদ খোদা নেওয়াজ, মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ খাঁ, চৌধুরী আব্দুল গফুর জালালী প্রমুখ।

বঙ্গনূরের ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় 'বাঙলা সাময়িক পত্রে মোসলেমের স্থান' শীর্ষক নিবেন্ধে সম্পাদক শেখ হবিবর রহমান লেখেন–

"কে জানে সেদিন কবে আসিবে, যেদিন আমরা উভয়ে উভয়কে চিনিব এবং বঙ্গসাহিত্যে গঙ্গা যমুনারূপী দুই ধারা হিন্দু ও মুসলমানের ধারা, এক বিশাল মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গবাসীকে ধন্য করিবে।"৩

এই সংখ্যায় 'সাময়িক স্তম্ভে' মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম মত প্রকাশ করেন যে, "মুসলমানের নামগুলিই যখন হিন্দুর নামসমূহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ভাষার শব্দ দ্বারা গঠিত। তখন হিন্দুরীতি অনুসারে জীবীতের লক্ষণস্বরূপ তাহার নামের পূর্বে শ্রী ব্যবহার করা কখনোই শোভন বা সঙ্গত হইতে পারে না।৪

'ইসলাম দর্শন' মাসিক পত্রের ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬ সংখ্যায় বঙ্গনূর সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়– "বঙ্গনূর একখানি সাহিত্যবিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। গত ছয়মাস

Dhaka University Institutional Repository

ধরিয়া বঙ্গনূর বেশ নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে। ভাষা ও বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে একটু দোষত্রুটি থাকিলেও ধর্ম ও জাতীয়তার দিকে উহার খুব লক্ষ্য আছে।৫

সাময়িক-পত্র সম্পাদনায় শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের তৃতীয় প্রয়াস 'মাসিক ঊষা'। 'মাসিক ঊষা' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন শ্রী বিশ্বেশ্বর নন্দী ও শেখ হবিবর রহমান যৌথভাবে। বিজ্ঞাপনে দেখা যায় –

"(ঊষা) বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে নবজাগরণের সাড়া আনিয়া দিয়াছে। মাসিক পত্রিকা মহলে ইহা অতুলনীয়। সাময়িক পত্রিকায় যা যা থাকা প্রয়োজন ঊষায় একাধারে তাহা সমস্তই পাইবেন। পক্ষান্তরে ইহাতে এমন অনেক জিনিস প্রকাশিত হয়, যাহা অন্যকোন পত্রিকায় পাইবেন না। গল্প, উপন্যাস, রস রচনা, গুরুগম্ভীর আলোচনা এবং নানা সারগর্ভ প্রবন্ধ সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া 'উষা' প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকও দেশপ্রেমিক মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান ভদ্রলোক কর্তৃক 'ঊষা' প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকও দেশপ্রেমিক মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান ভদ্রলোক কর্তৃক 'ঊষা' পরিচালিত এবং সকল সম্প্রদায়ের সমবায়ে বাঙ্গালায় মহান জাতীয়তা প্রতিষ্ঠাই ইহার লক্ষ্য। চতুর্থ বর্ষ চলিতেছে।"৬

এ তিনখানি পত্রিকা সম্পাদনা ব্যতীত তৎকালীন অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সাথেও শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সম্পর্ক ছিল। সে-সব পত্রিকায়ও তিনি নিয়মিত লেখা যোগান

Dhaka University Institutional Repository

দিতেন। কবি সমসাময়িক যে-সব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে লেখক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, তা নিম্নোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট। যথা–

- পেচক পণ্ডিত (কবিতা)–১৫, আশ্বিন-১৩১৪, মোসলেম সুহৃদ, ১১ ও ১৮ আশ্বিন-১৩১৪, মিহির ও সুধাকর
- গরল পান (প্রবন্ধ) – বৈশাখ-১৩১৯, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক কোহিনুর
- অনন্তের আহ্বান (প্রবন্ধ) – কার্তিক-১৩১৯, ২য় বর্ষ ৬ষ্ট সংখ্যা, ঐ
- প্রার্থনা(কবিতা) – বৈশাখ-১৩২২, আল এসলাম
- বাসনা (কবিতা) – জৈষ্ঠ্য-১৩২২, আল এসলাম
- সংকল্প (কবিতা) – শ্রাবণ-১৩২২, ঐ
- নীরব দান (কবিতা) –শ্রাবণ-১৩২২, ঐ
- যাত্রা (কবিতা)–মাঘ-১৩২২, ঐ
- জাগরণ (কবিতা)–ফাল্গুন-১৩২২, ঐ
- কামনা (কবিতা)– বৈশাখ-১৩২৩, ঐ
- আমাদের সাহিত্যিক অবসাদ (প্রবন্ধ)–শ্রাবণ-১৩২৩, ঐ
- আসতে হবে (কবিতা)–আষাঢ়-১৩২৩, শরিয়ত ইসলাম
- যাত্রা (কবিতা)–ভাদ্র-১৩২৩, আল এসলাম
- নিন্দুক (কবিতা)–আশ্বিন-১৩২৩, ঐ

- সাহিত্য সমালোচনা (প্রবন্ধ)– পৌষ-১৩২৩, ঐ
- জানিনে (কবিতা)–মাঘ-১৩২৩, ঐ
- আলমগীর (ঐতিহাসিক উপন্যাস)– বৈশাখ-১৩২৫, ঐ(ধারাবাহিক–১)
- ঐ। জ্যৈষ্ঠ্য-১৩২৫, ঐ (ধারাবাহিক–২)
- ঐ। আষাঢ়-১৩২৫, ঐ (ধারাবাহিক–৩)
- ঐ। শ্রাবন-১৩২৫, ঐ (ধারাবাহিক–৪)
- পাখি (কবিতা)–কার্তিক-১৩২৬, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
- বোঁধন (কবিতা)– বৈশাখ-১৩২৭, মাসিক নূর
- গ্রামের গুরু (কবিতা)– বৈশাখ-১৩২৭, শরীয়ত ইসলাম
- ধামার মহিমা (কবিতা)–ঐ, সাপ্তাহিক সুলতান
- মেহের স্মৃতি (প্রবন্ধ)–শ্রাবন-১৩২৭, আল এসলাম
- অনুতাপ (কবিতা)–শ্রাবন-১৩২৭, বঙ্গনূর
- ভবের খেলা (কবিতা)–শ্রাবন-১৩২৭, ইসলাম দর্শন
- গাজার প্রলাপ (কবিতা)–ঐ
- জেন ও পরী (উপন্যাস)–কার্তিক-১৩২৭, ঐ(ধারাবাহিক-১)
- ঐ–অগ্রহায়ন, ঐ (ধারাবাহিক-২)
- ঐ–মাঘ, ঐ (ধারাবাহিক-৩)

Dhaka University Institutional Repository

- অন্বেষণ (কবিতা)–মাঘ-১৩২৭, ঐ
- অচিন পাখি (কবিতা)–ঐ
- ডশবসায় সন্ধ্যা (কবিতা)–ঐ
- নিবেদন(কবিতা) – চৈত্র-১৩২৭, ঐ
- জেন ও পরী (উপন্যাস)–কার্তিক-১৩২৭, ঐ (ধারাবাহিক, বাকি অংশ)
- কামনা (কবিতা)– পৌষ-১৩২৭, মোসলেম ভারত
- বিয়ের পদ্য (কবিতা)– পৌষ-১৩২৭, শরীয়ত ইসলাম
- গোপন কথা (কবিতা)–ঐ
- জাতীয় সাহিত্যে ইসলামী আদর্শ (প্রবন্ধ)– ৭ ফাল্গুন-১৩৩২, মাসিক মোহাম্মদী
- মানব শক্তি ও তাহার ব্যবহার (প্রবন্ধ)–অগ্রহায়ণ-১৩৩৩, সাহিত্যিক
- ভাব ও কর্ম (প্রবন্ধ)–জৈষ্ঠ্য)-১৩৩৪, ঐ
- কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ (প্রবন্ধ)–ঐ, মাসিক গুলিস্তা
- খোদার উদ্দেশ্যে বিলাপ (কবিতা)–জৈষ্ঠ্য-১৩৩৪, আল হক
- পাগল করে (কবিতা)– বৈশাখ-১৩২৩, আল এসলাম ৭

সচিত্র মাসিক 'আল এসলামে'র শ্রাবণ-১৩২২, ৪র্থ সংখ্যায় শেখ হবিবর রহমানের 'সংকল্প' কবিতাটি ছাপা হয়। 'সংকল্প' কবিতায় কবি স্রষ্টার প্রতি প্রেম ও অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। কবি স্রষ্টার চিন্তা-সুধা দিয়ে নিজের হৃদয় ভরতে চেয়েছেন। বলেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয় কুঞ্জের কুসুমগুলি

মনের সাধে নিত্য তুলি

চরণ তোমার আমি ভ'রবো

তোমার প্রাণের সুধা দিয়ে

হৃদয় আমার ভরবো

কবি স্রষ্টার আলোকে নিজে আলোকিত হতে চেয়েছেন। মনের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে বিচিত্র ধারায়। তিনি সহজ সরল ভাষায় লিখেছেন–

তুমি আমার প্রাণে প্রাণে

মিশে রবে সকল খানে

তোমার মধুর পরশ দিয়ে

হৃদয় সরস করবো

তোমায় আমি ধরবো

ওগো ধরবো।

কবি স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য মরণকে হাসি মুখে বরণ করতে চেয়েছেন। তাই অকপটে বলেছেন–

চোখে চোখে চেয়ে

নিরিবিলি আসব ধেয়ে

যা হবার তা হবে আমার

মরতে হলে মরব

তোমায় আমি ধরবো

ওগো ধরবো। ৮

আল এসলামের পৌষ-১৩২২ এর ৯ম সংখ্যায় শেখ হবিবর রহমানের "নিরব দান" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবি স্রষ্টার কাছে কিছুই চান না, বরং নিরবে সবকিছু দান ক'রতে চেয়েছেন। তিনি নিরিবিলি আনন্দ উপভোগ ক'রতে চেয়েছেন। তিনি স্রষ্টার কাছে চেয়েছেন যে–

Dhaka University Institutional Repository

যে তান দিয়ে হাসাইয়ে
হাসাও বিশ্ব প্রাণকে
প্রাণে আমার জাগাইয়ে
তোলগো সেই তানকে

কবি আরো লিখেছেন–

আড়ম্বরে মত্ত যারা হৃদয়েতে অন্ধ
বুঝিবে না তারা আমার নিরিবিলির আনন্দ
শুয়ে ধুলোর পথের পরে
তাকায়ে ঐ নীলাম্বরে
গাহিতে চাই আমি আমার জগৎ জোড়া গানকে
মান দিয়ো না আমায় তুমি
চাইনে আমি মানকে ৯

মাসিক পত্র 'আল এসলামে'র ১০ম সংখ্যায় (মাঘ-১৩২২) শেখ হবিবর রহমানের বিখ্যাত 'যাত্রা' কবিতাটি ছাপা হয়। এ-সংখ্যায় মহাকবি কায়কোবাদের 'আহ্বান' কবিতাটি ছাপা হয়। এ-সংখ্যায় বিশিষ্ট লেখক আহমদ আলী, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, সামসুদ্দিন আহম্মদ, এসলামাবাদী, মোহাম্মদ মোজাফ্ফর উদ্দিন, কাজী নওয়াজ খোদা, মোহাম্মদ খলিলুল্লাহ, সিরাজী, আব্দুল লতিফ প্রমুখ প্রাবন্ধিকেরা লিখেছেন। নিম্নে এই সংখ্যায় প্রকাশিত শেখ হবিবর রহমানের 'যাত্রা' কবিতাটির অংশ বিশেষ দেয়া হল–

আজ দিয়েছি যাত্রা পাল তুলে
তরীখানি কেমন আমার
চলছে দুলে দুলে
সমুখে ঐ অসিম অপার

Dhaka University Institutional Repository

না জানি সে কেমন ব্যাপার
চলছি আজি কোন সে দেশে
কোন সে মোহে ভুলে
সকল বাঁধা আজ টুটেছে
কাহার পানে মন ছুটেছে
সে যেন গো বাজায় বীণা
ওপারের ঐ কুলে(অংশ বিশেষ) ১০

কবিতাটি শেখ হবিবর রহমান রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আজ কবি হৃদয় দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন। এ-কবিতায় কবি শরীরকে নৌকার সাথে তুলনা করেছেন এবং মনকে বানিয়েছেন পাল। তাঁর মন এখন উদাসভাবে ছুটছে দেশ থেকে দেশান্তরে। কবি শুনতে পান, ওপারে ওই সুদূরে কে যেন বাজায় বীণা। বীণা বাদক হিসেবে স্রষ্টার প্রকৃতির সুরকে বুঝিয়েছেন। সে বীণার ডাকে কবির মন মাতাল হয়ে ছুটছে দিক-বিদিক।

'আল-এসলামে'র পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ১১-তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২২-বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শেখ হবিবর রহমানের 'জাগরণ' কবিতাটি। এ-সংখ্যায় মোট দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। অপর কবিতাটি হল ইসমাইল হোসেন সিরাজির 'হযরৎ ওমর'। জাগরণে কবিতায় শেখ হবিবর রহমান স্রষ্টার সৃষ্টি মহিমা জাগরণে এবং স্বপ্নে সমানভাবে উপলব্দি করেন। তাই লিখেছেন কবিতার প্রতি লাইনে লাইনে। সকালের সূর্যের নরম ছোয়ায় দক্ষিণা বাতাসের মৃদু পরশে ভেঙেছে কবির ঘুম। গাছে গাছে ডাকে পাখি। কবি তাই তুলে এনেছেন কবিতায়—

Dhaka University Institutional Repository

আজকে আমায় সকাল বেলায়
কে জাগাল কোন সে সুরে
জেগে দেখি সে কোথায়
চলে গেছে অনেক দূরে
থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে
সকল আকাশ ব্যোপে ব্যোপে
তারি সুরে উঠেছে সুর
হৃদয়েরি পুরে পুরে
আজকে আমায় সকাল বেলায়
কে জাগাল কোন সে সুর

কবির ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর উপলব্দি করেছেন যে, আমিতো ঘুমের ঘোরে মৃতের মতো ছিলাম। কে আবার প্রাণ দিয়ে জাগাল, সুর দিয়ে উত্তাল করল। কবি দৃষ্টি মেলে দেখেছেন গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের ঝিরঝির দোলার শব্দ। সোনালি আলো তারি ফাঁকে উকি ঝুকি দিয়ে যাচ্ছে। কবি তাঁর হৃদয়ে এই আনন্দের উপলব্দি অনুভব করেছেন–

গাছে গাছে পাতায় পাতায়
তারি গাঁথা কে গেঁথে যায়
সোনার বরণ জলদ মালায়
তারি ছবি গেছে লেগে
নেরে পাগল ও মাধুরি
আজকে তার এই মধুর পরশ
চারিদিকে বিপুল হরষ
কইতে ত না বচন ফুরে
আজকে আমায় সকাল বেলায়
কে জাগাল কোন সে সুর।১১

Dhaka University Institutional Repository

'আল এসলাম'-এর ১৩২২ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংখ্যায় শেখ হবিবর রহমানের কোন লেখা ছাপা না হলেও মোহাম্মদী বুক এজেন্সির বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। এই বিজ্ঞাপনে শেখ হবিবর রহমানের পারিজাত, আবে হায়াত ও চেতনা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়।

'আল এসলামে' শেখ হবিবর রহমানের 'এই দূরতা দূর হবে কবে', নিন্দুক, জানিনে, জাগরণে, নীরব দান, প্রার্থনা, বাসনা, যাত্রা, কামনা, সংকল্প, কবিতাগুলো ছাপা হয়। তাছাড়া ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌষ-সংখ্যায় তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সাহিত্য সমালোচনা' প্রকাশিত হয়। ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয় প্রবন্ধ 'আমাদের সাহিত্যিক অবসাদ'। মুন্সি মেহেরুল্লার স্মৃতিচারণে রচিত প্রবন্ধ 'মেহেরুল্লাহ স্মৃতি' প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। আরো অনেক অনেক লেখা প্রকাশিত হয় শেখ হবিবর রহমানের এই পত্রিকায়।

খ

শেখ হবিবর রহমানের সম্পাদিত সচিত্র মাসিক পত্র 'বঙ্গনূর'। ১৩২৬-বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৫ কলিন লেন, কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। ঐ পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন এম এ হামিদ। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যার, প্রথম পৃষ্ঠায় খাজা মঈনদ্দিন চিশতির সমাধির ছবি ছাপা হয়েছিল। এর পরের পৃষ্ঠায় ছাপানো হয় কবি মোহাম্মদ আব্দুল হাকিমের 'প্রার্থনা কবিতা'টি। অতপর ছাপা হয় 'অবতরণিকা' নামে সম্পাদকীয় কলাম। এতে বঙ্গনূরের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলা হয়–

Dhaka University Institutional Repository

"বর্তমান সময়ে উন্নতিশীল বাঙলা ভাষায় মোসলমানদিগের কয়েকখানি মাসিক ও সাময়িক সাহিত্য বিষয়ক পত্র পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা কেন 'বঙ্গনূর' প্রকাশে ব্রতি হইতেছে, তৎসম্পর্কে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

আমাদের বিবেচনায় বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ 'নবনূরে'র বিশ্বোজ্জল দীপ্তি এবং কোহিনূরের কমনীয় কান্তি বিলীন ও বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মোসলেম সাহিত্য ভবন যে ঘোর অমনিশায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, পুণ্যদীপ্ত ইসলামের অকাল তিরোধানে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জীবন বীণার জাতীয় সুর যেরূপভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; সেই অন্ধকার ও নীরবতা যে কারণেই হোক, এখন পর্যন্তও অপসৃত হইবার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং বাঙ্গালী মোসলেম সমাজের অবসাদ ও জড়তা দূরীভূত করিয়া তাহাদের জাতীয় জীবন সাহিত্যরসে অভিসিক্ত এবং দেহ-মন জাতীয়তার নব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার জন্যই 'বঙ্গনূর' আপনার অকিঞ্চিৎকর শক্তি ও ক্ষীণ দীপ্ত লইয়া সাহিত্য সংসারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

বিশেষত বর্তমান যুগ মিলন ও সমন্বয়ের যুগ। এ-যুগে ধর্মই হউক, সমাজই হউক, আর সাহিত্যই হউক; কোন বিষয়েই সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশদর্শীতার বজ্রনিগরে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। তাই 'বঙ্গনূর' ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য প্রত্যেক বিষয়ে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে নতুন পুরাতন, স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকলের উপরেই আপনার ক্ষীণ প্রভা প্রতিফলিত করিবার ব্রত লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতিশীল বাঙ্গলা ভাষা ধর্মগত, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষে জর্জড়িত ও কণ্ঠকিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে ভাষা ও সাহিত্য যেরূপ উচ্চভাব ও উচ্চ আদর্শে ভূষিত হইতে পারিতেছে না। উক্ত ভাষাভাষী ও সাহিত্যসেবী বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমানগণও সেইরূপ পরস্পরের প্রতি সহানুভুতি সম্পন্ন হইয়া জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না। সুতরাং নিরপেক্ষ ও সুনিপুণ আলোচনার দ্বারা উক্ত মহা অর্থের নিদার নির্নয় ও মূল উৎপাদন করাই বঙ্গনুরের অন্যতম ব্রত।

অধুনা সাহিত্যক্ষেত্রে রাশি রাশি অপদার্থ ও আবর্জনা সঞ্চিত হইয়া জাতীয় সাহিত্যকে দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহার ফলে বঙ্গসাহিত্য ক্রমান্বয়ে সুধি সজ্জনগণের অপাঠ্য ও অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুক্ষ সমালোচনা সমর্জনী প্রহারে সেই অপদার্থ ও আবর্জনা রাশি অপসারিত করিয়া সাহিত্য কানন নির্মল ও সুশোভন করাও বঙ্গনুরের অন্যমতম প্রধান উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সমূহ সাধনকল্পে আমরা নবীন ও প্রবীন সুধি সাহিত্যিকবৃন্দ ও সুহৃদয় দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ এবং বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কল্যাণে আমাদের কামনা পূর্ণ হউক, ইহাই প্রার্থনা।"১২

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া এ-সংখ্যায় মীর আব্দুল গণি ফরিদপুরী'র 'তৌহিদ ও অদ্বৈতবাদ' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। তার পরের পৃষ্ঠায় ছাপা হয় ইদরিস আলীর কবিতা। অতপর ছাপা হয় শেখ হবিবর রহমানের প্রবন্ধ 'আফ্রিকায় বাঙালি মোসলেম কীর্তি"। এ-প্রবন্ধে তিনি ধর্ম-কর্মহীন অলস কুসংস্করাছন্ন মুলমান জাতীর জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে এক সময়ের মুসলিম জাতীর কীর্তির কথা উল্লেখ ক'রেছেন এবং দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন এইভাবে–

"যখন মোসলেমের বীরত্ব কাহিনী সুর্যের ন্যায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, যখন এসলামের যশঃসৌরভ জনশ্রুতি বায়ু নিশ্বাস পুস্প গন্ধের ন্যায় মাতাইয়া তুলিয়াছিল, যখন মুসলমানের নাম শ্রবণে জন সমাজ যুগপৎভীতি ও আনন্দের সঞ্চার হইত, যখন ভারতবাসি মুসলমানকে দেবজ্ঞানে ভক্তি করিত, যখন সৌভাগ্যরবি মোসলেম মধ্যাহ্ন গগণে ভাস্কর ছিল; তখন মুসলমানগণ প্রত্যেক কার্যে জীবনের প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি ঘটনায় ধর্মপ্রাণ– তার দানশীলতার পরিচয় দিত। ধর্মের জন্য পুন্যের নিমিত্তে প্রাণ বিসর্জন করিত। মুসলমান চিরদিনই ন্যায় ও ধর্মের উপাসক। কিন্তু হায় বাঙ্গালার মুসলমান আজ মনিহারা ফনি স্বরূপ।"১৩

এক সময়ে বঙ্গদেশে হুগলি জেলার মুসলিম বনিকরা ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত গিয়ে গিয়ে স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা এবং এদেশীয় কারুকার্য করা পোষাক বিক্রি করত। তারা এক-সময় আফ্রিকার কেপটাউনে গিয়েও উপস্থিত হয়েছিল। এখানে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ব্যাপক লাভবান হয়। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সেখানে তাদের অবস্থান দৃঢ় হয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের প্রভাবে সেখানে দিন দিন মুসলমান বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা নব্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। মসজিদের নাম দেয়া হয় 'কুত্ততল মসজিদ'। এর জন্য ব্যয় হয় ৩৪,০০০ টাকা প্রায়। এই মসজিদ হীরা মুক্তা দিয়ে সাজানো হয়। মসজিদের সার্বিক খরচ খাত খাত করে দেখিয়েছেন তার প্রবন্ধে। সূক্ষ্ম সূক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এই প্রবন্ধটি।

তাছাড়া মীর হাবিব খানকে নিয়ে লিখেছেন মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ। মুসলিম জাতীর ধর্ম প্রচার ও নানা উত্থান পতন নিয়ে আলতাফ হোসেন বি এ লিখেছেন 'সংগ্রাম' নামক প্রবন্ধ। তাছাড়া 'বাগদাদ নগরী' নামক কবিতা লিখেছেন এ হাদী। এ সংখ্যায় শেখ হবিবর রহমান 'পাখী' নামক একটি কবিতাও রচনা করেছেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ হলো–

অমন করে উদাও হয়ে
কোন সে দেশে যাবি পাখী
সেথা তাহার কে যে আছে
কবি আমায় কবি নাকি
আমি তরে উদাস পানে
তাকায়ে ঐ গগন পানে
কি জানি সে কিসের আশে
শুধু শুধু চেয়ে থাকি

এই শূন্য মন একদিন খাঁচা ছেড়ে উড়াল দেবে। এই প্রাণ কোথায় যায়, তা কবির প্রশ্ন, উদাস পানে আকাশ পানে। কবি কখনো বুঝেন, কখনো বুঝতে পারেন না–

Dhaka University Institutional Repository

নিত্য সকাল সন্ধ্যাবেলা
কি জানি সে কাহার খেলা
দেখি দেখি কি যে ভাবে
সদা আমার ঝরে আঁখি
অমন করে উদাও হয়ে
তারি কাছে যাবি নাকি। ১৪

এ সংখ্যায় 'কল্প কুঞ্জ' নামক গল্প লিখেছেন 'মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম'। দ্বিতীয় গল্পটি লিখেছেন শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী 'দুনুজ দুহিতা' নামে। তারপর ছাপা হয় এ লোহানির কবিতা 'প্রশ্ন'। শেষ পৃষ্ঠায় 'সংগ্রহ' নামে প্রবাসের এক নদীর সম্পর্কে লেখা হয়েছে। তার নিচে 'সাহিত্য সন্দেশ' নামে তিনটি বইয়ের বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়েছে–

> "প্রবীন সাহিত্যিক মোসলেম হিতৈষির সম্পাদক মুন্সি শেখ আব্দুর রহিম সাহেবের নামাজ শিক্ষা'র সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে। মুল্য পাঁচ আনা। সুলেখক ও সুকবি মোসলেম হিতৈষির সহসম্পাদক মুন্সি শেখ আব্দুল হাকিমের 'মিলন' বাহির হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। প্রকাশক, ইসলামিয়া পাবলিকেশন হাউস।
>
> কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহেবের 'আলমগীর' বাহির হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।"

বঙ্গনুরের ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা বের হয় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। এ সংখ্যার শুরুতে মোহাম্মদ আব্দুল হাকিমের 'স্বর্গের প্রদীপ' কবিতাটি ছাপা হয়। তারপর ছাপা হয় 'সভাপতির অভিভাষণ' নামের একটি অভিভাষণ। এতে আঞ্জুমানে ওয়ায়ে জিনের সেরাজগঞ্জ অধিবেশনের সভাপতি অনারেবল নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সি আই ই

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবের অভিভাষণটি অবিকল ছাপা হয়। তারপর ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় শেখ মোহাম্মদ ইদরীস আলীর 'চিরবিদায়' কবিতাটি, এ লোহানীর প্রবন্ধ 'এসলাম ও প্রতীচি' 'মীর হাবিব' নামে রেয়াজ উদ্দিনের ধারাবাহিক গল্প এবং ইদরিস আলীর ধারাবাহিক গল্প 'দুনুজ দুহিতা'। তারপর ছাপা হয় এ লোহানীর কবিতা 'স্পর্শমনি'। সর্বশেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হয় 'আমাদের কথা' শিরোনামে সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয়তে পত্রিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়–

> "দয়াময় আল্লাহ তায়ালার অপার করুণায় ও হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) তোফেলে আমরা 'বঙ্গনূর' দ্বিতীয় সংখ্যা লইয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। ধর্মপ্রাণ সমাজ হিতৈষী সাহিত্যসেবীগণ আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আমাদেরকে উৎসাহিত করুন।
>
> প্রথম সংখ্যা হইতে 'বঙ্গনূর' মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়াছে। আল্লাহ চাহেত ৩য় সংখ্যা হইতে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। ১ম ও ২য় সংখ্যায় আমাদের যথেষ্ঠ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। সুন্দর ও নির্ভুল ছাপা এবং প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহে কাগজ প্রকাশ করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা আমরা ঠিক করিয়াছি। আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আগামী ৪র্থ সংখ্যা হইতে 'বঙ্গনূর' ৫ ফর্মার স্থলে ৬ ফর্মার আকারে বাহির হইবে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহক পৃষ্ঠপোষক ও হিতৈষীগণ অন্তত একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া পত্রিকার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

আগামী সংখ্যা হইতে বঙ্গবিখ্যাত আলেম সুলেখক জনাব মৌলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব ও সর্বজন পরিচিত ইসলাম প্রচারক জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেবগণ ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গনূরের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।"১৫

সবশেষে নতুন বইয়ের খোজ-খবর নিয়ে ছাপা হয় সাহিত্য-সংবাদ

বঙ্গনূর ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের মে মাসে। পত্রিকার প্রথমে লাহোরের শাহী মসজিদের ছবি ছাপানো হয়। প্রথমে ছাপানো হয় শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলীর কবিতা 'কোরআন'। আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিনের সিরাজগঞ্জ অধিবেশনের সভাপতি অনারেবল সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সি আই ই সাহেবের অভিভাষণ শিরোনামে। তাছাড়া ছাপানো হয় এ লোহানীর কবিতা 'আলোক'। দেওয়ান শামসউদ্দীন আহম্মদ নীতিপুরীর 'শবদাহ ও কবর' এবং 'বাঙ্গলা সাময়িক পত্রে মোসলমানের স্থান'। এ লোহানীর ধারাবাহিক উপন্যাস 'প্রত্যাবর্তন' ও মোহাম্মদ ইদরিস আলীর ধারাবাহিক উপন্যাস 'দুনুজ দুহিতা' প্রকাশিত হয়।১৬

'বঙ্গনূর' ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের ফাল্গুন মাসে। এ-সংখ্যার প্রথমেই ছাপা হয় এ লোহানীর কবিতা 'স্মরণে'। তারপর ছাপানো হয় নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুরের ধারাবাহিক অভিভাষণ "সভাপতির অভিভাষণ'। তাছাড়া ছাপা হয় 'ইসলামের প্রচার ও তাহার ধারা', 'মানব কুলের আদর্শ হিসেবে হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব। তাছাড়া লেখকের নামহীন অসংখ্য প্রবন্ধ ছাপা হয়। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম হচ্ছে – আঞ্জুমানের

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত কর্ত্তব্য, ইউরোপের মহাসমর ও আমাদের পবিত্র স্থানগুলির হেফাজত, ধর্ম বিষয়ে আমাদের প্রতিবেশীগণের সহিত সম্বন্ধ। তারপর ছাপা হয় দেওয়ান শামসউদ্দিন নীতপুরীর 'শবদাহ ও কবর' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ। অনুবাদমূলক প্রবন্ধ 'ফৎওয়া' প্রকাশিত হয়। পূর্বের সংখ্যায়ও প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল। 'ফৎওয়া' প্রবন্ধে পীর পুজকদের সম্বন্ধে নানা রকম ফতয়া দেয়া হয়েছে। কুরআন, মেশকাত, তফসির, আহমদি, সুরা লোকমান প্রভৃতি কেতাব ও সূরা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই ফৎওয়াগুলো দেওয়া হয়েছিল। এই প্রবন্ধের নিচে স্বাক্ষর করেন বিখ্যাত আলেম ও বুজুর্গগণ। স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন শেখ হবিবর রহমান ও তাঁর ভাই শেখ ফজলর রহমান। তারপর ছাপা হয় দৌলতপুর হাইস্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র এম হাতেম আহমেদের কবিতা 'অচিন বন্ধু'। তারপর ছাপা হয় শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলীর ধারাবাহিক উপন্যাস 'দুনুজ দুহিতা' ও তাঁর কবিতা 'প্রার্থনা'। ছদ্ম নাম দেওয়ানার গল্প 'খেয়াল'। অতপর ছাপা হয় মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহম্মেদের 'মীর হাবিব' প্রবন্ধটি। অতপর এবনে নুরের সন্দেশ এবং 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে পরিশেষে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়।১৭

মাসিক পত্র 'বঙ্গনূরের ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ছাপা হয় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। এতে ছাপা হয় এ লোহানীর কবিতা 'উপলব্দি', মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর প্রবন্ধ 'হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন। এ-সংখ্যায় লিখেন মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন 'মীর হাবিব খান', শেখ মোহাম্মদ ইদরীস আলী 'দুনুজ দুহিতা', এবনে নুর 'সন্দেশ বহ', এ লোহানী'র 'ভ্রাতৃবদল',

Dhaka University Institutional Repository

আবু ওমর মোহাম্মদ আব্দুর রহমানে'র 'সিয়ার-উল-মোতাসসেরিনের বঙ্গানুবাদ 'মরণের পরে', দেওয়ান শামসউদ্দিন আহম্মদ নীতপুরী'র 'এসলাম বিজ্ঞান', ফাতেমা লোহানীর কবিতা 'জাতীয় গৌরব', আফসার উদ্দিন আহম্মদ 'রোগী ও নিরোগ', দবিরুদ্দিনের 'আল্লাহর রসুল'।

এ-সংখ্যায় ছাপা হয় শেখ হবিবর রহমানের বিখ্যাত একটি কবিতা 'সন্ধ্যায়'। কবি চাঁদ ও সূর্যের অবিরাম খেলা প্রত্যক্ষ করে তিনি যা উপলব্দি করেছেন, তাই লিখেছেন–

রবিটি গিয়াছে ডুবিয়া
সাঝের লোহিত আকাশে
উঠেছে চাঁদিমা হাসিয়া
ফুটিতেছে হাসি বাতাসে
প্রকৃতি পরাণ খুলিয়া

চাঁদের মায়াবীরূপ করে কবি লিখেছেন–

আজি হাসিছে চাঁদিমা রজনী
নীরব মাধুরী মানিয়া
পরানের প্রতি ধমনী
নীরবে উঠিছে জাগিয়া" ১৮

বঙ্গনূরের সমালোচনায় 'হাতেম তাই' সমালোচিত হয়েছিল। তাই মুহম্মদ আফজালুল হক শেখ হবিবর রহমানকে এ সম্পর্কে চিঠি দিয়ে অবহিত করেন। বঙ্গনূরের শেষে চিঠিটি ছাপা হয়। চিঠিটি নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

পত্র নং

প্রতি

প্রকাশক, বঙ্গনূর

৫, কলিন লেন

৩২, কলেজষ্ট্রীট, কলকাতা

আসসালামু আলায়কুম

দেখিলাম আপনাদের প্রকাশিত বঙ্গনূরের ৩য় সংখ্যায় আমার ওয়ালেদ সাহেবের 'হাতেম তাই' পুস্তকখানি। আপনাদের কোন এক অবিবেচক বন্ধু সমালোচনার্থে প্রদান করিয়াছেন এবং তাহা পত্রস্ত করিবার পূর্বে আপনাদেরও কি একবার বিবেচনা করা উচিৎ ছিল না। বড় বিস্ময়ের কথা! যিনিই হন, তাহার সমালোচনার্থে পুস্তক দিবার অধিকার কি? এবং তাহা বঙ্গনূরের মতো পত্রিকায়? যাহোক পত্রিকা বলিয়া নামোল্লেখ করিলে তাহা বড় করিয়া দেখা হয়। যাহা হউক ইহাতে একজন প্রবীন লেখকের যথেষ্ঠ অবমাননা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য জানাইবেন।

ইতি

ভবদীয়

মুহম্মদ

আফজালুল হক

মাসিক বঙ্গনূরের ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ছাপানো হয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। পত্রিকার প্রথমে ছাপা হয় মিরাটের আবা খালেক মসজিদের ছবি। তারপর ছাপা হয় এ লোহানীর কবিতা 'কীর্ত্তি মন্দির'। অতপর ছাপা হয় দেওয়ান শামসউদ্দিন নীতপুরির 'এসলাম বিজ্ঞান'

Dhaka University Institutional Repository

(ধারাবাহিক), শেখ মোহাম্মদ ইদরীস আলীর 'দুনুজ দুহিতা' (ধারাবাহিক), এবনে নূর 'সন্দেশ বহ'(ধারাবাহিক)। এ সংখ্যায় কবিতা লেখেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেখ মোহাম্মদ ইদরীস আলী, মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম। তাছাড়া মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ চৌধুরীর 'রেলে কয়েক ঘন্টা', এ লোহানীর 'সুয়েজ খাল' প্রবন্ধ ছাপা হয়। এ-সংখ্যায় নতুন সংযোজন 'চিঠির বাক্স' নামের একটি পৃষ্ঠা। যে কোন গ্রাহক এবং পাঠক এতে চিঠি লিখতে পারতেন। এ-সংখ্যার মাঝামাঝিতে ছাপা হয় 'কবিতাগুচ্ছ' পাতা। কবি কাজী নজরুল ইসলাম এইবারই প্রথম 'বঙ্গনূরে' লিখেন। শেখ হবিবর রহমানের বিশেষ অনুরোধে কবি নজরুল 'বঙ্গনূরে' এ-কবিতাটি পাঠান। কবিতাটির নাম হলো 'চিঠি'। পত্রিকায় কবির নাম ছাপা হয় 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' নামে। কবিতাটির কয়েকটি লাইন নিম্নরূপ :

> বিনু
> তোমায় আমায় ফুল পাতিয়াছিনু
> মনে কি তা পড়ে
> যেদিন সাজে নতুন দেখা বোশেখ মাসের ঝড়ে
> আম বাগানের একটি গাছের তলায়
> দুইটি প্রাণই দোলেছিল 'হিন্দোলেরই দোলায়।"১৯

মাসিক বঙ্গনূরের ১ম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা বের হয় ১৩২৭-বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য মাসে। তখন ছিল রমজান মাস। তাই 'রমজান আল মোবারক' শিরোনাম দিয়েই শুরু হয় পত্রিকার প্রথম প্রবন্ধ। এ-সংখ্যায় ছাপা হয় এ লোহানীর 'সুয়েজ খাল'(ধারাবাহিক), মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ চৌধুরীর উপন্যাস 'প্রতিশোধ'। শাহজাদি জেবউন্নিসার কবিতার অনুবাদ করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ এসহাক বি এ। তারপর ছাপা হয় মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মেদের ‘মীর হাবিব খান’ (ধারাবাহিক), শেখ মোহাম্মদ ইদরীস আলীর ‘দুনুজ দুহিতা’ (ধারাবাহিক), মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ খাঁ চৌধুরীর কবিতা ‘খেদোক্তি’, এবনে নূরের ‘সন্দেশ বহ’ (ধারাবাহিক), ‘দেওয়ার খেয়াল’ (কৌতুক), ‘চিঠির বাক্স’ (পাঠকদের চিঠি নিয়ে), মাওলানা রুহুল আমিন ‘বাইবেল বিকৃত হইয়াছে’ (ধারাবাহিক), তাছাড়াও নিয়মিত পাতা ‘সাহিত্য সংবাদ ও অনুবীক্ষণ’ ছাপা হয়েছে। তাছাড়া মাসিক পত্র-পত্রিকার খোঁজ-খবর নিয়ে ছাপানো হয়েছে ‘মাসিক পত্র’। এতে মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ‘আঙ্গুর’ পত্রিকা, মৌলভী নুরুল হোসেন কাশিম পুরীর ‘ভাস্কর’, মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ও মৌলভী নুর আহমদ সাহেবান সম্পাদিত ‘ইসলাম দর্শনের খোঁজ-খবর’ প্রকাশিত হয়। ২০

মাসিক ‘বঙ্গনূরে’র ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ছাপা হয় ১৩২৭-বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। এ-সংখ্যার প্রথমে ছাপা হয় এ লোহানীর ‘ঈদ আহ্বান’ কবিতাটি। তারপর মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ‘হযরত বড় পীরের কবিতার বিশ্লেষণ’ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া নবীন লেখক ওয়ারেস উদ্দিনের ‘ফোরন’, গোলাম কাসেমের ‘ডাক্তার বাবু’ কবিতাটি ছাপা হয়। ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন মোহাম্মদ খোদা নেওয়াজ ‘আমার কাশ্মীর ভ্রমণ’ শিরোনামে। কবিতাগুচ্ছে ছাপানো হয় দবিরুদ্দিনের ‘ভাগ্যচক্র’, মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ খা চৌধুরীর ‘রসুলুল্লাহ প্রেম’, শেখ মোহাম্মদ ইদরীস আলীর ‘সৈয়দ হামজা’, তাছাড়া অনুবীক্ষণে ছাপা হয়েছে ‘ইসলাম দর্শন ও আঙ্গুরের প্রশংসা’। সাহিত্য-সংবাদ পাতায় ছাপা হয়েছে ‘শোক সংবাদ’। কিমিয়া সাধতের অনুবাদক রাজশাহী শিক্ষা-সমিতি এবং নুরুল ইসলাম সমিতির সুযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

সাধক এবং শিক্ষা সমাচার (দ্বৈ মাসিক) পত্রিকার সম্পাদক মীর্জা মোহাম্মদ ইউছুপ আলীর মৃত্যুতে এ শোক বার্তা দেয়া হয়েছে। সম্পাদক পরিশেষে মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে সমদুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। ২১

মাসিক বঙ্গনূরের ১ম বর্ষ নবম সংখ্যা ছাপা হয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় এবার ছাপানো হয় সরদার মসজিদের ছবি। তারপর ছাপা হয় এ লোহানীর 'মানুষের স্বভাব' প্রবন্ধটি। তাছাড়া ধারাবাহিক লেখাগুলোও ছাপা হয়। নতুন ছাপা হয় দবিরুদ্দিনের 'বিভোর মন্দিরা' কবিতা। জাহাঙ্গীর খা চৌধুরীর 'মানিক জোড়' (গল্প)। এ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শেখ হবিবর রহমানের প্রকাশিত কবিতা 'অনুতাপ'। স্রষ্টাকে ভুলে তিনি কিভাবে দিন যাপন করছেন, কবি তাই উল্লেখ করেছেন–

তোমায় আমি ভুলে আছি কেমনে
এই কথাটি ভাবি বসে গোপনে
প্রাণে আমার তোমারি প্রান
করেছি যে চেতনা দান
মাখি কত মধুরিমা জীবনে
তবু তোমায় ভুলে থাকি কেমনে

নিজেকে অপরাধী ভেবে অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ব করেছেন তিনি–

আজি চোখে ঝরিছে মোর বারি যে
কি যেভাবে কহিতে না পারি যে
এমন পাষাণ, এমন পাপাচারী
যে নাই দু'টি ভুবনে।

Dhaka University Institutional Repository

এ-সংখ্যায় ও অনুবীক্ষণে 'পর্দা' নামের একটি কবিতার বইয়ের সমালোচনা ছাপা হয়েছে এবং সাহিত্য-সংবাদে এবারো শোক সংবাদ ছাপা হয়। বঙ্গীয় মুসলিম-সমাজের প্রাণপুরুষ মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রতি গভার শোক প্রকাশ করা হয়েছে।২২

'মাসিক বঙ্গনুরে'র ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। ইদুল আযহা উপলক্ষ্যে সম্পাদকীয়তে লেখা হয় 'ঈদুল আযহা' শিরোনামে সম্পাদকীয়। তারপর আব্দুল করিমের স্মৃতিময় গল্প 'বাল্যবন্ধু' ছাপা হয়েছে। কবিতাটির অংশ বিশেষ হলো–

ডাক ডাক আমায় ডাক গো
তোমার ঘরের দুয়ার দিয়ে আমায় ধরে রাখ গো।
হৃদয় আমার আছে মরে
কোন সাড়া নাহি তরে
সঞ্জীবনী সুধা তাতে মাখগো
আছি আমি আছি দ্বারে দাড়ায়ে
ধরি মোরে লহ তুলে
তব মহান চরণ মূলে
নয়নে নয়নে মম থাকগো
ডাক ডাক এ অধীনে ডাকগো।

এ-সংখ্যায় সঙ্কলন পাতায় বেশ নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন। সর্বাপেক্ষা পুরাতন চিঠি, সর্বাপেক্ষা পুরাতন বিবাহ প্রস্তাব লিপি, চিনে ভ্রমণ বিষয়ক গল্প। তাছাড়া আব্দুল গফুর জালালীর 'মিঠা মুখ' কবিতা ছাপা হয়। সংগ্রহ পাতায় ছাপা হয় বিশ্বের মজার মজার এবং আশ্চর্যজনক কিছু তথ্য। অনুবীক্ষণ পাতায় ছাপা হয়েছে 'সোহরাব রুস্তম', 'দেবকাহিনী',

Dhaka University Institutional Repository

'শপথ' গ্রন্থসমূহের সমালোচনা এবং মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'নারায়ণ' ও 'পল্লীবীনা'র সমালোচনা। এই সংখ্যায় সাহিত্য-সংবাদ পাতায় লেখকদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। লেখার বিষয় তিনটি–

আওরঙ্গজেবের শাসননীতি পুরষ্কার–সুবর্ণ পদক

বঙ্গসাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেনের দান ও তাঁর প্রভাব– রৌপ পদক

হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্তরায় ও তা নিবারণের উপায়– রৌপ পদক

সংখ্যায় ধারাবাহিক পূর্বতন লেখাও ছাপা হয়।

মাসিক 'বঙ্গনূর'-এর ১ম বর্ষ ১১-তম সংখ্যা প্রকাশ হয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। এ-সংখ্যার প্রথমে আগ্রার মোতি মহলের ছবি ছাপা হয়। এ-সংখ্যায়ও এ লোহানীর কবিতা দিয়ে শুরু করা হয়। এ-সংখ্যায় লেখেন ফজলুল করিম খান (এসলামের একথা), ইয়াছিন আলী আহম্মদ (পল্লী চিত্র)। এ-সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ হলো কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা। কবিতাটির নাম হলো 'গরীবের ব্যথা'। কবিতাটির কয়েকটি লাইন হচ্ছে–

এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি
পরণে নেই ছেড়া কানি, সাড়া গায়ে ধুলি
সারাদিনের অনাহারে শুষ্কবদনখানি
ক্ষিধের জ্বালায় ক্ষুন্ন, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি

এ-সংখ্যাতেও মুন্সি মেহেরুল্লাহকে নিয়ে স্মৃতিচারণ লেখা হ'য়েছে। তাছাড়া সবগুলো পাতাই ছাপা হয়েছে।২৪

বঙ্গনুরের ১ম বর্ষ ১২-তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২য় কার্ত্তিক। পত্রিকার প্রথমেই ছাপা হয় কায়কোবাদের বিখ্যাত কবিতা 'ভুল'। কবিতাটির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ :

আমি ভুল বুঝেছি এতকাল
ভাঙ্গব সে ভুল কতদিনে
আমার ভুলের মাঝে সে বিরাজে
সে যে আমায় নিচ্ছে টেনে।

এ-সংখ্যায় শেখ হবিবর রহমান কাজী নজরুল ইসলামের আরো একটি বিখ্যাত কবিতা প্রকাশ করেন। কবিতাটির নাম 'বাঁশির ব্যথা'। কবিতাটির অংশ বিশেষ হলো :

শোন দেখি মন বাঁশীর বুক ব্যোপে
কি উঠছে সুর
সুরত নয় ও, কাঁদছে যেন
বাঁশরী বিচ্ছেদ বিঁধুর

শেখ আব্দুল গফুর জালালী লিখেন– 'সু রাজ না কু রা' শিরোনামের প্রবন্ধ। এ-সংখ্যার আরো কবিতাগুলো হল– শেখ আব্দুল জালালী'র 'সুন্দর', মোহাম্মদ নুরুল হুদা'র 'সৈনিক', শাহাদাৎ হোসেনে'র 'নববধূর প্রতি', হাসমত আলী'র 'পারের পথে' মোহাম্মদ সুরত আলী'র 'শিক্ষার উক্তি' নামক কবিতা। এ-সংখ্যার সাহিত্য-সংবাদে 'সুফি মধু মিয়া' নামক প্রবন্ধ ছাপা হয়।

এই-সংখ্যাই বঙ্গনুরের শেষ সংখ্যা। নানা সমস্যার কারণে বঙ্গনূর বন্ধ হয়ে যায়। এ-সংখ্যার শেষে শেখ হবিবর রহমান 'বিদায় শিরোনামে' লিখেন –

> "পরম করুণাময় আল্লাহর ফজলে বঙ্গনুরের ১ম বর্ষ শেষ হইল। যে সকল সুহৃদয় লেখক ও গ্রাহক অনুগ্রহ পূর্বক বঙ্গনুরের গ্রাহক হইয়া ও প্রবন্ধ পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

Dhaka University Institutional Repository

নানা অনবার্য কারণে বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গনূর প্রকাশে নানাভাবে বিশৃংখলা ঘটিয়াছে, এই সকল বিশৃংখলার কারণ প্রেস কর্মচারীগণের ধর্মঘট, কাগজ বিভ্রাট ও আকস্মিক বিপদপাত বিষয়ে যথাসময়ে আমরা গ্রাহকগণকে জানাইয়াছি এবং এই অনিচ্ছাকৃত ক্রুটির জন্য আমরা পাঠকগণের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অনেকে মনে করিতে পারেন বুঝি বঙ্গনূরও স্বত্ব দান করে। কিন্তু আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখিয়া মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিতেছি যে এইরূপ কুঅভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গনূর স্থাপন করি নাই। আল্লাহর অনুগ্রহ থাকিলে নববর্ষ হইতে বঙ্গনূর আবারো নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

কাগজের আকার ডাবল ফুলিস্কোপ করিয়া আমরা প্রথমেই ভুল করিয়াছিলাম কারণ ঐ সাইজের কাগজ সব সময় পাওয়া যাইত না। কাজেই নববর্ষে বঙ্গনূর রয়েল আকারে বাহির হইবে এবং কাগজের দুর্মূল্যতার কারণে বার্ষিক মূল্য ও স্বডাক দুই আনা করা যাইবে। আশা করি গ্রাহকগণ নববর্ষের কাগজ পাইয়া নিশ্চই সন্তুষ্ট হইবেন। যাহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মানি অর্ডার করিয়া গ্রাহক হইবেন, তাহাদের ভিপি খরচ কম লাগিবে।" ২৫

বেশ কয়েক মাস বিরতির পর মাসিক বঙ্গনূরের ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়। এবার পত্রিকার গঠন অনেকটা পরিবর্তন হল। এ ফোর সাইজে প্রকাশিত হলো পত্রিকা। পত্রিকার নিচে লেখা হল 'জাতীয় মাসিক পত্র'। সম্পাদক শেখ হবিবর রহমানের নামের পূর্বে প্রফেসর শব্দটি ব্যবহার করে 'প্রফেসার শেখ হবিবর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান’ লেখা হল। সংখ্যার প্রথমে বিষয় সূচি দেয়া হল এবং পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য নিয়মাবলী ছাপানো হল–

“বঙ্গনূরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ষান্মাষিক সাতশিকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য পাঁচ আনা। নমুনার জন্য ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়, নতুবা নমুনা পাঠানো হয় না।

বঙ্গনূর প্রতি বাংলা মাসে ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের জানাইতে হয়।

পুরাতন গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর এবং নতুন গ্রাহক ‘নতুন’ শব্দটা লিখিতে ভুলিবেন না। নশ্চেৎ পত্রের কোন কাজ হইবে না।

রিপ্লাইড কার্ড কিংবা টিকেট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভবপর নহে।

ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য ১৫ দিন পূর্বে জানাইতে হইবে।

প্রবন্ধ ও বিনিময়াদি সম্পাদকের নামে এবং টাকা-কড়ি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।”

উপরোক্ত নিয়মাবলির পরে ছাপানো হয় বিজ্ঞাপনের হার। বিষয় সূচির প্রথমে ছাপানো হয় মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল বারীর ‘বঙ্গনূর’ কবিতা। অতপর সম্পাদকীয় ছাপা হয় ‘বর্ষ আবাহন’ শিরোনামে। অতপর ছাপা হয় ডাঃ মোহাম্মদ একরার আনসারির ‘অলৌকিক কার্যালয়’, এবনে নুরের ‘সন্দেশ বহ (ইতিহাস), মুন্সি আফসার উদ্দিন আহম্মেদের ‘কবিতার প্রতি’, মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুর রহমানের ‘অনিলা’ (ছোটগল্প), মুন্সি মোহাম্মদ ইদরিস আলী’র ‘আবাহন’(কবিতা), এ লোহানীর ‘স্বপ্ন সত্য’, ডাক্তার মোহাম্মদ একরার আনসারীর ‘দুখে সুখ’ (কবিতা), মুন্সি শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলীর ‘দুনুজ দুহিতা’ (উপন্যাস), মৌঃ

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খা চৌধুরীর 'সালী আনা' (উপন্যাস), মৌলানা শেখ আব্দুল হাকিমের 'সে আমারে ভালবাসে' (কবিতা)। তারপর ছাপা হয় চয়ন অংশ। এ-অংশে চয়ন করা হয় 'মোহাম্মদী' থেকে পৃথিবীর প্রথম নারী মন্ত্রীর তথ্য এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অভিভাষণ' ছাপা হয়। পূর্বের সংখ্যার ন্যায় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, সাহিত্য সন্দেশ সবই ছাপা হয়।

এ সংখ্যায় অনেক বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। সম্পাদক শেখ হবিবর রহমান 'বর্ষ আবাহন' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে লেখেন–

> "আজ বঙ্গনুরের দ্বিতীয় বর্ষ। সুখ-দুখ, বিপদ ও আপদের মধ্যে হইতে 'বঙ্গনূর আজ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। প্রথমে আমরা যখন বঙ্গনূর প্রচারে ব্রতি হই, তখনই বলিয়াছিলাম 'বাঙ্গালী মোসলেম সমাজের অবসাদ ও জড়তা দূরীভূত করিয়া তাহাদের জাতীয় জীবন সাহিত্যরসে অভিসিক্ত এবং দেহমন জাতীয়তার নব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার জন্যই 'বঙ্গনূর' আপনার অকিঞ্চিৎকর শক্তি ও ক্ষীণ দীপ্তি লইয়া সাহিত্য সংসারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমরা আরো বলিয়াছিলাম, বর্ত্তমান যুগ মিলন ও সমবায়ের যুগ। এ যুগ ধর্মই হউক, সমাজই হউক, সাহিত্যই হউক, যে কোন বিষয়েই সাম্প্রদায়িকতা ও একদর্শীতার বজ্রনিগরে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। তাই বঙ্গনূর ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য প্রত্যেক বিষয়ে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে নতুন-পুরাতন, স্বপক্ষ-বিপক্ষ, সকলের উপরেই আপনার ক্ষীণ প্রভা প্রতিফলিত করিবার ব্রত লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে।"২৬

সম্পাদকীয়'র শেষে শেখ হবিবর রহমান বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

'প্রথম বর্ষ বঙ্গনূর প্রচারে আমাদের সহস্রাধিক ক্ষতি সত্ত্বেও সমাজের কল্যাণের দ্বিতীয় বর্ষ 'বঙ্গনূর' প্রচারে বিরত হইলাম না। আশা করি আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ পূর্বের ন্যায় এবারও বঙ্গনূরকে স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন এবং প্রত্যেকে অন্তত পাঁচজন করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া বঙ্গনূরের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আশানুরূপ গ্রাহক পাইলে আমরা কাগজের আকারে ও সর্বাঙ্গিন উন্নতি সাধনে স্বক্ষম হইব।২৭

এ-সংখ্যায় শেখ হবিবর রহমান 'বিধি প্রসঙ্গ' পাতায় ধর্ম ধর্মতত্ত্ব ও আমিউস শরিয়ত নামে দুটি প্রতিবেদন লিখেন। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি ধর্মকলহ, জাতিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও কপোটতার মূলোচ্ছেদ করিয়া দেশ ও জাতির সেবা এবং সৎ সাহিত্যের উন্নতির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মকে নষ্ট করে বলে শেখ হবিবর রহমান লিখেন–

"বর্ত্তমান সময়ে নেড়ার ফকির, আহমদিয়া বা কাদিয়ানি শিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ বঙ্গের পল্লীতে গমন করতঃ সরল বিশ্বাসী অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইহ ও পরকাল নষ্ট করিতেছে। আল্লাহ চাহেত আমরা আগামী সংখ্যা হইতে ঐ সকল ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের কুটজাল ছিন্ন করিবার জন্য লেখনি চালনা করিতে বাধ্য হইব।২৮

'আমির-উস-শরিয়ৎ' প্রবন্ধে শেখ হবিবর রহমান লিখেন–

"ইতিপূর্বে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গলার পক্ষ হইতে বঙ্গদেশে 'আমির-উস-সরিয়ৎ' নির্বাচিত সম্বন্ধে যে ঘোষণা-পত্র প্রচার হইয়াছিল তৎসমন্ধে বিশদ বিবরণ জানিবার জন্য বহুলোক আঞ্জুমানে চিঠি-পত্র লিখিতেছেন। তাহাদের অবগতির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

জানাইতেছি যে, আঞ্জুমানের কার্য্য নির্বাহক কমিটির গত ২১-শে কার্ত্তিক তারিখের অধিবেশন হইবে, সেই অধিবেশনে কলকাতায় ঐ উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্য একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইবে এবং ঐ বিশেষ সভায় বঙ্গদেশে সমস্ত সম্প্রদায়ের আলেম, ফাজেল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করা হইবেক। বিশেষ কিছু জানিতে হইলে ১৩ নং চাঁদনী চক ফাষ্ট লেন, আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের অফিসে অনুসন্ধান করিবেন।"২৯

মাসিক-পত্র 'বঙ্গনূরের ২য় সংখ্যা বের হয় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২রা পৌষ মাসে। গতানুগতিকভাবে এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যায় শেখ হবিবর রহমানের আলোচিত একটি বিখ্যাত কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার নাম 'তোমারি'। স্রষ্টা বিপুল আয়োজনে সাজিয়েছে এই বিশ্ব পরিমণ্ডল। এতো আয়োজনের প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হয়েছেন শেখ হবিবর রহমান। তিনি স্রষ্টার প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন এই কবিতাটি–

কি মহা বিভব দিয়াছ আমায় গোপনে
হে মম গোপন বিহারী
তোমারি গো আমি তোমারি
চাদিমা যখন হাসে সুমধুর হাসিতে
সাহানার সুর বাজে গো ভোরের বাঁশীতে
ফুটাইয়া তোল এ হৃদ পানে
কত যে মোহন কেয়ারি
হে মম গোপন বিহারী।৩০

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক পত্র 'বঙ্গনূর'-এর দ্বিতীয় বর্ষের ৩য়-সংখ্যা ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২রা মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। গতানুগতিক ধারায় এ-সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এ-সংখ্যাটি প্রকাশের সময় শেখ হবিবর রহমান শাররীকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই পরবর্তী সংখ্যাটি ঠিক সময়ে প্রকাশিত হতে পারেনি। তাই মাঘ-সংখ্যাটির শেষে পত্রিকার ম্যানেজার কৈফিয়ত দেন–

> "বঙ্গনূরের প্রতি বাঙ্গলা ১লা প্রকাশিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম এবং দয়াময়ের কৃপায় পরপর দুই মাসকাল যথাসময়ে পত্রিকা বাহির করিতেও সক্ষম হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় পৌষ সংখ্যা বাহির করিবার পর আমাদের সম্পাদক সাহেব পীড়িত হন। তার পীড়া ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ফলে গত ২৫ শে ডিসেম্বর হইতে তিনি শয্যাগত হইয়া পড়েন। প্রায় দেড়মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। আল্লাহ্‌র ফজলে এক্ষণে তিনি অনেকটা সুস্থ হইতে পারিয়াছেন। সেই কারণে আমরা যথাসময়ে মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা বাহির করিতে সক্ষম হই নাই। দয়াময়ের কৃপায় মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ফাল্গুন সংখ্যা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের মধ্যে খেদমতে লইয়া হাজির হইব বলিয়া আশা করি।"৩১

'বঙ্গনূর' পত্রিকাটি আর কখনো প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শেখ হবিবর রহমান আর কখনো এই পত্রিকার সম্পাদক হননি। শেখ হবিবর রহমান 'বঙ্গনূর' ছেড়ে আবারো চলে যান শিক্ষকতা পেশায়। দীর্ঘদিন পর শেখ হবিবর রহমান আবারো আরো একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আত্মপকাশ করেন। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম 'ঊষা'। পত্রিকাটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেন শেখ হবিবর রহমান ও শ্রী বিশ্বেশ্বর নন্দী। এ-পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ ও

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায়নি । ১৩৫৬ সালের ২রা শ্রাবণ প্রকাশিত হয় পত্রিকার শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা। এ ফোর সাইজের এই পত্রিকাটির প্রথমে ডাঃ সত্যেন্দ্র দাসের 'ভুলি নাই প্রিয়' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। নিচে লাল এবং উপরে সাদা রঙে লেখা হয় শেখ হবিবর রহমান, শ্রী বিশ্বেশ্বর নন্দীর সম্পাদকীয়। এক কোনে লেখা ৪র্থ বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা। মূল্য দেড় টাকা। তাছাড়া 'রাধা রানী ও 'রক্তের টান' সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাপা হয় পৃষ্ঠা জুড়ে। তারপর ছাপা হয় সূচিপত্র। ১৩৫৬ সালের শারদীয়-সংখ্যায় ছাপা হয় স্বামী ভুমানন্দের 'আয়াহি বরদে দেবী' (প্রবন্ধ), অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'মস্তিস্ক বিকৃতি', শেখ হবিবর রহমানের কবিতা 'বনের পাখী', অধ্যাপক শ্রী শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর প্রবন্ধ 'বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি', নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'রাতে ও প্রভাতে', ডাঃ সত্যেন্দ্র দাসের উপন্যাস 'ভুলি নাই প্রিয়', শ্রী বটকৃষ্ণদের কবিতা 'আকাশের সুর', বাণী সেনের কবিতা 'অভিমান', শ্রী দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা 'অরণ্য', শ্রী সুশীলকৃষ্ণ দাসের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র কাব্যে ভাষার রূপ', শ্রী প্রফুল্ল রায়ের কবিতা 'খেয়াপার', বন্দে আলী মিয়ার গল্প 'জীবনের একটি অধ্যায়', ছাপা হয়। সবশেষে চলচ্চিত্রের একটি বিভাগ নিয়ে ছাপা হয় 'ছায়া ও কায়া' নামের একটি বিভাগ। এতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে টেনিশ শিক্ষা, পুতুল নাচের ইতিকথা, দিনের পর দিন, বিষের ধোয়া, মায়াজাল, প্রতিধ্বনি, সিংহদ্বার, শেষ মুহূর্ত ছবি সম্পর্কে আলোচনা ছাপা হয়। সূচিপত্রের শেষে অনেক বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। এ সংখ্যায় শেখ হবিবর রহমানের বিখ্যাত কবিতা 'বনের পাখী' ছাপা হয়। কবিতাটির অংশ বিশেষ হল–

বনের পাখী আপন মনে

Dhaka University Institutional Repository

উড়ে বেড়ায় বনেতে
তাই না দেখে কি যে ব্যথা
জাগে আমার মনেতে

দ্বিতীয় অন্তরায় কবি লিখেছেন–

বনের পাখী কত মধুর
কত ভাবে গাহে যে
মনটি আমার সকল ভুলে
তারেই শুধু চাহে যে

পাখীর গানের সাথে কবির হৃদয়ের গান একই সুরে বাজে। তাই কবি লিখেছেন–

তারি গানের সাথে হৃদয়
কত কি গান গাহে যে। ৩২

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. আব্দুল মজিদ। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (জীবনী সিরিজ), বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা-৯

২. বঙ্গনূর, ১৫ ডিসেম্বর-১৯১৯, সম্পাদক : শেখ হবিবর রহমান

৩. ঐ, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা-১৯১৯

৪. ঐ

৫. ইসলাম দর্শন (মাসিক পত্র), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-১৩২৬

৬. আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২৬–২৭

৭. আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৮২–৮৪

৮. মাসিক সচিত্র আল এসলাম, শ্রাবণ-১৩২২, ৪র্থ সংখ্যা

৯. ঐ, পৌষ ৯ম সংখ্যা-১৩২২

১০. ঐ, মাঘ ১০ম সংখ্যা

১১. ঐ, ১৩২২ (ফাল্গুন), ১৩ম সংখ্যা

১২. বঙ্গনূর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা-১৯১৯

১৩. ঐ। আফ্রিকায় বাঙ্গালী (মোসলেম কীর্ত্তি-প্রবন্ধ)

১৪. ঐ

১৫. ঐ, ২য় সংখ্যা, ১৩২৬ পৌষ

১৬. ঐ, ৩য় সংখ্যা, ঐ, মাঘ

১৭. ঐ, ৪র্থ সংখ্যা, ঐ ফাল্গুন

১৮. ঐ, ৫ম সংখ্যা, ঐ, চৈত্র

১৯. ঐ

২০. ঐ, ৭ম সংখ্যা, ১৩২৭ জৈষ্ঠ্য

২১. ঐ, ৮ম সংখ্যা, ঐ, আষাঢ়

Dhaka University Institutional Repository

২২.ঐ, ৯ম সংখ্যা, ঐ, শ্রাবন

২৩.ঐ, ১০ম সংখ্যা, ১৩২৮ অগ্রহায়ন

২৪.ঐ, ১১তম সংখ্যা,ঐ, আশ্বিন

২৫.ঐ, ২য় বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, ১৩২৮ কার্ত্তিক

২৬.ঐ, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঐ, অগ্রহায়ন

২৭.ঐ, ২য় সংখ্যা, ঐ, পৌষ

২৮.ঐ

২৯.ঐ

৩০.ঐ

৩১.ঐ, ৩য় সংখ্যা, ঐ, মাঘ

৩২.মাসিক ঊষা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শেখ হবিবর রহমান ও বিশ্বেশ্বর নন্দী সম্পাদিত, ১৩৫৬ শ্রাবণ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী এবং উৎফুল্ল ও প্রাণোজ্জ্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পেশাগত পর্যায়ে তিনি ছিলেন অতিশয় গম্ভীর দৃঢ়চেতা। তাঁর মেজাজ তাঁর রচনাবলীতে সুস্পষ্ট। কাব্য-সাহিত্যে তাকে প্রেমিক, নৈসর্গিক সৌন্দর্যপ্রিয় এবং গীতিতন্ময় অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তিনি একাধারে ভাবুক, দৃঢ়চিত্ত, কঠিন বাক্যাবলীর আবরণে কঠোর এবং যুক্তিবাদী। শিশু-সাহিত্য কিংবা রোমাঞ্চকর কল্প-কাহিনীর লেখকরূপে শেখ হবিবর রহমানের মধ্যে পাওয়া যায় আরেক ভিন্ন মানুষের পরিচয়। বৈঠকি ঢং-এ গল্প ও কল্প-কথার ফানুস উড়িয়ে পাঠকদের মোহিত করতে তিনি ছিলেন নিবেদিত নিষ্ঠাবান।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন বন্ধু-বৎসল ছিলেন। জীবনে যে পর্যায়ে যার সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, তৎক্ষণাৎ তার সাথে সখ্য স্থাপন করেছেন এবং আজীবন সে সম্পর্ক রেখেছেন অটুট। 'আমার সাহিত্য-জীবনে'র পাতায় পাতায় অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সাহচার্যের, সখ্যতার, কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে বারবার। তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে যে পর্যায়েই যার যতটুকু সাহায্য-সহযোগিতা, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, তা সশ্রদ্ধচিত্তে

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করেছেন আমৃত্যু। তার এ ব্যক্তিগত ঔদার্যের কারণে সমকালীন মশহুর সাহিত্য সংস্কৃতিসেবী সকলের সাথে তার ছিলো আন্তরিক যোগাযোগ। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, অবিভক্ত বাংলার স্পীকার সৈয়দ নওশের আলী প্রমুখের কাছে তিনি ছিলেন অতি পরিচিত আপনজন। সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রে আবুল কালাম সামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) এর সাথে কলম যুদ্ধের তিক্ত সম্পর্ক তাদের ব্যক্তিগত জীবনের মধুর সম্পকর্কে কখনো প্রভাবিত করতে পারেনি। আবুল কালাম সামসুদ্দিন তার 'অতীত দিনের স্মৃতি'তে তা উল্লেখ করেছেন।

শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্য-সেবার কাল মূলত বিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত। একদিকে সময়টা ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একটা বিরাট পালা বদলের, অন্যদিকে এই সময়ের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল বেশকিছু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনশীল ক্রান্তিকালের মধ্যে বিকশিত শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্যচর্চা। তাঁর সাহিত্যকর্ম পরিমাণ ও সংখ্যাগত দিক থেকে যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে শেখ হবিবর রহমানের সৃজনী প্রতিভা, চিন্তা-চেতনা এবং মনন কতটা বিকশিত হয়েছিল, তা তাঁর সাহিত্যের মধ্যে অবগাহণ করলে উপলব্দি করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত রোমান্টিক ভাবকে প্রায় অধিকার করে বস্তুবাদ চেতনার বিকাশ সাধিত হয়েছে, যার প্রতীক ভু-কল্লোল আন্দোলন। সাথে সাথে রবীন্দ্র-চেতনার লীলা-রহস্য থেকে মুক্ত হয়ে, সাহিত্যে জীবনবাদিতার সূত্রপাত ঘটেছে, যার মূলে কাজ করেছে কালগত প্রভাব। মানবিক অবিশ্বাস, জীবনের অনিশ্চয়তা প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্ররসরমানতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে বিশ্ব জুড়ে। বাংলা সাহিত্যেরও দিক পরিবর্তন ঘটেছে, তার চলার পথ হয়ে উঠেছে ঋজু, ইন্দ্রিয়জ, অভিজ্ঞতাজাত সব মিলিয়ে ধ্রুপদী। এই কালিক প্রেক্ষাপট শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্য সৃষ্টির কাল।[১]

বস্তুত এই কালগত মননধর্ম এবং এই অবক্ষয়ী যুগ-চেতনা মূল্যবোধ হবিবর রহমানের সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেনি। পক্ষান্তরে শেখ হবিবর রহমানের সৃজনশীল মানস গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের নীতি প্রবণতা, সামাজিক হিত এবং আদর্শগত বোধ সঞ্জাত মধুসূদন, হেমচন্দ্র. নবীন চন্দ্র, কায়কোবাদ প্রমুখ কবি মহাকাব্যিক ও খণ্ড কবিতার উত্তরাধিকারে। শেখ হবিবর রহমানের বিশাল বিস্তৃত এবং বিচিত্র সাহিত্য রচিত হয়েছে সম্পূর্ণই উনিশ শতকের উত্তরাধিকালকে বহন করে। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের মধ্যে লালিত হয়েও রবীন্দ্রনাথের আধুনিক আবহ থেকে তিনি দূরে থেকে গেছেন। কল্লোল যুগের আন্দোলন তাঁর সাহিত্যে মননে প্রভাব বিস্তার করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তব চিন্তা-চেতনাকে প্রত্যাখানই করেছেন। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা তার সহযাত্রি সৈয়দ আবুল হোসেন, কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখের সাহচর্যগত প্রভাব তার সাহিত্যে মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

হিতৈষণার স্বপ্নে গড়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যিক মন। যে-কারণে শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্যে মুসলমান সমাজের সামাজিক পুনরুদ্ধারের প্রয়াসটি দেখা দিয়েছে প্রবলভাবে। শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্য মননের মূল উৎস ছিল মুসলমান জাতীয়তাবোধ এবং একটা প্রগাঢ় ধর্মীয় অনুভূতি। বাঙালি মুসলমান সমাজ-জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা চর্চা ও আগ্রহকে তিনি অনুভব করেছিলেন জাতীয় জাগরণ-প্রত্যাশায়। এই অর্থে তিনি তাঁর সাহিত্যে যতটা ছিলেন ঐতিহ্য ও আদর্শানূসারী, সমকালীন জীবনাবাদ তাঁকে গ্রাস করেনি।

বস্তুত মুসলিম ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরব-গাথা রচনার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজের নবজাগরণ কামনা করেছিলেন তিনি তার রচনায়। তাই তার সাহিত্য-সাধনার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল সুগভীর আল্লাহপ্রেম, প্রবল নীতিবোধ, আন্তরিক স্বধর্মপ্রীতি ও অবিচল সমাজ-হিতৈষণা।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন অধ্যাবসায়ী, ধর্মপরায়ণ, নীতিনিষ্ঠ, ভাববাদী এবং জাতীয়তাবাদী লেখক ছিলেন। বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে একান্তভাবে নিজের উদ্যোগে তিনি সাহিত্যের পথিক হয়েছিলেন। নানান বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে তিনি ত্রিশের দশকে নিজের চল্লিশ বছর বয়স সীমার মধ্যেই ২৫ খানি প্রকাশিত গ্রন্থের প্রন্থকার হতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ কৈশোর ও তরুণ বয়সের রচনা কিন্তু পরবর্তী তিন দশকে প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশ হওয়া থেকে এটা প্রতীয়মান হয়– তিনি তাঁর সময়ে একজন সফল সাহিত্যিক ছিলেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে নতুন ধারার

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন না হওয়া পর্যন্ত শেখ হবিবর রহমানের রচনারাজি খুব আদরণীয় ছিলো।২

নিজের সাহিত্য-সাধনা ও রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন–

> "আমার সাহিত্য বরাবর মোল্লা ধরনের, এইজন্য ইহা অনেকের নিকট উপেক্ষিত। নিয়ামত, আবে হায়াত ইত্যাদি ধরনের পুস্তকের নাম বোধ হয় মুসলমান সমাজে আমিই সর্বপ্রথম রাখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমার বিবিধ পুস্তকে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার এত অধিক যে, আমাদের মধ্যে আর কেহই তত অধিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। জাতীয়ভাবে জাতীয় শব্দের সংমিশ্রণে জাতীয় সাহিত্যর সৃষ্টি আমার জীবনের প্রধান একটি সাধনা।" ৩

তাঁর সাহিত্য-সাধনার মুলে ক্রিয়াশীল ছিল, সুগভীর আল্লাহপ্রীতি, প্রবল নীতিবোধ ও সমাজ হিতৈষণা। তার সাহিত্যিক মনের উপর 'নীতিবোধ' ও 'সমাজহিতৈষণা' বরাবরই আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। 'আলমগীর' উপন্যাসে, 'নিয়ামতে'র গল্পগুলোতে, প্রবন্ধ পুস্তকসমূহে এবং 'গুলশান' ও 'বাঁশরী'র অধিকাংশ কবিতায় তা সুস্পষ্ট। মুসলিম ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবগাথা রচনার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণ সৃষ্টিতে তিনি এক নতুন প্রেরণাদায়ক মাত্রা তিনি যোগ করতে চেষ্টা করেছেন। খান বাহাদূর আহসানউলাহ তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে–

Dhaka University Institutional Repository

''শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পারস্যোদ্যান হইতে বহু যত্ন সহকারে বিবিধ দুর্লভ কুশুম চয়ন করিয়া ভক্তপ্রাণ মুসলমানদিগকে যে মনোরম উপহার প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের নিকট ধন্যবাদার্হ। তাহার কবিতা পাঠে ভক্ত জীব বিশ্বরহস্য ভেদ করিয়া অলক্ষ্যে স্বীয় মহবুবের সহিত প্রেমালাপ করে। ইহা পাঠে মরুহৃদয় সিক্ত হয়, দগ্ধপ্রাণও শান্তি লাভ করে।''[৪]

সাহিত্যক্ষেত্রে কবির অবদান সম্পর্কে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন–

"শেখ হবিবর রহমান কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ, অনুবাদ, শিশুপাঠ্য প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দর সরল রচনার দ্বারা মাতৃভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পারস্যের গুলিস্তান বা পুষ্পোদ্যান এবং বুস্তান বা সৌরভোদ্যানকে তাহার সুন্দর অনুবাদের দ্বারা তিনি বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (তিনি) ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের একজন সমঝদার আলেম। শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর বাংলা অনুবাদের সহায়তায় বাংলাদেশের সাহিত্য শুকগণের সম্বন্ধে এখন অমর কবি হাফিজ সম্পর্কে বলিতে পারা যাইবে–

শকুর-শিকন্ শওঅন্দ হমহত্তু ত্বীয়ান ই-হিন্দ

জ্বীন ক্বন্দই পারসী কিহব বাঙ্গালাহ্ মি-রও-আদ।

Dhaka University Institutional Repository

এই যে পারস্যের খণ্ড বা মিছরি বাংলাদেশে যাইতেছে, তাহা হইতে ভারতের শুকগণ শর্করামোদি হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসী শব্দ ও সাহিত্যিক সৌরভ প্রয়োগ ও আমদানীর ক্ষেত্রে শেখ হবিবর ছিলেন সার্থক পথিকৃৎ।

শেখ হবিবর রহমানের ভাষার ব্যবহার ছিল সাধু বাংলায়, তবে তিনি চলিত বাংলায়ও লিখতে পারতেন। কাব্যে মাইকেলী যুগের স্থূল সৌন্দর্যের বর্ণনায় তিনি নিপুণ হাতের অধিকারী ছিলেন। তার কল্পনা সুললিত ও শুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ পেলেও স্থূল বাস্তবকে অতিক্রম করে তা বহুদুর অভিসারী। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয় ছন্দে কাব্য রচনায় তার ছিল স্বচ্ছন্দ বিহার। তার কবিতার ভাষা সহজ সরল ও সাবলীল এবং গীতি মাধুরীতে ভরপুর। প্রকৃতি চেতনা তার কবি মানসের একটি স্বভাবজাত ধর্ম। প্রকৃতির শান্ত সমাহিত নিরাসক্ত রূপ ও সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন বিমুগ্ধ বিমোহিত।"[৫]

কবি ছিলেন মানবতাবাদী এবং মানবতার নিঃশর্ত কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর আদর্শ। 'বঙ্গনুরে'র সম্পাদকীয়তে একাধিকবার তাঁর প্রগাঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে। ভারত-বিভাগের প্রাক মুহূর্তে কলিকাতা থেকে ঊষা পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে জাতীয় আদর্শ, মানবিক মুল্যবোধ ও সমাজ গঠনমূলক পরামর্শ ও প্রত্যয় ছিলো সুস্পষ্ট।

দেশের সকল মানুষের মধ্যে সহজাত সম্প্রীতির বন্ধন আরো দৃঢ়তার হোক ,সম্ভ্রমবোধ ও সুনীতির পৃষ্ঠপোষকতা প্রবৃদ্ধি লাভ করুক, শেখ হবিবর রহমানের আজীবন সাহিত্য-

Dhaka University Institutional Repository

সাধনার এই ছিল মুল প্রত্যাশা। তিনি ছিলেন সেই বিরলপ্রজ সাহিত্য পথিকদের একজন, যারা ব্যক্তিগত জীবনে সমাজ-সংসারের উর্ধ্বে থেকে সৃজনশীলতায় নিয়ত নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কর্ম বর্তমান সময়ও সমাজ মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে উত্তরণের পথযাত্রায় আর সত্যানুসন্ধানে প্রচুর প্রেরণা যোগাবে নিঃসন্দেহে। কেননা, তিনি ছিলেন ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠ। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন–

> ‘‘আমি নিজের জীবনের নীতি (princiople) অনুসারে চলিতে সর্বদাই সতর্ক। ইহাতে অনেকে অনেক সময় বিরক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এজন্য আমি সকলের নিকট বিনীতভাবে ক্রটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করি।
>
> আমি আমার জীবনের সমস্ত কর্তব্যের উপরে বরাবর সাহিত্যের স্থান দিয়া আসিয়াছি। আমি আমার জীবনের নীতি রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য অগাধ স্বার্থ বিসর্জন দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিয়াছি। স্কুল পাঠ্য পুস্তক লিখিবার জন্য কত লোক কত সময়েই না আমাকে কত উপদেশ দিয়াছেন; আর্থিক লাভের কমনীয় প্রলোভন সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্যাদারির দিকে – প্রতিযোগিতার ভীষণ সংগ্রামের দিকে কখনোই আমার মন আকৃষ্ট হয় নাই। আমার ধারণা এই যে, সাহিত্য দেশের ও সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্পদ। খোদাতালা যাকে সে সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা ও প্রতিভা দিয়াছেন, তাহার অন্যদিকে আত্মনিয়োগ করা কিছুতেই উচিত নহে।”[৬]

১৯১৫ সালে যশোহরে অনুষ্ঠিত নবম 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে' পাঠের জন্য 'জাতীয় সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধটি 'যশোর খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতি'র পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছিল। প্রবন্ধে 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানি ভাব ও শব্দ' ব্যবহারের জোর দাবি থাকায় প্রবন্ধটি সম্মেলনে পাঠের জন্য গৃহীত হয়নি। প্রবন্ধে গৃহীত না হওয়ায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান 'মোহাম্মদী'–পত্রিকায় তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে শেখ হবিবর রহমান উল্লেখ করেন–

> "যে জাতি বড় হইয়াছে, সাহিত্যের সাহায্যেই হইয়াছে। সাহিত্যই সমস্ত জাতিটাকে মাড়াইয়া একলক্ষ্যে পরিচালিত করিয়াছে। দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় মুসলমানগণের এই জাতীয় সাহিত্য নাই বা যাহা আছে তাহা এত দুর্বল যে, তাহা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা সুদূর পরাহত।
>
> বঙ্গীয় হিন্দুগণের সাহিত্য এ হিসাবে অনেকটা উন্নত। হিন্দুয়ানী বাঙ্গলা ও মুসলমানী বাঙ্গলার মধ্যে বেশ পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। যদিও বর্ত্তমানে একদল মুসলমান আরবী-পারসী বর্জিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন, তথাপি আরবী পারসী মিশ্রিত বাঙ্গলাই প্রায় সমগ্র মুসলমানদের লিখিত ও কথিত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুঁথি সাহিত্যই মুসলমান সমাজের পনের আনা লোকের প্রকৃত সাহিত্য।
>
> হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি কেবল নিজ নিজ স্বতন্ত্র জাতীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উভয় জাতি মিশিয়া যাহাতে একটি বিরাট জাতীয়তার পত্তন হইতে পারে; তাহার চেষ্টা করা সবের্ক্ষাতোভাবে কর্ত্তব্য। হিন্দু হিন্দুকে, মুসলমান মুসলমানকে

Dhaka University Institutional Repository

আপন মনে করুণ, তাহাতে আপত্তি করা শোভা পায় না। কিন্তু আর এক স্তর অগ্রসর হইলে যে হিন্দু মুসলমান সবই আপন, একথা ভুলিয়া গেলে ত ভালো দেখায় না।

বাঙ্গলার অর্দ্ধেকের অধিক অধিবাসী মুসলমান। তাহারা কথিত ভাষায় নিত্য যে শব্দ ব্যবহার করে, তাহাদের লিখিত সাহিত্যে তাহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইবে কোন্ যুক্তি বলে? বাঙ্‌লা যদি তাহাদের নিজের ভাষা হয়, তবে তাহাদের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ভাষা নিশ্চয়ই তাহাতে স্থান পাইবে।

কথা উঠিতে পারে কথিত ভাষা সাহিত্য চালাইতে গেলে সাহিত্যের সবের্ব্বাজনীনতার ব্যাঘাত হইতে পারে।"৭

'সাহিত্য সমালোচনা' (আল এসলাম, পৌষ ১৩২৩) প্রবন্ধটিতে সমালোচনা সাহিত্যের ওপর তাত্ত্বিক আলোচনা পেশ করার পর প্রবন্ধকার সমালোচনা সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু বাস্তব সম্মত মন্তব্য করেন। বিশেষ করে তিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনা সম্পর্কে সম্প্রদায়ের লেখকদের বিরূপ সমালোচনার পরিবর্তে গঠনমূলক সমালোচনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। 'কলকাতা সিদ্দিকীয়া সাহিত্য সমিতি'তে পঠিত এ-প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যে স্বাতন্ত্র বিনির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন–

"মুসলমান গ্রন্থকারগণের কর্ত্তব্য তাঁহারা মুসলমান সমাজকে তাহাদের স্বকীয় বিশেষ স্থান হইতেই দর্শন করিতে শিখান। পরের চিত্র যাহাতে তাহারা পরের চিত্র বলিয়া বুঝিতে পারে এবং আপনার দিক হইতে দেখিলে তাহা কেমন দেখায়, তাহাও

Dhaka University Institutional Repository

যাহাতে তাহাদের হৃদয়াঙ্গম হয়, এ চেষ্টা মুসলমান লেখকগণের করা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আপনাদের দিক হইতেও সাহিত্যের চিত্র আকিয়া আমাদের জাতীয় জীবন উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা বিরাট মুসলমান সমাজ বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত হিন্দু সমাজের চিত্রই আপন চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত ও পতিত হইতে থাকিবে।"৮

এ প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্য-সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্তারোপ করে প্রবন্ধের উপসংহারে বলেন–

"আমাদের সমাজে বর্ত্তমানে সাহিত্য সমালোচনার একান্ত অভাব। সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য গঠিত ও সুপরিচালিত করিতে হইলে একটি শক্তিশালী সাহিত্য-সমিতি এবং তাহার মুখপত্র স্বরূপ একখানি সুবৃহৎ মাসিকের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহাতে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে সাময়িক সাহিত্য পুস্তকাদির সমালোচনা প্রকাশিত করিতে হইবে। বর্ত্তমানে এই সাধনাই আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান জাতীয় সাধনা হওয়া আবশ্যক। এই সাধনায় আমরা সফলকাম হইলে দেখিতে পাইবে অন্য সমস্ত সাধনা আমাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।"৯

'আমাদের সাহিত্যিক অবসাদ' (আল এসলাম, শ্রাবণ ১৩২৩) নামক আর একটি প্রবন্ধও 'কলকাতা সিদ্দিকীয়া সাহিত্য সম্মেলনে' পাঠ করা হয়েছিল। প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন সাহিত্য-সাধনার পরিবেশে মুসলমান লেখকদের 'অবসাদ', 'পশ্চাদপরতা' ও 'পরমুখাপেক্ষিতার' স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন এবং কিভাবে তাহাদের মধ্যে 'আত্মসচেতনতা'

বৃদ্ধি ও বিকশিত হতে পারে, সে বিষয়ে গঠনমূলক বক্তব্য ও পরামর্শ পেশ করেন। বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই সাহিত্য বিকাশ লাভ করে, এই মত প্রকাশ করে তিনি চিন্তাশীল ও বাদানুবাদ যুক্তিতর্কানুমোদিত প্রবন্ধ রচনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে মাসিক পত্রিকাগুলোর ভূমিকা বেশি বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ হবিবর রহমান মুসলমান সমাজের সাহিত্যিক অবসাদের একটি বিশেষ কারণের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

> "আমাদের সাহিত্যিক অবসাদের আর একটি কারণ, আমাদের পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকগণ। প্রকাশক কথাটি যে কেবল কথার ছাপাই তাহা অনেকেই জানেন। জনগণের মধ্যে পুস্তক বিক্রয় করিয়া প্রায়ই নিয়মিতভাবে তাহার মূল্য দেওয়া হয় না। দরিদ্র লেখক ত অনেক স্থানে পুস্তকাদি ছাপাইতে অক্ষম। তাহাদের সময়ের ও অর্থের অভাব; অথচ আবার কেহ যথেষ্ট টাকা খরচ করিয়া পুস্তক ছাপাইলে পুস্তক বিক্রেতাগণ তাহার মূল্য দেন না। সামান্য দিলেও ঘুরাইয়া বিরক্তির এক শেষ করিবে। এই সমস্ত ভণ্ড বিক্রেতাদিগের অত্যাচার হইতে নিরীহ গ্রন্থাকারগণকে উদ্ধার করিতে হইবে। যাহারা পুস্তক ছাপাইয়াছেন, তাহারাই জানেন প্রতিপদে কত বিড়ম্বনা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয়। এই সমস্ত জুয়াচোরগণের নাম সাধারণে প্রকশিত করিয়া তাহাদের অন্যায়াচরণের প্রতিবাদ করিতে হইবে।"[১০]

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য-সাধনার দ্বারা সমাজকে জাগিয়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয় মুসলমান সাহিত্য সেবকদের প্রতি। কেননা, দেশের জাতির সার্বিক কল্যাণ সাহিত্য-সাধনা ব্যতীত সফল হয় না।

১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মূলত বিস্তৃত শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সাহিত্য সাধনার কাল। প্রথম দিকে কাব্যে এবং মধ্য ও শেষ পর্যায়ে গদ্য রচনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন। কাব্য সাধনায় সমসাময়িক আরো অনেক কবির মতো তিনিও মূলত : উনিশ শতকের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। প্রবল নীতি নিষ্ঠা ও তীব্র সমাজ-হিতৈষণার সঙ্গে যুক্ত উনিশ শতকী আদর্শে খণ্ডকাব্য ও মাহাকাব্য রচনার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। গত যুগের আদর্শ নিষ্ঠার কারণেই, রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার আদর্শানুসারী হয়েও রবীন্দ্র-সাহিত্যের আধুনিকতার বলয়ে তাঁর প্রবেশ ঘটেনি। এ কারণেই সমকালীন প্রবীণ পাঠকেরা তাঁর কাব্যে যতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন, সে তুলনায় নবীনেরা তাঁর সমাদর করেননি।

প্রথম গ্রন্থ 'পারিজাত' প্রকাশিত হওয়ার পর সমকালীন সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় (মুসলমান সম্পাদিত ও প্রকাশিত) তাঁর ব্যাপক প্রশংসা ও প্রচার লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আবে হায়াৎ'- এর উপর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকায় ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বিশেষ আলোচনা লেখেন। কিন্তু তাঁর 'কোহিনুর' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। কৈশোরকালে বিশেষ উন্মাদনা ও আবেগের বশে রচিত এ কাব্যগ্রন্থের প্রতি সমকালীন সুধী সমাজের সপ্রশংস আগ্রহ শেখ হবিববর রহমান প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৬ সালের রচনা ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে এক যুগের যে

Dhaka University Institutional Repository

কালিক ব্যবধান ঘটে গেছে এবং এ কাল পরিক্রমায় একটি মহাযুদ্ধ সংগঠনের ফলে মানুষের মূল্যবোধ ও আবেগ-অনুভূতিতে যে পরিবর্তন আসে, সে প্রেক্ষাপটে তার প্রত্যাশা পূরণ সম্ভবপর হয়নি। প্রিয় কাব্যের এ-রকম উপেক্ষার ওপর আরেকটি মর্মস্পর্শী আঘাত আসে সওগাত আশ্বিন-১৩৩৩ সংখ্যায় আবুল কালাম সামসুদ্দিন-লিখিত 'কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান' শীর্ষক নিবন্ধের একটি অংশে–

> "কাব্যদর্শ সম্বন্ধে ইনি (শেখ হবিবর রহমান) কথঞ্চিত সচেতন হইলেও ইহার এই কাব্যের চেতনা নিতান্তই নিরস ও কবিত্বশূন্য। কাব্যের বিষয় নির্বাচনে ইনি যথেষ্ট রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্য ও ঘটনা বিন্যাস কৌশল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকায়, ইহা কতগুলি তত্ত্বকথার সমাবেশ ও চরিত্রাখ্যানে পর্যবসিত হইয়াছে। তাই ইহা পড়িয়া কতগুলি ভাল ভাল তত্ত্বকথা শিখা যায় বটে, কিন্তু কাব্যরস-পিপাসা তাহাতে বিন্দু মাত্র মিটে না।"[১১]

অগ্রহায়ন ১৩৩৩ সওগাতে বাদ-প্রতিবাদ কালামে শেখ হবিবর রহমান প্রতিবাদ করে বলেন– "সমাজ কি সওগাতের কথাকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন?" [১২]

তিনি আশা প্রকাশ করেন, নিজ নিজ অনুভূতি দিয়ে কাব্যপ্রিয় পাঠক তার কাব্যগুলি যাচাই করবেন।

"কোহিনুর" কাব্যগ্রন্থের বিরূপ সমালোচনার প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় 'মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ সাহিত্য-সভায় কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল মজিদ 'কোহিনুর' কাব্যগ্রন্থের উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে 'কোহিনুর' কাব্যগ্রন্থেরকে ধ্রুপদী সাহিত্যের ও মহাকাব্যের শ্রেণীভুক্ত বলে নির্দেশ করা হয়।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সমকালীন প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকগণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর 'শের সংহার' কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মুন্সি মেহেরুল্লাহ তরুণ কবি শেখ হবিবর রহমানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সাধ্য থাকলে ঐ কাব্য প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এটি যথেষ্ট বদান্যতা প্রকাশ এবং নবীন সহযাত্রীর প্রতি অকৃত্রিম উৎসাহ প্রদানের বিষয়।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সাহিত্যকর্ম মুল্যায়ন করে তাঁকে ৬ মে ১৯৪৬ তারিখে লিখেছিলেন–

> "আপনি মুসলমানদের জন্য যে সাহিত্য সঞ্চয় করিয়াছেন এবং করিয়া চলিয়াছেন, তাহার মুল্য আর কাহার কাছে কিরূপ, সে বিষয়ে আমি কিছু অবগত না হইলেও ইহার মূল্য আমার নিকট কতখানি, সে বিষয়ে লিখিতে গেলে বাস্তবতার অপবাদ আমায় আরোপিত হইবার আশঙ্কা আছে।"[১৩]

পূবেই বলা হয়েছে, শেখ হবিবর রহমান জীবনের প্রথম দিকে করেছিলেন কাব্য-সাধনা এবং তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে শেষ পর্যায়ে করেছিলেন গদ্যচর্চা। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

> "শ্রীযুক্ত মৌলভী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সাহেব সুসাহিত্যিক। কবিতা, কাব্যগ্রন্থ, ছোট গল্প, উপন্যাস, শিশুপাঠ্য গ্রন্থ, ইতিহাস, জীবনী, অনুবাদ ও ভ্রমণ কাহিনী এতগুলি বিষয়ে তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এইসব বিষয়ে সুন্দর ও সরল রচনা দ্বারা তিনি মাতৃভাষার ভন্ডার সমৃদ্ধ করিতে সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন।"[১৪]

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যের সকল ধারায় স্বচ্ছন্দে বিহার করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টির প্রাচুর্যে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। এর একটি ধারাকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলে সে সত্য স্পষ্ঠ হয়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'পারিজাত' শেখ হবিবর রহমানের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের গ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা ছিল চল্লিশটি। এ কাব্যে তাঁর কাব্য সাধনার মূল সুরটি ধরা পড়েছিল, একদিকে আল্লাহপ্রীতি ও জাগতিক অনিত্যতা, অপরদিকে মানব-প্রেম ও কর্মের প্রতি আহবান। এছাড়া এ-কাব্যে সুফিবাদের প্রভাবও লক্ষ করা যায়।

'বাঁশরী' কাব্যগ্রন্থটি মূলত রবীন্দ্র প্রভাবে প্রভাবিত। কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন 'রবীন্দ্র বাবুর লেখার উপর তাঁর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না'। কিন্তু ক্রমে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য কাব্যের তিনি ভক্ত হয়ে উঠেন এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের ধারাটি 'বাঁশরী'তে অনুসরণ করেন। 'বাঁশরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অনুভবের সমীকরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাক্য বিন্যাসে রবীন্দ্রাসুরণ সার্থকতা লাভ করেনি। প্রসঙ্গত 'গুলশান' কাব্যটিতে রবীন্দ্র-প্রভাব আরো বেশি লক্ষণীয়, তবে এ কাব্য গুলোতে কবির আদ্যন্ত ভাবের ঐক্য নেই। এ-কাব্যটিকে শেখ

Dhaka University Institutional Repository

হবিবর রহমানের মিশ্র ভাবের কাব্য বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মুসলিম পুনর্জাগরণ দিয়ে শুরু, প্রেম-প্রকৃতি অতিক্রম করে ব্যঙ্গ কবিতা দিয়েই শেষ।

শেখ হবিবর রহমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'কোহিনূর কাব্য'। শেখ হবিবর রহমানের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, নয় স্বর্গে বিভক্ত এই মহাকাব্যের আবেদন সাধারণত পাঠকের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই কাব্যটি নিয়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রচুর। এ-কাব্যে চরিত্রগুলোর বর্ণনা আছে, কিন্তু বিকাশ নেই। তবে কোহিনূর কাব্যে রসের সন্ধান পাওয়া যায়।

শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্যকীর্তির চূড়ান্ত বিকাশ বলা যায় তাঁর অনুবাদ-কর্মে। বিশ্ব-সাহিত্যে পারস্যের কাব্য সম্পদ অতুলনীয়। শেখ সাদী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রমুখের কাব্য সুষমায় বিশ্বসাহিত্য শুধু নন্দিতই নয় বন্দিত। পারস্যের কাব্যকুঞ্জের সুষমা-ধারাকে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা বেগবান করেছিলেন, শেখ হবিবর রহমান তাদের অন্যতম। তিনি তাঁর শিক্ষা-জীবনের শুরুতে পারস্য ভাষা শিখেছিলেন। এই ভাষার সাহিত্যর অমিয় মাধুরী তাঁর হৃদয়ের মাধুরীকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। আর তাই তিনি পারস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শেখ সাদীর অমর কাব্য গুলিস্তার প্রথম বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। শুধু অনুবাদের জন্য তিনি অনুবাদ করেননি, সাদীর কবিতার তত্ত্ব, নীতি, সরলতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখ হবিবর রহমান তাঁর বাংলা অনুবাদে উপহার দিতে সমর্থ হন। বাংলা ভাষায় সম্ভবত শেখ সাদীর কবিতার প্রথম অনুবাদক শেখ হবিবর রহমান। শেখ সাদীর

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। মূল গুলিস্তার ভাষা মূলত গদ্য এবং বয়াত পদ্যে রচিত। তিনি তার অনুবাদে এই রীতি অনুসারী। বরং অনুবাদকে আরো বেশি প্রাঞ্জল করতে তিনি টিকা টিপ্পনির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কবি শেখর কালিদাস রায় হবিবর রহমান কৃত 'গুলিস্তার বঙ্গানুবাদ' পাঠ করে ১০ মাঘ ১৩৪৫ তারিখে এক পত্রে লেখেন–

"গুলিস্তা আমাদের মগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই পুস্তকখানি আমার চিরসঙ্গী হইয়া থাকিবে। এই বয়সে আপনার গুলিস্তা পাইয়া জীবন আমার ময়ূরের মতো নাচিয়া উঠিয়াছে। আজ আমার সুপ্রভাত। সা'দী শুধু কবি নহেন, তিনি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন। তাহার বাণী আমার কাছে বেদবানীর মত।"[১৫]

গুলিস্তার নীতিপূর্ণ কবিতা গুলোকে তিনি বাংলা কবিতায় অনুবাদ করেছেন 'সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কলাম' নামে। কবি হাফিজের অনুসরণে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক কাব্য' রচনার প্রভাব লক্ষ করা যায় 'সাদীর কালাম বা সদ্ভাব কুসুম' নামকরণের মধ্যে। অনুবাদটি আক্ষরিক নয়, শেখ হবিবর রহমান অনুবাদ করার সময় দেখার চোখ এবং বলার ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

দুটোই যথার্থ ব্যবহার করেছেন। সাদীর কালামেই শেষ অনুবাদেই এ কথার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়।

মূল বয়াত :

নাগোয়াদ আজ সরে বাজিচা হরদে
কেজৈাপন্দে না গিরদ, সাহেবে হোশ।
অগর সদ্ বাবে হেকমত পেশে নাদা
বে খানি আয়দশ বাজিচা দর্ গোশ।

অনুবাদ :

কেহ কভু কোন কথা খেলার ছলে কয় না
যাহা হতে জ্ঞানীজন উপদেশ লয় না।
পড়িয়া শোনাও যত দর্শনের পরিচ্ছেদ।
অবোধের কাছে তার কোন দাম হয় না।

ভাবকে ছন্দে মিলিয়ে দিলেই অনুবাদ হয় না। সৌন্দর্য রসময়তাও আবশ্যক। শেখ হবিবর রহমান তাঁর অনুবাদে সে বিষয়টিকে কুণ্ঠাহীনভাবেও প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রখ্যাত কবি হাফিজ, সামসুত তবরেজ, মইনউদ্দিন চিশতি, শেখ সাদী ও আমির খসরুর বিখ্যাত গজলের সাথে কবি একাত্ম হয়ে যে কাব্য রচনা করেন, তাঁর নাম 'আবে হায়াত'। 'আবে হায়াত'-এর প্রতিটি কবিতা জীবনবারির এক একটি পেয়ালা বিশেষ। প্রতিটি কবিতা বাংলা গজলের নতুন আস্বাদে পরিপূর্ণ। ঐসব কবিতায় শেখ হবিবর রহমানের গীতি-তন্ময়তা প্রকাশিত হয়েছে সুচারুভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হবিবর রহমানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘আলমগীর’। মোঘল সম্রাট সাজাহান পুত্র মোঘল সাম্রাজের শ্রেষ্ঠতম শাসক আওরঙ্গজেব এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক চক্রের লিখিত ইতিহাসে বাদশা আলমগীর এক বিতর্কিত চরিত্র। কিন্তু শেখ হবিবর রহমান সেই চরিত্রকে বিতর্কের বাইরে এনে শ্রেষ্ঠ শাসক হিসাবে, তার মহাত্ম বৈরি শক্তির সাথে মোকাবিলার দৃঢ়তা, ইসলামি নীতিমালার অনুসরণ এবং ধর্মীয় সংস্কারের চেতনা ফুটিয়ে তুলেছেন এ উপন্যাসে। উপন্যাসটির ভাষা এবং রচনাশৈলী অনন্য সাধারণ। উপন্যাসটির প্রতি পৃষ্ঠায় তিনি প্রকৃত ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। যথাযথ পাদটীকা সংযোজন করে ইতিহাসের আবর্ত থেকে শেখ হবিবর রহমান যথার্থ বাদশা আওরঙ্গজেবকে উদ্ধার করেছেন। গ্রন্থটি না ইতিহাস না উপন্যাস, উপন্যাসেরও কমতি নেই, ইতিহাসেরও ঘাটতি নেই।

শেখ হবিবর রহমানের গল্প-সংকলন মোট ছটি। এই ছটি গ্রন্থের মধ্যে ‘নিয়ামত’ তার উল্লেখযোগ্য রচনা। ‘নিয়ামত’ গ্রন্থে গল্পের সংখ্যা বারো। এরমধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে সমকালীন মুসলিম সমাজ জীবনের নানা সমস্যা ও জটিলতা। বাঙালি মুসলমান সমাজের স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে। সমাজ-হিতৈষী হিসেবে শেখ সাহেব তাঁর যৌক্তিক দায়িত্ব পালন করেছেন ছোটগল্পসমূহে। ছোটগল্পের শিল্পরূপ, আঙ্গিক-কুশলতায় গল্পগুলো দুর্বল হলেও সমকালীন মুসলিম সমাজ-সচেতনতায় এ গল্পগুলোর মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

'নিয়ামত' ছাড়া শেখ হবিবর রহমানের অন্যান্য গল্প কখনো হাস্যরস বিজড়িত, কখনো পরীর দেশের অলৌকিক আখ্যান রহস্যে আচ্ছন্ন, কখনো প্রেমে উদ্বেলিত উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। সব মিলিয়ে তিনি গল্প বলেছেন। ছোটদের জন্য যে-গল্প তিনি রচনা করেছেন, সেখানে উপদেশ প্রধান। ছোটদের গল্পে বুস্তা, গুলিস্তাঁর আরব্য রজনীর এবং কোরআন শরীফের সাথে অন্যান্য উপকথাকেও গল্পাকারে রূপান্তর করেছেন। ছোটগল্পের জন্য যে শৈল্পিক মননশীলতার প্রয়োজন, শেখ হবিবর রহমানের গল্পে তা সীমিত। তা সত্বেও সমাজ এবং জনহিতকল্পে তাঁর গল্প অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।[১৬]

শেখ হবিবর রহমানের প্রবন্ধ রচনার সূচনা 'যশোহর সিদ্দিকিয়া সাহিত্য-সমিতি'র সাহিত্য আসরে পাঠ কবার মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে প্রথম দিকে ইসলামের সুদৃঢ় চেতনা ও ইসলামি আদর্শের উপর রচিত হলেও সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য তা ছিল সমানভাবে গ্রহণীয়। কিন্তু তার তরুণ বয়সের রচনার চেয়ে পরিণত বয়সে রচিত ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম, ধর্মবিদ্বেষ ও ইসলামনীতি যুক্ত বিশ্লেষণ একটি সুমিত চিন্তা-চেতনার প্রকাশে পরিপূর্ণ। শেখ হবিবর রহমানের যথার্থ ও সার্থক রচনা 'আমার সাহিত্য জীবন'। উক্ত গ্রন্থে কবি নির্লিপ্ত এবং নির্মোহভাবে তার সাহিত্যিক জীবনের কথাই বলেছেন। তার উত্থান-পতন, বাধ-বিপত্তি, অনগ্রসরতা-পশ্চাদপদতা। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থটি রচনা করেছেন কিন্তু কবি এ গ্রন্থ রচনার পরও দীর্ঘ সময় বেঁচে

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন এবং সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটিতে তাঁর বাকি জীবন ও সাহিত্য সাধনার কথা আর লেখেননি। তাই গ্রন্থটি অসম্পূর্ণই বলা যেতে পারে।

শেখ হবিবর রহমানের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ ব্যতিক্রমী গ্রন্থ 'সুন্দর বনের ভ্রমণ কাহিনী'। গ্রন্থটির ভূমিকাতে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি বাক্যে সমগ্র বইটির মাধুর্যকে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন–

"এইরূপ বই দেশকে জানিতে সাহায্য করে এবং এইরূপ সৎসাহিত্যের দ্বারা সমগ্র দেশবাসীর সেবা হয়।"[১৭]

সাধারণের কাছে সুন্দরবন রহস্যঘেরা, অজানা পুরী। তাকে তিনটি পরিচ্ছেদে অত্যন্ত কাব্যিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ধরণের গ্রন্থে বস্তুগত ঘটনার চাক্ষুষ বর্ণনাকেই প্রধান্য দেয়া হয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে শেখ সাহেবের কবি-মন। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে 'সুন্দর বনের ভ্রমণ কাহিনী' সুন্দর বনের উপর প্রথম একক গ্রন্থ। যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সুন্দর বনের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, জীব-জগৎ ও বৃক্ষ জগতের পরিচিতি। পরবর্তীকালে সুন্দরবন নিয়ে রচিত অন্যান্য গ্রন্থের পথিকৃৎ শেখ হবিবর রহমান-তা অবশ্যই স্বীকার্য।

শেখ হবিবর রহমান ইতিহাসের পটভূমিতে যেমন উপন্যাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন, তেমনি তিনি ইতিহাসও রচনা করেছেন। 'ভারত সম্রাট বাবর', 'সংক্ষেপে বিষাদ সিন্ধু', 'ছোটদের মুসা' প্রভৃতি নানা রকম জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। মুসলিম জাতীয় জাগরণের

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম পুরোধা কর্মবীর মুন্সি মেহেরুল্লাহর জীবন ও আদর্শ নিয়ে তিনি 'কর্মবীর মুন্সি মেহেরুল্লাহ' জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। মুসলিম জাতীয় বৃহত্তর কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে মুন্সি মেহেরুল্লাহর অবদানকে সমাজ-মানসে ছড়িয়ে দেয়াই ছিল তার বিশেষ উদ্দ্যেশ্য।

শেখ হবিবর রহমানের ব্যঙ্গ রচনা 'শয়তানের সভা'। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে এবং সারা বিশ্বে যে-সকল মানব শয়তান বিচরণ করছে, এ পুস্তকে তার ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন কবি। রম্য রচনার আঙ্গিকে এ লেখায় কবি সামাজিক হীনমন্যতাকে তুলে ধরেছেন।

শেখ হবিবর রহমান জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রচনা করেছেন একটি অভিনব গ্রন্থ 'মরনের পরে'। এ গ্রন্থটি স্পিরিচুয়ালিজম (spritualisium) বা পরলোকতত্ত্ব নিয়ে লেখা। এটি কবির গবেষণাধর্মী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। কোন ধর্মীয় বিরোধের উর্ধ্বে প্লানচেট ধরণের রচনা হচ্ছে 'মরনের পরে'।

বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী শেখ হবিবর রহমান বৈচিত্রময় সাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। সৎ, সুন্দর ও সেবক মনের অধিকারী শেখ হবিবর রহমানের ব্যক্তি-জীবন যত সুন্দর ততই সুন্দর তার সাহিত্য নিয়ে লেখা কর্ম। দেশ, জাতি ও সমাজের উন্নয়ন-ই ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। নিরলস সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তিনি আমরণ সেবার মহান আদর্শে ছিলেন অবিচল। তাই তাঁর ব্যক্তি-জীবন ছিল সৎ ও সুন্দর। সাহিত্য-কর্মও ছিল আদর্শ, জন-সচেতন ও জাতীয় চেতনার স্বাধীন বিকাশে সোচ্ছার।

Dhaka University Institutional Repository

১২. আব্দুল মজিদ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা– ৮৯

১৩. ঐ। পৃষ্ঠা-৪৩

১৪. শেখ হবিবর রহমান। দ্রষ্টব্য, কোহিনুর কাব্য, ১ম সংস্করণ-১৯১৯, ঢাকা।

১৫. ড. আনিসুজ্জামান। ভুমিকা, শেখ হবিবর রহমান গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৭০, পৃষ্ঠা ০৮

১৬. আবুল কালাম সামসুদ্দীন। বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান, সওগাত, চতুর্থ বর্ষ, ৪ র্থ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৩

১৭. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকা, শেখ হবিবর রহমান, 'সুন্দর বনের ভ্রমন কাহিনী', কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃষ্ঠা-৮

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. মুহম্মদ আব্দুর রহিম, ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, ড. এ বি এম মাহমুদ, ড.সিরাজুল ইসলাম– বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ

২. গোলাম মুরশিদ– হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর পাবলিকেশন, ২য় সংস্করণ-২০০৬

৩. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুম– বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি, বাংলা একাডেমী, মে-২০০৭

৪. ড. মুহম্মদ আব্দুল বাকী–বৃটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে উপমহাদেশীয় উলামা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৫ বর্ষ

৫. ইমরান হোসেন– বাঙ্গালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী চিন্তা ও কর্ম, ঢাকা-১৯৩৩

৬. খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ, শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৮৮

৭. আকবর উদ্দিন– মাওলানা আকরম খাঁর কাল ও তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম সংস্করণ

৮. কে এম ফিরোজ খান–সিরাজউদ্দৌলা থেকে শেখ মুজিব, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১ম সংস্করণ, ঢাকা

৯. আব্দুল মজিদ। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী

১০.শেখ হবিবর রহমান। আমার সাহিত্য জীবন(আত্মজীবনী), ১ম সংস্করণ-১৯২৭

১১.শেখ সামসুর রহমান। আমার আব্বা(স্মৃতিচারণ), জন্মশতবার্ষিকী স্মরণীকা, খুলনা একাডেমী, ১০ জানুয়ারি-১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

১২.অধ্যাপক সুশান্ত সরকার। সমকালীন প্রেক্ষাপট, শেখ হবিবর রহমানের সাহিত্যের রূপরেখা, জন্মশতবার্ষিকী– শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, খুলনা একাডেমি, ১০ জানুয়ারি-১৯৯১

১৩.মোহাম্মদী, ২৫ মাঘ ১৩১৯

১৪.মাসিক হাকিম, আগষ্ট ১৯১৩

১৫.The Bengoli, 10th February, 1913

১৬.আব্দুল মজিদ। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন(জীবনীমালা সিরিজ), বাংলা একাডেমী

১৭.দৈনিক সঞ্জীবনী, ১৭ আশ্বিন, ১৩১৯

১৮. দৈনিক হাবলুল মতিন, ৬ ফাল্গুন, ১৩১৯

১৯.শেখ হবিবর রহমান। ভূমিকা। বাঁশরী(কাব্যগ্রন্থ), ১ম সংস্করণ, ১৯১৭, মখদুম লাইব্রেরী, কলকাতা।

২০. শেখ হবিবর রহমান। সন্ধ্যা কবিতা। বাঁশরী(কাব্যগ্রন্থ), ১ম সংস্করণ, ১৯১৭, মখদুম লাইব্রেরী, কলকাতা।

২১.ড. আনিসুজ্জামান। ভূমিকা, শেখ হবিবর রহমান গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৭০

২২. আবুল কালাম সামসুদ্দীন। বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান, সওগাত, চতুর্থ বর্ষ, ৪ র্থ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৩

২৩. মৌলবী আব্দুল লতিফ বি এ। ভূমিকা "কোহিনুর কাব্য", দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯২৬, কলকাতা।

২৪. শ্রীযুক্ত বাবু রামাদাস ভট্টাচার্য। ঐ

২৫. বিদ্যাভূষণ বি এ। ঐ

২৬. শ্রী তারকানাথ কাব্যতীর্থ তর্কবাচস্পতি। ঐ

২৭. খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ। ঐ

২৮. শেখ হবিবর রহমান। ভূমিকা। "গুলশান" কাব্যগ্রন্থ, ১৯২৮, মখদুম লাইব্রেরি, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. শ্রী সুনির্মল বসু। ভূমিকা। "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ"(ছড়ার বই), ৩য় সংস্করণ-১৯৫৬, খুলনা।

৩০. শেখ হবিবর রহমান। "আলমগীর", ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা- ১৯৮৮

৩১.মুহম্মদ আব্দল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম সংস্করণ

৩২. মাসিক সওগাত, কার্তিক- ১৩৩৩

৩৩. মাসিক সওগাত, আশ্বিন- ১৩২৬

৩৪. শেখ হবিবর রহমান। "মোল্লা বাকাউল্লা", গল্প গ্রন্থ, ১ম সংস্করণ-১৯৪৭, পারিজাত সাহিত্য কুঠির, কলকাতা

৩৫. শেখ হবিবর রহমান। ভূমিকা, "পরীর কাহিনী", ৫ম সংস্করণ-১৯৪৩, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা

৩৬. শেখ হবিবর রহমান। 'সুন্দর বনের ভ্রমন কাহিনী', কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৪

৩৭. শেখ হবিবর রহমান। "ভারত সম্রাট বাবর", ১ম সংস্করণ-১৯১৯, বুনগাতি, যশোহর

৩৮. শেখ হবিবর রহমান। "ছেলেদের হযরত মুসা", ১ম সংস্করণ-১৯৩৪, দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী, কলকাতা

৩৯. শেখ হবিবর রহমান। "কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা", ১ম সংস্করণ-১৯৩৪, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা

৪০. শেখ হবিবর রহমান। "চেতনা", ১ম সংস্করণ-১৯২৯, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা

৪১.শেখ হবিবর রহমান। "শয়তানের সভা", ২য় সংস্করণ-১৯৫৩, বুনাগাতি, যশোহর

৪২. শেখ হবিবর রহমান। "ইসলাম ও অন্যধর্ম", ১ম সংস্করণ-১৯৪৯, প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, কলকাতা

৪৩. শেখ হবিবর রহমান। "মরনের পরে", ১ম সংস্করণ-১৯৫৫, পারিজাত সাহিত্য কুটীর

৪৪. শেখ হবিবর রহমান। ভূমিকা, "গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ", ২য় সংস্করণ-১৯৪৯, কিতাব মহল, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. শেখ হবিবর রহমান। প্রস্তাবনা, "সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম", ২য় সংস্করণ-১৯৩০, বুনাগাতি, যশোহর

৪৬. মাসিক সওগাত, কার্তিক ১৩৩৩

৪৭. শেখ হবিবর রহমান। "গুলিস্তাঁর গল্প"(অনুবাদ), ১ম সংস্করণ, কিতাব মহল–ঢাকা,

৪৮. বঙ্গনুর, ১৫ ডিসেম্বর-১৯১৯, সম্পাদক : শেখ হবিবর রহমান

৪৯. ইসলাম দর্শন(মাসিক পত্র), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-১৩২৬

৫০. মাসিক সচিত্র আল এসলাম, শ্রাবন-১৩২২, ৪র্থ সংখ্যা

৫১. ঐ, মাঘ ১০ম সংখ্যা

৫২. ঐ, ১৩২২(ফাল্গুন), ১৩ম সংখ্যা

৫৩. বঙ্গনুর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা-১৯১৯

৫৪. ঐ, আফ্রিকায় বাঙ্গালী(মোসলেম কীর্ত্তি-প্রবন্ধ)

৫৫. ঐ, ২য় সংখ্যা, ১৩২৬ পৌষ

৫৬. ঐ, ৩য় সংখ্যা, ঐ, মাঘ

৫৭. ঐ, ৪র্থ সংখ্যা, ঐ ফাল্গুন

৫৮. ঐ, ৫ম সংখ্যা, ঐ, চৈত্র

৫৯. ঐ, ৭ম সংখ্যা, ১৩২৭ জৈষ্ঠ্য

৬০. ঐ, ৮ম সংখ্যা, ঐ, আষাঢ়

৬১. ঐ, ৯ম সংখ্যা, ঐ, শ্রাবন

৬২. ঐ, ১০ম সংখ্যা, ১৩২৮ অগ্রহায়ন

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. **ঐ, ১১তম সংখ্যা,ঐ, আশ্বিন**

৬৪. **ঐ, ২য় বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, ১৩২৮ কার্ত্তিক**

৬৫. **ঐ, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঐ, অগ্রহায়ন**

৬৬. **ঐ, ২য় সংখ্যা, ঐ, পৌষ**

৬৭. **ঐ, ৩য় সংখ্যা, ঐ, মাঘ**

৬৮. **মাসিক ঊষা, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শেখ হবিবর রহমান ও বিশ্বেশ্বর নন্দী সম্পাদিত, ১৩৫৬ শ্রাবণ**

৬৯. শেখ হবিবর রহমান। ভূমিকা। বাঁশরী(কাব্যগ্রন্থ), ১ম সংস্করণ-১৯১৭, মখদুম লাইব্রেরী, কলকাতা।

৭০. শেখ হবিবর রহমান। আমাদের সাহিত্যিক অবসাদ, আল এসলাম(পৌষ ১৩২৩)

৭১. শে, হ, র। বাদ প্রতিবাদ, মাসিক সওগাত, অগ্রহায়ন ১৩৩৩,

৭২. আবুল কালাম সামসুদ্দীন। বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান, সওগাত, চতুর্থ বর্ষ, ৪ র্থ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৩

৭৩. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকা, শেখ হবিবর রহমান, 'সুন্দর বনের ভ্রমন কাহিনী', কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৪,